বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম
BA and BSS PROGRAMME

ইসলামিক স্টাডিজ-৫
ISLAMIC STUDIES-5

ইসলামি অর্থব্যবস্থা
Economic System in Islam

الدراسات الاسلامية -٥
النظام الاقتصادي في الاسلام

কোর্স কোড- **BIS : 6305**

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম
BA and BSS PROGRAMME

School of Social Sciences, Humanities and Languages
Bangladesh Open University

ইসলামিক স্টাডিজ-৫
ISLAMIC STUDIES-5

ইসলামি অর্থব্যবস্থা
Economic System in Islam

এটি একটি পুনর্মুদ্রিত এবং পরিমার্জিত পাঠসামগ্রী। এই পাঠসামগ্রীটি ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান (অধ্যাপক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. মোজাহিদুল ইসলাম (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) রচনা করেছেন এবং ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) ও ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) সম্পাদনা করেছেন। পাঠসামগ্রীটির সর্বশেষ পরিমার্জন করেছেন মুহাম্মদ আবদুল মালেক (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডীন, এসএসএইচএল

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল

ইসলামিক স্টাডিজ-৫

ইসলামি অর্থব্যবস্থা

(সকল স্বত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : ২০০৪
পুনঃ প্রকাশ : ২০০৬
পুনঃ প্রকাশ : ২০০৭
পুনঃ প্রকাশ : ২০০৮
পুনঃ প্রকাশ : ২০০৯
পুনঃ প্রকাশ : ২০১০
পুনঃ প্রকাশ : ২০১১
পুনঃ প্রকাশ : ২০১৩
পুনঃ প্রকাশ : ২০১৬
পুনঃ প্রকাশ : ২০১৭
পুনঃ প্রকাশ : ২০২০

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মাসুদ মাহমুদ মল্লিক

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ এন্ড পেইজ মেক-আপ
মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম সরকার

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫, ফোন: ৯২৯১০৮১৮
পিএবিএক্স: ৯২৯১৮০১-৪
এক্সটেনশন-২৮২, ২৮৪

মুদ্রণ
মাস্টার সিমেক্স পেপার লিমিটেড
৬৫/২/১, বক্স কালভার্ট রোড
পুরানাপল্টন, ঢাকা-১০০০।

ISBN-984-34-1050-5

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল কর্তৃক পরিচালিত বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 'ইসলামি অর্থব্যবস্থা' বইটি বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের কোর বিষয় 'ইসলামিক স্টাডিজ'-এর পঞ্চম কোর্স-এর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মড্যুলার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মড্যুলার পদ্ধতি হচ্ছে, একটি স্বশিখন পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থী-সক্রিয়ভাবে নিজে শিক্ষাগ্রহণ করে। কারণ এ পদ্ধতিতে পাঠসামগ্রী একাধারে বই ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বইটি একজন শিক্ষার্থী তার কর্মস্থল ত্যাগ না করে নিজের ঘরে বসে বা নিজের অবস্থানে থেকে উপযুক্ত সময় ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষকের সহযোগিতা ছাড়াই বুঝতে এবং এর পাঠগুলো আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

এ বইটির প্রতিটি পাঠ রচনাকালে এমন সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে যা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক ক্লাস গ্রহণের সময় অবলম্বন করে থাকেন। যেমন-

- পাঠের উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ
- পাঠের মূল আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ
- পাঠ সমাপ্তির পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন করা
- পাঠ সমাপ্তির পর এ প্রশ্নগুলোর আলোকে পাঠ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

ঠিক এ বিষয়গুলো দূর-শিক্ষণ পদ্ধতিতে রচিত "ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স-৫: ইসলামি অর্থব্যবস্থা" বইটিতেও অবলম্বন করা হয়েছে। তাই এ বইটিকে বলা চলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ একটি পাঠসামগ্রী। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ দায়িত্বেই পাঠগুলো আয়ত্ত করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, দূর-শিক্ষণ পদ্ধতির একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার চেষ্টাই আপনাকে অনেক কিছু শিখতে সহযোগিতা করবে।

বইটি কিভাবে পড়বেন-

- প্রথমে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো ভালভাবে বুঝে নিন।
- পাঠ শেষে ভাবুন-উদ্দেশ্যগুলো আপনার আয়ত্তে আসল কি না বা কতটুকু আসল। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আয়ত্তে না আসলে পাঠের নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ুন। যাতে করে তা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন।
- প্রতিটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পড়ুন এবং উত্তরগুলো প্রথমে মনে মনে ভাবুন। অতপর মুখে বলুন এবং সবশেষে লিখুন।
- পাঠের মধ্যে আপনার কাঙ্ক্ষিত অংশটি পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না। প্রতিটি অংশই Sub head line-এ বড় অক্ষরে দেওয়া আছে।
- তারপরও কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে প্রতি মাসের নির্ধারিত দিনে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিত হয়ে আপনার টিউটরকে জিজ্ঞেস করে তা সমাধান করে নিন।
- উপরন্তু এ বইটির উপর প্রণীত টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান যথাসম্ভব প্রচার করা হবে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে তা দেখার ও শোনার জন্য চেষ্টা করুন।

- বইটিতে অনেক আরবি আয়াত ও হাদীস দেখে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আরবি পড়তে ও লিখতে চেষ্টা করুন। না পারলে শুধু বাংলা অনুবাদ পড়ুন ও আয়ত্ত করুন। পরীক্ষায় আরবি টেক্সট না লিখলেও কোন অসুবিধা হবে না।
- তথ্যগত কোন ভুল-ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিতে পড়ে তবে তা জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

এ বইটি রচনা করার সময় বিভিন্ন স্বনামধন্য লেখকের বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। স্নাতক পর্যায়ের পড়া-লেখা উচ্চতর গবেষণাধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল এই কোর্স-বইয়ের উপরই আপনাদের পড়া-লেখা সীমাবদ্ধ রাখবেন না। এ পর্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চা জরুরি। ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য এখানে কয়েকটি রেফারেন্স ও সহায়ক বইয়ের নাম দেওয়া হল। বইগুলো নিরূপ-

১. আহকামুল কুরআন- আলী আস-সাবুনী।
২. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, ড. ওহবাতুয যুহাইলী।
৩. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ।
৪. তাফহীমুল কুরআন, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।
৫. সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬. ইসলামে হালাল হারামের বিধান, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী।
৭. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৮. আল-হিদায়া।
৯. ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান।
১০. ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা শিল্প, মুফতী মুহাম্মদ শফী।
১১. আল-আমওয়াল ওয়া নাযারিয়াতুল আকদ্, ড. মোঃ ইউসুফ মূসা।
১২. আদ-দুররুল মুখতার, ইবনে আবেদীনের ভাষ্য।
১৩. আল-মিলকিয়াতু ওয়া নাযারিয়াতুল আকদ, শাইখ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ।
১৪. আহকামুল মুআমালাতি আশ-শারইয়্যাহ, শাইখ আলী আল-খাফীক।
১৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আল্লামা আল-কুরতুবী।
১৬. আল মাবসুত, ইমাম আল-সারাখসী আল-হানাফী।
১৭. আল-কাওয়অনিনুল ফিকহিয়্যাহ।
১৮. আল মুগনী আল-মুহতাজ, কালইউবী ও উমায়রা-এর ভাষ্য।
১৯. আশ-শারিকাত ফিল ফিকহিল ইসলামি, শাইখ আলী আল-খাফীফ।
২০. সুবুলুস সালাম।
২১. আল-ফিকহুল ইসলামি, ড. আবু যাহরাহ।
২২. বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২৩. Readings in Islamic Banking, Dr. Ataul Hoque.
২৪. ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দিন।

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
ইউনিট-১ :		**ইসলামি অর্থনীতি: পরিচয় ও বিষয়বস্তু**	**১**
পাঠ-১	:	ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব	২
পাঠ-২	:	ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি	৯
পাঠ-৩	:	ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য	১৭
পাঠ-৪	:	ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনা	২০
পাঠ-৫	:	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনা	২৪
পাঠ-৬	:	অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় ইসলাম।	২৭
ইউনিট-২ : ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন			**৩০**
পাঠ-১	:	ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা	৩১
পাঠ-২	:	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শ্রম	৩৭
পাঠ-৩	:	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধন	৪৯
পাঠ-৪	:	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমি	৫৭
পাঠ-৫	:	উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সংগঠন।	৬২
ইউনিট-৩: ইসলামে ভূমিনীতি			**৬৪**
পাঠ-১	:	ইসলামে ভূমির স্বত্ব ও মালিকানা	৬৫
পাঠ-২	:	ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ চাষাবাদ	৭২
পাঠ-৩	:	হযরত উমরের ভূমি সংস্কারনীতি	৭৬
পাঠ-৪	:	ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা।	৮০
ইউনিট-৪ : ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ও সম্পদ বণ্টনব্যবস্থা			**৮৪**
পাঠ-১	:	সম্পদ কী ও সম্পদের প্রকারভেদ	৮৫
পাঠ-২	:	ইসলামে সম্পদ বণ্টননীতি	৮৮
পাঠ-৩	:	ইসলামি অর্থনীতিতে যাকাত	৯৬
পাঠ-৪	:	ফসলের যাকাত ঃ উশর ও খারাজ	১০৩
পাঠ-৫	:	ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ	১০৭
পাঠ-৬	:	ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ	১১৫
পাঠ-৭	:	ওয়াকফ ব্যবস্থা।	১২৩
ইউনিট-৫: ইসলামে ব্যবসায় ও বাজারনীতি			**১৩০**
পাঠ-১	:	ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়	১৩১
পাঠ-২	:	ব্যবসায়ের শ্রেণী বিভাগ	১৩৩
পাঠ-৩	:	ইসলামের বাজারনীতি	১৩৬
পাঠ-৪	:	মুদ্রা বিনিময়	১৪২
পাঠ-৫	:	লেনদেন ও ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার	১৪৭
পাঠ-৬	:	পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নীতি	১৫২
পাঠ-৭	:	বাগান ও ফল ক্রয়-বিক্রয় নীতি	১৫৬
পাঠ-৮	:	মজুতদারী	১৬০
পাঠ-৯	:	পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়	১৬৩
পাঠ-১০	:	বৈদেশিক বাণিজ্য।	১৬৬

ইউনিট-৬: ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা **১৭১**
পাঠ-১ : ইসলামি ব্যাংকের পরিচয় এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৭২
পাঠ-২ : ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৭৪
পাঠ-৩ : ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে তুলনা ১৭৮
পাঠ-৪ : ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী ১৮১
পাঠ-৫ : ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল ও এর কার্যাবলী ১৮৩
পাঠ-৬ : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ১৮৭
পাঠ-৭ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ও এর সম্ভাবনা ১৯১
পাঠ-৮ : ইসলামি ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৯৫
পাঠ-৯ : ইসলামি ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ২৯৯
পাঠ-১০ : বিনিয়োগ ২০১
পাঠ-১১ : ইসলামি বীমাব্যবস্থা ২০৬

ইউনিট-৭ : সুদ২১০
পাঠ-১ : সুদের পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ ২১১
পাঠ-২ : সুদযোগ্য পণ্য ও সুদের শর্তাবলী ২১৫
পাঠ-৩ : সুদ ও মুনাফার পার্থক্য ২১৮
পাঠ-৪ : সুদের কুফল ২২১
পাঠ-৫ : ইসলামে ঋণ দেওয়ার বিধান। ২২৪

ইউনিট ১

ইসলামি অর্থনীতি: পরিচয় ও বিষয়বস্তু

ভূমিকা

ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের আলোকে ইসলামি শরীআ নির্দেশিত ব্যবস্থা। মুসলিম জীবন দর্শনের বাস্তবায়ন এ অর্থ ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। এটি প্রগতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি জীবন দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতা সবকিছু একই সূত্রে গাঁথা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (স) প্রদর্শিত জীবন-বিধান অনুযায়ী সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পার্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও ব্যবহারই ইসলামি অর্থনীতির মূল কথা। ইসলামি অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত উপার্জন, ব্যয়, বিনিয়োগ, ভোগ, বণ্টন, অর্থ লেনদেন, শ্রম, মূলধন, উৎপাদন, সংগঠন, ভূমি, রাজস্ব, কর, ঋণদান ও গ্রহণ, যাকাত, সাদকাহ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যা কিছু জীবন উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত সে সকল বিষয় ইসলামি অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি হচেছ সকল ক্ষেত্রে আমর বিল মারূফ এবং নাহি আনিল মুনকারের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাযকিয়া ও তাকওয়া অর্জন। ইসলামি অর্থনীতি কুরআন-হাদীস নির্ভর বিধায় মানব রচিত অর্থ ব্যবস্থা হতে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এর উপার্জন পদ্ধতি, বণ্টনরীতি, মালিকানা, উত্তরাধিকার-আইন, শ্রমনীতি, সুদবিহীন ব্যাংকিং পদ্ধতি, জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড ববং ব্যবসা বাণিজ্যের স্বচ্ছতা প্রচলিত ব্যবস্থা হতে উন্নত ও স্বচছ। ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে এর যথেষ্ট ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সর্বোপরি ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। আলোচ্য ইউনিটে এ বিষয়গুলোই আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এ ইউনিটকে ৬টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব।
- ❖ পাঠ-২ : ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি।
- ❖ পাঠ-৩ : ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।
- ❖ পাঠ-৪ : ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনা।
- ❖ পাঠ-৫ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থনীতির তুলনা।
- ❖ পাঠ-৬ : অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় ইসলাম।

পাঠ ঃ ১

ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- অর্থনীতির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতির পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি বা দর্শন বলতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

অর্থনীতির পরিচয়

অর্থনীতি সামাজিকবিজ্ঞানের একটি বৃহত্তম শাখা। এটা সমাজবদ্ধ মানুষের আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Economics। গ্রিক Oikonomi থেকে Economics শব্দটি এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ 'আর্থিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা'। তাই অর্থনীতি বলতে এমন এক বিষয় বুঝায় যা মানুষের অর্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজবদ্ধ কেউ সয়ংসম্পূর্ণ নয়। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অপরিসীম। কিন্তু তাদের শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত। পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমেই তারা নিজেদের অভাব-অনটন দূর করে থাকে। এজন্য মানব সমাজে বিনিময় প্রথা উদ্ভব হয়েছে। প্রাথমিক যুগে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু ছিল। পরে আস্তে আস্তে মুদ্রা বিনিময় প্রথা চালু হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানব জাতির সম্প্রসারণ, ক্ষমতা ও লভ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ও অভাবের সূত্র ধরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উদ্ভব হয়েছে। অর্থনীতি একটি গতিশীল (Dynamics) শাস্ত্র বলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের দেয়া বহু সংজ্ঞা আজ যথার্থতা ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে।

অর্থনীতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। সময় ও সভ্যতার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞায়ও নানা পরিবর্তন এসেছে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, অর্থনীতি হচ্ছে- The art of managing the house hold. অর্থনীতি হচ্ছে সংসার পরিচালনার কলাকৌশল। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থনীতিবিদরা তাঁর এ সংজ্ঞা মানতে রাজী নন। তারা অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারণ করেছেন। নিম্নে অর্থনীতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হল-

১. ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের (Alfred Marshal) ভাষায়, অর্থনীতি হচ্ছে মানব জীবনের সাধারণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী একদিকে সম্পদ অন্যদিকে মানুষ ও তার মঙ্গল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। এ সংজ্ঞাটি অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত বিস্তৃত ও অনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বলা হয়, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞায়ও নেই।

২. ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে Economics of Industry নামক গ্রন্থে আলফ্রেড মার্শাল বলেন, Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. "অর্থনীতি হচ্ছে মানব জীবনের সাধারণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা।" মার্শারের সংজ্ঞায় মানব জীবনের সাধারণ মানবিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফলে সম্পদের সাথে অর্থনীতির লক্ষ্যবস্তু থাকল মানব কল্যাণমূলক। মার্শালের সংজ্ঞার সমালোচনায় যেসব বিশেষ দিক ফুটে ওঠেছে তা হচ্ছে, সম্পদ ব্যবহারের অনুশীলন। এটা মানবকল্যাণ ধর্মী। এটা মানুষকে সর্বদা স্বার্থবাদী বলে চিহ্নিত করে না। সর্বোপরি এটা একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

৩. ১৭৭৬ সালে ব্রিটেনের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) সর্বপ্রথম একটি অর্থ শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেন- "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিগুলোর সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।" (Economics is a science which enquires into the nature

and causes of the wealth of the nations.) তাঁর মতে, অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি সীমিত ও অসম্পূর্ণ। এখানে সম্পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা নেই। আর সম্পদই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি মানব কল্যাণের একটি উপায় মাত্র।

৪. অধ্যাপক লিওনেল রবিনসের (Lionel Robbins) মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যা অসীম চাহিদা ও বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মানব আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।" এ সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনটির উল্লেখ নেই। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর এবং ব্যবহার্য উপকরণগুলোর অপ্রাচুর্যের উল্লেখ রয়েছে।

৫. আলফ্রেড মার্শাল তাঁর Economics of Industry গ্রন্থে অর্থনীতির যে সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন সে বিষয়ে রবিনসের সমালোচনা ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মার্শালের উক্ত পুস্তক রচনার ৪১ বছর পরে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে লিওনেল রবিনসের উক্ত সমালোচনা সুধী মহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অবশ্য ইসলামি চিন্তাবিদদের কাছে রবিনসের সমালোচনা অনেকখানিই গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিনস মার্শালের সমালোচনা করে নিজেই অর্থনীতির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন যা পাশ্চাত্য জগতে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনীতি সম্পর্কে রবিনস নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। Econimics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses অর্থাৎ বিকল্প ব্যবহারযোগ্য অপ্রতুল উপকরণগুলোর ভেতরে যেগুলো মানুষের প্রয়োজনে লাগে সেগুলোর সাথে মানবের সম্পর্ক স্থাপনে মানবীয় আচরণ পর্যালোচনার শাস্ত্রকে অর্থনীতি বলে।

৬. জে. এস. মিল (J.S.Mill) বলেন, "অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবহারিক শাস্ত্র।"

৭. জে. বি. সে (J.B.Say) বলেন- "অর্থনীতি ধন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"
এডউইন ক্যান্যান (Eduin Cannan)-এর মতে, "অর্থনীতি বৈষয়িক কল্যাণের উপায় সংক্রান্ত আলোচনা।" (Econimics is a study of the causes of material welfare.)

৮. পাশ্চাত্য জগতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি দিয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ববার (Bober)। তাঁর মতে "স্বল্প উপকরণসমূহের বিতরণ, কর্মসংস্থান ও আয়ের নির্ধারকসমূহের আলোচনাই হচ্ছে সংক্ষেপে অর্থনীতি।" (Economics can be briefly defined as the study of it administration of scarce resources and determinants of employment and income.)

বিষয়বস্তু

অর্থনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক চাহিদার প্রকৃতি, পরিধি এবং পরিমাণের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতির বিষয়বস্তুর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। সমাজবহির্ভূত, উদাসীন, বৈরাগ্যবাদী জীবনে অভ্যস্ত লোকের আচরণ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়। অর্থনীতি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর দিকও আলোচনা করে। যেমন- মাদক দ্রব্যাদি, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ যে অকল্যাণকর তা অর্থনীতির পাঠ থেকে জানা যায়। অর্থনীতি শুধু সমস্যাই বিশ্লেষণ করে না, সমাধানের অর্থনির্দেশও দান করে।

মানুষ কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে পারে অর্থনীতি তা নিয়ে আলোচনা করে। সীমিত যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপকরণসমূহকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অধিক উৎপাদন করা যায় এবং কিভাবে সুষ্ঠু ও দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনমানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় তা-ই অর্থনীতির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করা যায় তাও অর্থনীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। এজন্য অর্থনীতিকে ভবিষ্যতের আলোকদিশারী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

অর্থশাস্ত্রের জনক বলে পরিচিত ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা চিন্তাবিদ এডাম স্মিথ সর্বপ্রথম ১৭৭৬ সালে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করেন। তাঁর মতে, অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদ বা অর্থ উপার্জনের পন্থা। আর তাই অর্থ উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু। তাঁর এ ধারণা পরবর্তীকালে জে. বি. সে (J. B. Say) ওয়াকার, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ সমর্থন করেন।

আলফ্রেড মার্শালের মতে, "অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পদ নয়, বরং অভাব মোচন সংক্রান্ত মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলী। সম্পদ অভাব মোচনের উপায় মাত্র।" মার্শাল আরো বলেন, "মানুষের বহু কাজ আছে কিন্তু তার সব কাজই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়। টাকা-পয়সা, আয়-ব্যয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ।" সুতরাং অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের একদিকে হলো সম্পদ অন্যদিকে মানুষ।

অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। তবে মানুষের অভাব মোচন সংক্রান্ত কর্মকান্ড বিষয়ক আলোচনাই হলো অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু।

ইসলামি অর্থনীতির পরিচয়

ইসলামি অর্থনীতি কী ?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা) প্রদত্ত জীবন বিধানই ইসলাম। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু এর অনুসারীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিজীবন, গোষ্ঠীজীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালা। এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পরিবার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইন ও বিচার প্রভৃতি। অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামি জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যেও একথা সত্য। তাই ইসলামি অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বোঝায়- যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল, ইসলামি আকিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ অর্থনীতির মূলনীতি ও দিক-নির্দেশনা বিধৃত রয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে।

ইসলামি অর্থনীতির ভিত্তি বা দর্শন

প্রত্যেক জাতি বা সমাজের একটি জীবনদর্শন থাকে। সেই জীবনদর্শন অনুসারেই তার জীবন তথা জাগতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মুসলমানদের জীবনের সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ। অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল দ্বান্দিক বস্তুবাদ। মুসলিম উম্মাহর আকীদা হচ্ছে এ বিশ্বচরাচরের একজন মহান স্রষ্টা আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। একমাত্র তাঁরই নির্দেশিত পথে চললে মিলবে কল্যাণ ও মুক্তি। এ নির্দেশিত পথটি কি এবং কেমন করে সেপথে চলতে হবে তা জানাবার জন্যে সেই বিশ্বস্রষ্টাই আবার যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলদের। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সে ধারায় সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁরই মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।

মুসলমানদের সমগ্র জীবন ও কর্মকান্ড তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অর্থনীতিতে যেহেতু সেই জীবন ও কর্মকান্ডেরই এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রেও তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের দাবি সমভাবে প্রযোজ্য। এ দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয় মুসলমানদের জীবনের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, গড়ে ওঠে সমৃদ্ধি ও গতিশীল অর্থনীতি।

ইসলামি জীবন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীস হচ্ছে এর মূল ভিত্তি বা উৎস। একটি প্রগতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি- ইসলামি জীবনদর্শন, কৃষ্টি ও সর্ভতার সাথে একই সূতোয় গাঁথা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা) প্রদর্শিত জীবন-বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহর দেয়া পার্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তা থেকে শরীআতের বিধান অনুযায়ী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবহার করার নামই হলো ইসলামি অর্থনীতি।

ইসলামি চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ ইসলামি অর্থনীতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে ইসলামি অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মুহাম্মদ বিন হাসান তুসীর মতে, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, বৃত্তি ও বিজ্ঞান।" [মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী, (১২০১-১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ), আখলাকে নাসিরী]।

২. তিউনিসিয়ার বিশ্ববিখ্যাত আরব মনীষী ইবনে খালদুন বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে জনসাধারণের (আল-জমহুর বা masses) কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।" [ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ), আল-মুকাদ্দিমা]।

৩. এস.এম. হাসান জামানের মতে, "Islamic Ecomomics is the knowledge and application of injunction and rules of the Shariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of

material resources in order to provide satisfaction to human beings and enables them to perform their obligation to Allah and the society"
অর্থাৎ "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তা ব্যয় এবং বণ্টনের প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলুম ইত্যাদি প্রতিরোধে আরোপিত ইসলামি বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে।"

৪. মুহাম্মদ আকরাম খানের মতে, "Islamic Economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of the earth on the basis of co-operation and participation``
অর্থাৎ "সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিত করার মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি।"

৫. মুহাম্মদ আকরাম খানের সংজ্ঞায় ফালাহ্ (Falah) বা কল্যাণ শব্দটি খুবই তাৎপর্যবহ। ফালাহ্ শব্দটি এসেছে আফলাহ বা ইউফলিহ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্যতা লাভ করা প্রভৃতি। পার্থিব জীবনে ফালাহ্ বা কল্যাণ বলতে বুঝায় বেঁচে থাকা (Survival), অভাব থেকে মুক্তি (freedom from want). অনন্ত সমৃদ্ধি (eternal prosperity). চিরস্থায়ী সম্মান (everlasting glory) এবং অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান (knowledge free from ignorance)। ইসলামি অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। মহান আল্লাহ বলেন, "এ বিশ্বজগতের সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।" ইসলামি অর্থনীতিতে কল্যাণ বলতে কেবলমাত্র ইহজাগতিক কল্যাণকে বুঝায় না। ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতের সর্বাধিক কল্যাণ করাই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য। পবিত্র কুরআন মজিদে ৪০ বার 'ফালাহ্' বা কল্যাণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, 'কল্যাণ' শব্দটির গুরুত্ব ইসলামি অর্থনীতিতে কতখানি।

৬. এস.এম. আবুল কালামের মতে- "ইসলামি অর্থনীতি একাধারে একটি বিজ্ঞান এবং কলা যার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দার দৈনন্দিন জীবনাচার ; অর্থাৎ সে কিভাবে আয় করে এবং কিভাবে তা ব্যয় করে থাকে। ইসলামি অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান এ অর্থে যে ইহা বস্তুগত উৎপাদন, পণ্য বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান দেয়।"

৭. প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফয়সল আল সাউদ বলেন, Islamic Economics is the science of how man uses resources and means of production to study his worldly needs according to a predetermined code given by Allah (SWT) in order to achieve the greatest equity.
অর্থাৎ "ইসলামি অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আওতায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মানুষের পার্থিব চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।"

৮. তুরস্কের অর্থনীতিবিদ সাবাহ্ ইলদিন জাইমের মতে- "ইসলামি আদর্শ পালনের ক্ষেত্রেও অর্থনীতি অবদান রাখে। এর মাধ্যমে ইসলামি অর্থনীতি মানুষকে তার সার্বিক প্রয়োজন মেটানোসহ উচ্চতর আদর্শসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করে।"

৯. মনজের কাহফের মতে, "An Islamic Economics deals with the system where the Islamic laws and institutions prevail and where the majority of its individuals believe in the Islamic ideology and practice as their way of life." অর্থাৎ "ইসলামি অর্থনীতি এমন একটি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে যেখানে ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান থাকে এবং অধিকাংশ মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে।"

১০. এম. ওমর চাপড়ার মতে- "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সে শাখা যা ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও পরিবেশগত ভারসাম্যের উপর অযথা হস্তপেক্ষ না করে ইসলামি শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের মাধ্যমে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।"

১১. এম. নেজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেন, "Islamic Economics is the Muslim thinkers response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience."
অর্থাৎ "সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের কুরআন, সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তৈরি (যা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জবাবই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি।"

১২. ড. এম. এ. মান্নানের মতে- "অর্থনীতি হচ্ছে একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ইহা একটি সমন্বিত সমাজবিজ্ঞান যা বাজারজাত, বিনিময় ও বাজার বহির্ভূত একতরফা বিনিময়ের সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে এবং ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে তাদের সামাজিক ও নৈতিক পরিণতিসমূহ বিশ্লেষণ করে।"

ইসলামি অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

ইসলামি অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমাজ তথা সামাজিক কল্যাণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, মূলত ইসলামি অর্থনীতি মুসলিম মিল্লাতের অর্থনৈতিক আচরণ ও প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করে।

ইসলামি অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত উপার্জন, ব্যয়, বিনিয়োগ, ভোগ, বণ্টন, অর্থ, লেনদেন, শ্রম, মূলধন, উৎপাদন, সংগঠন, ভূমি, রাজস্ব, কর, ঋণদান ও গ্রহণ, যাকাত, সাদাকাহ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি যা কিছু জীবন উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত সেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। জীবন উপকরণের এই সম্পৃক্তি ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে কোন পর্যায়ের হতে পারে। সাধারণ অর্থশাস্ত্র নৈতিকতা নিরপেক্ষ কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থাতে নৈতিকতা একটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে অর্থনীতির বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ অর্থনীতির তুলনায় ইসলামি অর্থনীতি সীমিত। কারণ ইসলামি অর্থনীতি ঈমানদার লোকদের কার্যকলাপ নিয়েই আলোচনা করে। তবে এটা মু'মিনদের জনহিতকর কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে এটা একটি অনন্য সাধারণ শাস্ত্র।

অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিশ্লেষণ সাধারণ অর্থনীতির ন্যায় ইসলামি অর্থনীতিরও আলোচ্য বিষয় কিন্তু এখানে কুরআন মাজীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এছাড়াও হালাল উপার্জনের জন্য ইসলাম সর্বাধিক তাকীদ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

"হে মানুষ ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে, হালাল ও পবিত্র, তা থেকে খাও এবং কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা : ১৬৮)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় অর্থোপার্জন ও ব্যয় প্রক্রিয়া কুরআনের শৃঙ্খলমুক্ত নয়। বস্তুত ইসলামি অর্থনীতি কুরআনের বাণী নিয়ে আলোচনা করে।

উল্লেখ্য যে, বিগত সহস্রাধিক বছর ধরে ইসলামি পন্ডিতেরা ইসলামি অর্থনীতিতে মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

- এদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সমজাতীয় দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
- ইমাম ইবনে খালদুন ইসলামি অর্থনীতিতে মানব কল্যাণ, শ্রমবিভাগ, মূল্যতত্ত্ব, জনসংখ্যাতত্ত্ব, সরকারি অর্থব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, বাণিজ্যচক্র ও বাজার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
- ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) সরকারি আয়-ব্যয় এবং কৃষি উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।
- তুসী মানুষের চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিষয় এবং শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
- এতদ্ব্যতীত ইসলামি অর্থনীতিকে যারা সংজ্ঞায়িত করেছেন তাদের কাছেও ইসলামি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়েছে।
- ডঃ এম. আকরাম খানের মতে, "সবার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতিগত সম্পদ সংগঠিতকরণ ও মানবকল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনই ইসলামি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
- অর্থনীতিবিদ শামসুল আলমের মতে, "অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানব কল্যাণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ যা ইসলামি দৃষ্টিতে বিশ্লেষণমূলক।"

- অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের মতে, "ইসলামি অর্থনীতির বিষয়বস্তু সেসব অর্থনৈতিক বিষয়াবলী যা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত মূল্যবোধের গভীরে নিহিত।"
- সময়ের প্রবাহে মানব জীবনের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তি সত্তার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

বস্তুত ইসলামি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামি নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের অবকাঠামোর অধীনে সীমিত সম্পদের ব্যবহারিক প্রশাসন। অর্থনীতি কেবল মানব কল্যাণের বস্তুগত কারণসমূহই আলোচনা করে না বরং ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-নিষেধসমূহ আলোচনা করে। ইসলামি অর্থনীতিতে ভোক্তা কিংবা উৎপাদনকারী কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। উভয় পক্ষের আচরণই শরীআত নির্ধারিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণমুখী ভাবধারায় পরিচালিত।

ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্ব

১. এর নীতিমালা, তত্ত্ব ও সূত্র কুরআন ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত।
২. ইসলাম বস্তুগত কল্যাণের চেয়ে রূহানী বা আধ্যাত্মিক কল্যাণের ওপর জোর দেয়।
৩. ইসলামি অর্থনীতিতে তাকওয়ার মূল্য অনেক বেশি। এটা আল্লাহর অনুমোদিত পথ।
৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় আখিরাত চিন্তা প্রাধান্য পায়।
৫. এতে হালাল-হারাম বেছে চলা হয়।
৬. ইসলামি অর্থনীতি ইসলাম ধর্মের মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৭. কুরআন-সুন্নাহর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত।
৮. যা মানব কল্যাণ সাধন করে না এবং আল্লাহর পথের অন্তরায়, তা সম্পদ নয়। যেমন- হিরোইন, মদ, তাড়ি, গাঁজা, বিয়ার, আফিম ইত্যাদি।
৯. ইসলাম মানুষকে ভোগের চেয়ে ত্যাগের নির্দেশ দেয়।
১০. ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। মানুষ সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পদের ওপর মানুষের আপেক্ষিক মালিকানা বলা যেতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থা ভেদে তা ব্যয়, ভোগ ও নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহর আইনের আওতায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. অর্থনীতি কোন বিজ্ঞানের একটি শাখা ?
২. অর্থনীতি কোন বিষয়ে আলোচনা করে ?
৩. অর্থনীতি হচ্ছে সংস্কার পরিচালনার কলাকৌশল- এটা কার অভিমত ?
৪. এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত সংজ্ঞায় কোন দিকটি নেই ?
৫. লিওনেল রবিনস প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞায় কোন কোন দিকের উল্লেখ নেই ?
৬. পাশ্চাত্য জগতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন কে ?
৭. কোন ধরণের লোকদের আচরণ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয় ?
৮. মুসলিম উম্মাহর আকীদা কী ?
৯. ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি জীবন ধারণের কী ?
১০. ইসলামি অর্থনীতির উৎস কী ?
১১. ইসলামি অর্থনীতির লক্ষ্য কী ?
১২. ইসলামি অর্থনীতির নীতিমালা কোথা থেকে গৃহীত হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতির গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি লিখুন।
২. স্মিথ ও মার্শালের সংজ্ঞা দুটো বিশ্লেষণ করুন।
৩. রবিনসের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন।
৪. অর্থনীতির বিষয়বস্তু কী ?
৫. ইসলামি অর্থনীতি কী ?
৬. ইসলামি অর্থনীতির দর্শন বা ভিত্তি কী ?
৭. ড. এম. ওমর চাপড়া ও ড. এম. এ মান্নানের মতে অর্থনীতির বিষয়বস্তু নিরূপণ করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. অর্থনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু লিখুন।
২. ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু নিরূপণ করুন।

পাঠ ঃ ২

ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- সকল কর্মকান্ডে শরীআর বিধান মান্য করা আবশ্যক-তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- আদল ও ন্যায়বিচারের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান বলতে পারবেন।
- ইসলামে সন্ন্যাসবাদের কোন স্থান নেই-তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথে ব্যয় করার গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার এর গুরুত্ব তুরে ধরতে পারবেন।
- ইসলামে ধন-সম্পদ বণ্টনে ইনসাফের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শাখা হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি আদর্শের মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি উপলক্ষ ও উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামি অর্থনীতির মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। যুগে যুগে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ গবেষণা করে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের রচনার উপর নির্ভর করে ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য তথা মূলনীতিগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সকল ক্ষেত্রে 'আমর বিল মারুফ' 'নাহি আনিল মুনকার'-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'তাযকিয়া' ও 'তাকওয়া' অর্জন।

'আমর বিল মারুফ' বা সৎ কাজের আদেশ (অন্য কথায় সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং 'নাহি আনিল মুনকার' বা অন্যায় কাজের নিষেধ (অন্য কথায় দুর্নীতির উচ্ছেদ) ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি। যে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যুগপৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্য বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেই সেই অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় এবং মজলুমের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ফরিয়াদে দিগন্ত হয়ে ওঠে সচকিত। আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের বিধান নেই বলেই পুঁজিবাদ মানুষের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু সেই অর্থনীতি সচল রাখার উদ্দেশ্যে কৌশল বদলানো হচ্ছে বারবার। কখনও বা মার্কেন্টাইলিজমকে দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব, কখনও বা অদৃশ্য হস্তকে। আবার কখনও গুরুত্ব পেয়েছে Welfare Economics, কখনও ও বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রেসক্রিপশন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। নৈতিকতা বিবর্জিত ও ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সৃষ্ট সংকট মোচনের দায়িত্ব শেষ অবধি রাষ্ট্রকে নিতে হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস বা Structural adjustment-এর কথা। কিন্তু ইতোমধ্যেই এর বিপক্ষেও তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। এরই প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে কঠোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎসাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।"

বস্তুতপক্ষে মানুষের মধ্যে সমাজের সকল স্তরে সত্য ও মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তারই প্রতিবিধানের জন্যে সুনীতির স্বপক্ষে ও দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের এ নির্দেশ অমোঘ ও কালজয়ী। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একথা অধিক প্রযোজ্য।

এ নীতি প্রয়োগের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তার জীবন ও সমাজকে পবিত্র করা। দোখাভীতি বা তাকওয়া এরই ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিধানের মূল লক্ষ্য হলো ইহকালীন জীবনে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালনার মাধ্যমে তাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্য তাকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ বা পবিত্র হতে হবে। আল্লাহভীতি এর অপরিহার্য সোপান। যার মধ্যে আল্লাহভীতি রয়েছে সে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়া অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোন জাগতিক আইন, বিধি-নিষেধ এমনকি জেল-যুলুমও মানুষকে অন্যায় ও কলুষতা হতে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এ বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা নিছক খেয়াল-খুশীর বশে মানুষ সৃষ্টি করেননি। তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এর পেছনে অন্তর্নিহিত ছিল। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই তাঁর গোচরীভূত। সকল কাজের পুরস্কার বা তিরস্কারের তিনিই মালিক, এ বোধ-বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শুধু শাস্তিমূলক অবস্থা কাউকে অসৎ কাজ হতে স্থায়ীভাবে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এজন্যই ইসলামে আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের সাথে সাথে তাযকিয়া ও তাকওয়ার ওপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতিসমূহের মধ্যে এটি সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে।

সকল কর্মকান্ডেই শরীআহর বিধান মান্য করা

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কিছু কিছু পেশা, খাদ্য ও পানীয় এবং কর্মকান্ডকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐসব কাজ করা এবং খাদ্য ও পানীয় ভোগ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল কিছু হারাম বা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير.

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, এগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।" (সূরা আল-বাকরা : ২১৯)

সরকার বা আইন পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদেই কোন কাজকে বৈধ আবার কোন কাজকে অবৈধ বলে চিন্নিত করে থাকে। মানুষের মনগড়া মতবাদেই কেবল এ সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে একই ধরনের কাজ একবার আইনত নিষিদ্ধ আবার অন্য সময়ে আইনত সিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ পান ও মদ তৈরি নিষিদ্ধকরণ ও পরবর্তীকালে পুনরায় অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু ইসলামে এ ধরনের মনগড়া সিদ্ধ-নিষিদ্ধের সুযোগ রাখা হয়নি। যা সিদ্ধ বা বৈধ তা চিরকালের জন্য ও সকলের জন্যেই বৈধ এবং যা নিষিদ্ধ বা অবৈধ তাও চিরকালের জন্যে ও সকলের জন্যেই অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ মদের উল্লেখ করা যেতে পারে। গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আঠারো বছর বয়সের নিচে মদপান নিষিদ্ধ। কিন্তু যেদিন পরিবারের ছেলেমেয়ের কারো বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয় সেদিন ঘটা করে মদ্যপানের উৎসব করা হয়। এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ ও মানসিকতার সুযোগ ইসলামে নেই। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অনুমতি থাকলে বা আইনের বিধান করে নিলে যেকোন সমাজ বিধ্বংসী ও মানবতার জন্যে অবমাননাকর কাজও বৈধতা পেয়ে যায়। জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি এর জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। প্রথমটি সমাজ বিধ্বংসী এবং পরবর্তীটি মানবতার জন্যে অবমাননাকর। কিন্তু যথোপযুক্ত ফি দিয়ে লাইসেন্স করে নিলে কি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই এ দু'টি কাজ শুধু বৈধতা লাভ করেনা, সমাজেরও অনুমোদন পেয়ে যায়। বিপরীতক্রমে যা হালাল বা বৈধ তা প্রাপ্তির বা অর্জনের চেষ্টা করা এবং যা হারাম বা অবৈধ তা পরিত্যাগ বা বর্জনের চেষ্টা করা ইসলামি জীবন বিধান তথা ইসলামি অর্থনীতির দাবি।

ইসলামি বিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। সেজন্যে সে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং যে কোন পরিমাণ অর্থও উপার্জন করতে পারে। তার এ বৈধ মালিকানা থেকে তাকে বঞ্চিত করার কেউ নেই। তবে হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থায় এক কর্পদকও উপার্জন করার তার অনুমতি নেই। বরং হারাম পদ্ধতিতে উপার্জন থেকে তাকে আইন প্রয়োগ করেই বিরত রাখা হবে। এক্ষেত্রে অপরাধের পর্যায় বা গুরুত্ব অনুসারে তাকে অবশ্যই কারাদন্ড বা অর্থদন্ড দেয়া যেতে পারে ; এমনকি তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করা যেতে পারে।

আদল (ন্যায়বিচার) ও ইহসান (কল্যাণ)-এর প্রয়োগ

আদল (ন্যায় বিচার) ও ইহসান (কল্যাণের প্রতিষ্ঠা) ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইসলামি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবেই প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন ইজমের অর্থনীতিতে সুবিচারের এ প্রসংগটি একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানে বরং মানুষের স্বাভাবিকতা বা ফিতরাতের বিরোধী নীতিই কার্যকর রয়েছে। ঐ সব অর্থনীতিতে দুর্বলের, দরিদ্রের, বঞ্চিতের তথা সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের জন্যে স্বীকৃত কোন অর্থনৈতিক

অধিকার ছিল না। পর পর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দা এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রচন্ড চাপের মুখে পরবর্তীকালে কিছু কিছু কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এ সমাজে একচেটিয়া কারবারী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ঘৃণ্য চোরাকারবারী ধনী মজুতদার ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলার কথাই আইনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী হচ্ছে। ধনবৈষম্য হচ্ছে আরও প্রকট। ইউএনডিপির সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বিলম্বে হলেও এ সত্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে সমাজে জবাবদিহিতার উপস্থিতি অপরিহার্য। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) আমলে মদীনার জনগণের মধ্যে বিলিকৃত কাপড় সকলেই পেয়েছিলেন এক খন্ড করে। কিন্তু তিনি কিভাবে দু'খন্ড কাপড় ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন তার জবাব দিতে হয়েছিল জনতার সামনে খুতবা দেয়ার পূর্বেই। আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূল (সা) -এর জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হাজির হতে হয়েছিল কাযীর এজলাসে সাধারণ নাগরিকের মতোই। বর্মের মালিকানার সেই মামলায় তিনি হেরে গিয়েছিলেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের যুগেও বিচারের এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ন্যায়বিচারের অন্য অর্থ সমাজ হতে অন্যায় ও যুলমের উচ্ছেদ এবং সবলের প্রতিরোধ। ইসলামি শরীআর ব্যাত্যয় যুলমকেই ডেকে আনে। তার সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীই প্রতারিত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যেই ইসলামি অর্থনীতিতে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ ইসলামি বিধানের অপরিহার্য অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সূরা মায়িদার ৮নং আয়াতে বলেন- اعدلوا هو أقرب للتقوى ۔ "তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর, এটা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী।" একই সঙ্গে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটি ইসলামি অর্থনীতিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। ইহসান সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ۔ "আর তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন।" দুর্বলের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকে কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলত এ কারণেই যাকাতের মত একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উশর, সাদাকাতুল ফিতর ও করযে হাসানা। সমাজে যারা অসহায় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তাদের সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হয় যদি যথোচিতভাবে যাকাত ও উশর আদায় ও বণ্টন হয়, ফিতরা প্রদান করা হয় এবং করযে হাসানার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়। দুর্বল, বঞ্চিত, ইয়াতীম, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, পীড়িত ও আর্তজনেরা অর্থনৈতিক এ কল্যাণ ইসলামি সমাজে পেয়ে থাকে তাদের অধিকার হিসেবেই, দয়ার দান হিসেবে নয়।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়াস

ইসলাম সর্বস্ব ত্যাগের বা সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, আকণ্ঠ ভোগের বা চরম আসক্তিরও ধর্ম নয়। বরং ত্যাগ ও ভোগ এ দুয়ের মাঝামাঝি জীবন যাপনের জন্যেই ইসলামে তাগিদ দেয়া হয়েছে। যে সংসারত্যাগী সে কৃষক অর্থনৈতিক কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার জন্যে আদৌ আগ্রহ বোধ করে না। তাই দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করা তার সাধ্য বা ক্ষমতা বহির্ভূত। অপরপক্ষে যে ভোগী, যেকোন উপায়ে ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করাই তার একান্ত বাসনা। ভোগ করার জন্যে, নিজের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করার জন্যে সব রকম উপায়ে সে ধন-সম্পদ উপার্জনে সচেষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে তার কাছে ন্যায়নীতি বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন যেমন তুচ্ছ তেমনি পরের কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা তার কাছে মুর্খতা। এক্ষেত্রে নিজে তো সে কৃপণতা করেই অন্যকেও কৃপণাতায় প্ররোচিত করে। কৃপণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ব্যয় সংকুচিত হওয়া। ফলে চাহিদা সংকুচিত হওয়া এবং পরিণামে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সংকুচিত হওয়া। অর্থনীতিতে এর পরিণাম নিদারুণ অশুভ।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের মূল বক্তব্যই হলো নিজে সৎ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা করা, অন্যকেও সেভাবে বাঁচতে সহযোগিতা করা। প্রকৃত মুসলমান আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের জন্যে না নিজের সব মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনাকে বিসর্জন দেবে, না অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে। বরং কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে তার যাত্রার সহযোগী করে নেবে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের।

মহান আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله.

"যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে"। (সূরা আন-নিসা : ৩৭)

তিনি আরও বলেন-

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.

"নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাইল : ২৭)
বরং তিনি ব্যয়ের ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে-

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا . وكان بين ذلك قواما .

"এবং যারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করনো, কৃপণতা ও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৭)

ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছে। আল-কুরআনে নিকটাত্মীয়-স্বজনেরও হক প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সহায়তা করা তার সামাজিক দায়িত্ব। এভাবে কোন জাতির বা দেশের এক একটি পরিবার যদি স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে দেশ হতে দারিদ্র্য যেমন দূর হবে তেমনি পরমুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যাও হ্রাস পাবে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.

"তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা আল-জারিয়াহ : ১৯)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.

"তুমি আত্মীয়-স্বজন ও গরিব এবং পথের কাঙ্গালগণকে তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (সূরা বনী ইসরাইল : ২৬)
উপরের আয়াত দু'টি হতে সুস্পষ্টভাবে এ তথ্য প্রতিভাত হয় যে, বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষত আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া ঈমানী দায়িত্ব।
যাকাতের অর্থ প্রদান সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের জন্যে বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে কুরআনুল কারীমের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে তাদের জন্যে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের বঞ্চিত ভাগ্যাহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এ অর্থ ব্যয় করা বাধ্যতামূলক।
পৃথিবীর অন্য কোনও অর্থনৈতিক সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত লোকের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি

বেকারত্ব এক সর্বগ্রাসী অভিশাপ। বেকারত্ব দারিদ্র ডেকে আনে এবং বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া অনেকে মুলধনের অভাবে কোন কর্মের সংস্থান করতে পারে না। ইসলামি সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। এজন্য ইসলাম নির্দেশিত যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের অভাব বিমোচন করা হয়। যাকাত ও সাদাকাহর অর্থ সংগ্রহ করে ইসলামি সমাজে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় এবং লোকদের বেকার হাতকে কর্মীর হাতে ও ভিক্ষুকের হাতকে দাতার হাতে পরিণত করে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথেই ব্যয়

ইসলামি বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিন্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, ভোগ, বণ্টন, উৎপাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামি বিধান অনুযায়ী যে কেউই স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যে সমস্ত বিষয় শরীআর দৃষ্টিতে

হালাল বা বৈধ সেসবের উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও সেসব উপায়ে উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালার অন্যতম মুখ্য নীতি হচ্ছে- 'আমর বিল মারুফ' বা সৎ কাজের আদেশ অর্থাৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং 'নাহী আনিল মুনকার' বা অসৎ কাজের নিষেধ অর্থাৎ দুর্নীতির উচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

يٰأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.

"হে মানব ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তোমরা তা থেকে আহার কর। কখনো শয়তানের পথ অনুসরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৬৮)
আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله .

"আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব খাদ্য দান করেছেন, তন্মধ্যে যা হালাল ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর আর আল্লাহর অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আন-নাহল : ১১৪)

ইসলামে হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের পছন্দমত যেকোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যেকোন পরিমাণ অর্থ ও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায়-পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামি অর্থনীতিতে সে সুযোগ কারো জন্যেই উন্মুক্ত থাকে না। যেসব সামগ্রীর ভোগ নিষিদ্ধ সেসবের উৎপাদন, বিপণন ও বাণিজ্য নিষিদ্ধ। সুদ যেমন নিষিদ্ধ, মদ-জুয়াও তেমনি নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে অনৈসলামিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে ইসলাম বহির্ভূত সকল মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ, বণ্টন, উৎপাদন, বিনিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই বৈধতা বিচার বা হালাল হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে বা উপযুক্ত ট্যাক্স দিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত নির্ধারিত কর ফি শুল্ক ইত্যাদি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন উৎস হতে বা যে কোন পরিমাণ আয়ই বৈধ করার সুযোগ রয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, উপার্জন, বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন শেষ সীমা বা নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন নেই। ভোগবাদী এ ব্যবস্থায় যেসব পন্থায় উৎপাদন বা যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ এবং অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রেরও অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের স্বাধীনতা বিনিয়োগ ও বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্র দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখন অবশ্য সেই অবস্থা আর নেই। পুঁজিবাদের বিলাসী জীবন ও ইন্দ্রিয় আসক্তির মোহের জোয়ারে সমাজতন্ত্র তলিয়ে গেছে। ইসলাম এ দু'ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করে না। যা বৈধ, যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা হারাম বা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জন, বণ্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ প্রধানত তিনটি। **প্রথমতঃ** অবৈধ উপায়ে আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলুম চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রমসমূহ এসব অবৈধ বা হারাম অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফসল এবং তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ সাধারণত অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যায়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন

মানুষের অর্জিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করা ইসলামের বিধান, যা ইসলামের বুনিয়াদের অন্যতম বুনিয়াদ। خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم "তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে এর মাধ্যমে আপনি সেগুলোকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পারেন।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১০৩)।
এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন-

ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء هم فترد على فقراء هم.

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ওপর সদকাহ্ ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও বর্ধিত হয়, যা অনাদায়ে কিয়ামতে কঠিন শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সূতরাং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

মৌলিক মানবিক প্রয়োজন নিশ্চিত করণ

কোন সমাজে আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, মাদকাসক্তি হতে শুরু করে এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি সমাজে ছড়িয়ে পড়বে মহামারীর মতো। এসব সর্বনাশ হতে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যথার্থ ব্যবস্থা।

ইসলাম তার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এ প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির সম্পদে সমাজের বঞ্চিতদের অধিকারের স্বীকৃতি, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ একযোগে এ গ্যারান্টিই দেয়।

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পাঁচটি- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এ প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে ইসলাম ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে যে তাগিদ দিয়েছে তার নযীর আর কোন অর্থনীতিতে নেই। মূলত এ প্রয়োজন পূরণের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ববোধ থেকেই ইসলামে বায়তুল মাল হতে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্যে ব্যয় করার বিধান রয়েছে।

ইবনে হাযম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুহাল্লাতে বলেন- "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃস্বদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এজন্যে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন।"

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের মতো অপরিহার্য মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে একদিকে মানুষ যেমন অসুস্থ, অশক্ত ও রুগ্ন হয়ে পড়বে তেমনি শিক্ষার অভাবে সে খাঁটি মানুষ হতে পারবে না। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে। নবী (সা) বদরের যুদ্ধে শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যেকের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন মদীনার দশ জন বালকবালিকাকে শিক্ষাদান করানোর বিনিময়ে। দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর পরে আজ বিশ্ববাসীর কাছে গণশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। অথচ এ প্রয়োজন পূরণের জন্যে ইসলামে কত আগেই না তাগিদ দেয়া হয়েছে। অজ্ঞতার জন্যে সেসব শিক্ষা হতে আমরা বঞ্চিত রয়েছি।

উত্তরাধিকার আইন

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় মৃত ব্যক্তির ঋণ, অসিয়ত ও দাফন খরচের পর অবশিষ্ট সম্পদ বিধান মত তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টনের সুব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ব্যয়-বন্টনে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহকালীন কর্মকান্ডের জন্যে পরকালীন মুক্তি বা শান্তির এমন দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে দুনিয়াকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে ইসলামে কর্মবীর হতে বলা হয়েছে। খৃষ্ট ধর্মে সকল পাপের ভারবহনকারী হবেন যীশু। পরকালে তিনিই হবেন পরম পরিত্রাত্মা। সূতরাং তাঁর ওপর বিশ্বাস ও দায়িত্ব অর্পণ করে দুনিয়ার সকল বৈধ-অবৈধ ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়ায় যেমন বাধা নেই, তেমনি বাধ্য-বাধকতা নেই উপায়-উপার্জনের এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান মেনে চলার। হিন্দু ধর্মে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুলিখিত অর্থনৈতিক আচরণ বিধিই নেই। বরং খৃষ্ট, হিন্দু ও ইহুদী- পৃথিবীর এ তিনটি ধর্ম একযোগে পুঁজিবাদকেই বরণ করে নিয়েছে।

এরই বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ ইসলামে অর্থনৈতিক সুকৃতি বা হালাল কাজের জন্যে ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, গরীব-দুঃখীদের কোন উপকারে সচেষ্ট হবে না বরং হারাম কাজে অংশ নেবে যারা তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।" (সূরা আত্-তাওবা : ৩৪)

তাই ইসলামি জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামি অর্থনীতিতে আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রতি এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের শেষে মুনাজাতেরও বান্দা আল্লাহর কাছে যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণই প্রার্থনা করে। আখিরাত যে মুসলমানের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা অনুধাবনের জন্যে রাসূলে করীমের (সা) একটি মাত্র উক্তি যথেষ্ট। তিনি বলেন- এ দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে এখানে যে যেমন বীজ বুনবে অর্থাৎ কাজ করবে আখিরাতে সে তেমন শস্য বা প্রতিফল পাবে। প্রকৃতপক্ষে তাযকিয়া অর্জন ও তাকওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলে এবং আখিরাতকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে ইহকালের জীবনধারা খোদায়ী বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে বাধ্য এবং এ পথেই যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

বায়তুল মাল গঠন

ইসলামি অর্থনীতিতে বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার গঠনের নির্দেশ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ বায়তুল মালে জমা থাকবে। দেশের যে কোন নিরুপায় ব্যক্তি বা নিরাশ্রয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমনকি, মৃত ব্যক্তি যদি পরিবার নিয়ে বাঁচার তাগিদে ঋণ করে থাকে এবং পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হবে। এমনিভাবে বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের সময় আর্থিক সুবিধা বিধানের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র বায়তুল মাল গঠন করে থাকে।

ধন-সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন

আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের ওপরেই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের সর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো কাছে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। বস্তুত সমাজে কি ধরনের অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করে- আয় ও সম্পদ বণ্টন সুষ্ঠু হবে, না বৈষম্যপূর্ণ হবে। ইসলামি অর্থনীতিতে সমাজে আয় ও ধনবণ্টন কিভাবে বণ্টন হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি আকীদা মোতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই এর স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। এখানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয় ও ভোগের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামত তা ব্যয়েরও সুযোগ নেই। এ মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসে সম্পদ, উপার্জন, ব্যবহার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।" (সূরা আন-নিসা : ২৯)

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে" (সূরা আল-হাশর : ৭)

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"অপব্যয় কর না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাইল : ২৬-২৭)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।" (সূরা আয-যারিয়াহ : ১৯)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"যারা স্বর্ণ, রৌপ্য, সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৪)

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "সর্বোত্তম কাজ হলো বৈধ উপায়ে উপার্জন করা।"

সুতরাং, ধন-সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতিমালার আলোকেই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই বৈষম্য ও বেইনসাফী হতে জনগণ রক্ষা পাবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামি অর্থব্যবস্থাই মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম একমাত্র অর্থ ব্যবস্থা। এটা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নেয়; অনুরূপভাবে নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতারও পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। এটা যেমন শোষণ লুণ্ঠনের সকল পথ বন্ধ করে, অপরদিকে অন্যায়, বিলাসিতা ও লালসা চরিতার্থের প্রাসাদকেও চূর্ণ করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. আমর বিল মারূফ- শব্দের অর্থ হচেছ-
ক. সৎ কাজের আদেশ; খ. সৎ কাজ করা;
গ. ইবাদত করা; ঘ. দুর্নীতি উচ্ছেদ করা।

২. তাযকিয়া শব্দের অর্থ হচেছ-
ক. আল্লাহভীতি; খ. আল্লাহর উপর ভরসা করা;
গ. আত্মশুদ্ধি; ঘ. ঈমান গ্রহণ করা।

৩. ইহসান বলতে বুঝায়-
ক. ন্যায়বিচার করা; খ. কল্যাণের প্রতিষ্ঠা;
গ. মানবতার সেবা করা; ঘ. দরিদ্রের উপর অন্যায় করা।

৪. আমরা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনের প্রয়াস পাই-
ক. ইসলামে; খ. গ্রীক দর্শনে;
গ. সন্ন্যাসবাদে; ঘ. নির্বানবাদে।

৫. হালাল উপায়ে উপার্জন ও বণ্টননীতি হচেছ-
ক. সমাজতন্ত্রের বিধান; খ. ধনতন্ত্রের বিধান;
গ. ইসলামের বিধান; ঘ. ধর্মনিরপেক্ষ বিধান।

সংক্ষিপ্ত রচনামূল উত্তর-প্রশ্ন

১. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর গুরুত্ব ইসলামি দৃষ্টিকোণের আলোকে বিচার করুন।
২. সকল কর্মকান্ডেই শরীআর অনুসরণ করতে হবে- প্রমাণ করুন।
৩. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনে প্রয়াসী-ব্যাখ্যা করুন।
৫. ইসলামে হালাল উপার্জন ও হালাল উপায়ে বণ্টনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবিক প্রয়োজন নিশ্চিত করে- আলোচনা করুন।
৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বায়তুলমাল-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৩

ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

◆ ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে পারবেন।

ইসলাম মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ, শাশ্বত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। এ ব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং মানুষের পার্থিব জগতে চলাফেরা, আদান-প্রদান, আয়-ব্যয় ইত্যাকার সকল দিক এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে অর্থোপার্জন ও ব্যয়-বণ্টন এবং ভোগ-ব্যবহার করবে, কিভাবে তাদের জাতীয় অর্থনীতি সুসংগঠিত হবে, প্রভৃতি সকল দিকের নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে।

এ অর্থ ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক এ দুই চরম ব্যবস্থা থেকে আলাদা এক বিজ্ঞানসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। এ অর্থ ব্যবস্থার কতিপয় মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল-

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বা রূপরেখা

ব্যক্তি মালিকানাঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। উপার্জনের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে, উপার্জনকারী হিসেবে সে তার মালিক হবে। ইসলাম এটাই সমর্থন করে, যাতে তার উপার্জন স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

আয় বা উপার্জন পদ্ধতিঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় আয়ের সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, বরং চারিত্রিক উন্নতি ও পরকালীন মুক্তিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। তাই অবৈধ উপায়ে উপার্জনকে ইসলাম নিষেধ করে। একমাত্র বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত পথেই অর্থোপার্জনের নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন। "হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করো না।" (সূরা : আন-নিসা)

বণ্টন পদ্ধতিঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার পর সম্পদ যেন এককেন্দ্রিক না হয়, সে লক্ষ্যে সুষম বণ্টন নীতি প্রণয়ন করেছে। এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে, "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে না থাকে।" (সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

সঞ্চয়ে নিষেধাজ্ঞাঃ মূল্য বৃদ্ধি ও অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে অধিক সম্পদ গচ্ছিত রাখা এবং যাকাত আদায় না করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রতি ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী, "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করবে ও তার যাকাত আদায় করবে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ।" (সূরা আত-তাওবা)

অবৈধ উপার্জনে নিষেধাজ্ঞাঃ ইসলাম নাপাক ও হারাম বস্তুর ব্যবসা, ভিক্ষাবৃত্তি, জবর-দখল এবং উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুদ প্রথার উচ্ছেদঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূললক্ষ্য হচেছ সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও পরোক্ষভাবে সুদ প্রথা চালু রেখেছে। ইসলামি ব্যবস্থায় সুদকে বিলুপ্ত করে ব্যবসা হালাল করা হয়েছে এবং যাকাত ও সাদাকাহর মাধ্যমে বিনা সুদে অর্থহীনদের সাহায্য করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সুদ প্রথা বিলুপ্ত করে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- " আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (আল কুরআন)

সম্পদের মালিকানাঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিক ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী নয় ; বরং সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ। মানুষ শুধু ভোগ, দখল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছামত সম্পদ ব্যয় ও কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই। এ মর্মে আল-কুরআন বলছে- "নিশ্চয়ই এ মহাবিশ্ব আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর কিছু অংশের মালিকানা দিয়ে থাকেন।" (আল-কুরআন)

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাঃ ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবায়ন শুধু জরূরি নয় বরং রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষেও তা একান্ত আবশ্যক। তাই ইসলাম ধন-সম্পদ বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ জমা না করে নিঃস্ব ও অভাবীদের মাঝে তা বণ্টন করে দিতে বাধ্য করেছে।

সম্পদহীনদের অংশ পরিশোধঃ মহান আল্লাহর সৃষ্ট জীব হিসেবে সকল মানুষেরই রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। অথচ সম্পদ দান করেছেন কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিকে। এতে বোঝা যায় যে, সম্পদ যার হাতেই থাকুক না কেন, তাতে সকলেরই অধিকার আছে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- "তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্যে গবীর-মিসকীনদেরও হক আছে।" (আল-কুরআন)

তিনি আরো বলেছেন- "তাদের (গরীবদের) হককে শষ্য কর্তনের দিনই দিয়ে দাও।" (আল-কুরআন)

যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ মানুষের অর্জিত সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করা ইসলামের বিধান, যা ইসলামের বুনিয়াদের অন্যতম। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পরিশুদ্ধ ও বর্ধিত হয়, যা অনাদায়ে কিয়ামতে কঠিন শাস্তির সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সূতরাং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

উত্তরাধিকার আইনঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় মৃত ব্যক্তির ঋণ, ওসিয়াত ও দাফন খরচের পর অবশিষ্ট সম্পদ বিধান মত তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টনের সুব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ব্যয়-বণ্টনে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ব্যয়ঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় জিহাদ বা যুদ্ধে প্রাপ্ত বিজিত সম্পদকে পাঁচ ভাগ করে- এর ৪ অংশ যোদ্ধাদের মাঝে এবং ১ অংশ জাতীয় সমাজকল্যাণকর কাজে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে।

বায়তুল মাল গঠন ঃ ইসলামি অর্থনীতিতে বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার গঠনের নির্দেশ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ বায়তুল মালে জমা থাকবে। দেশের যে কোন নিরুপায় ব্যক্তি বা নিরাশ্রয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমনকি, মৃত ব্যক্তি যদি পরিবার নিয়ে বাঁচার তাগিদে ঋণ করে থাকে এবং পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হবে। এমনিভাবে বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের সময় আর্থিক সুবিধা বিধানের জন্য ইসলামি রাষ্ট্র বায়তুল মাল গঠন করে থাকে।

সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রবর্তনঃ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম সকল শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকে। শ্রমের মর্যাদা রক্ষায় ও উন্নয়নে নৈতিকভাবে জনগণকে প্রস্তুত করে। শ্রমিক মালিককে ভাই ভাই হিসেবে একে অপরের সহযোগীতা ও সম্পূরক হিসেবে চিত্রিত করে। শ্রমিককে বলেছে নিজের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে মালিকের কাজে শ্রমবিনিয়োগ করতে। আর মালিককে বলেছে শ্রমিকের শ্রমের যথার্থ মূল্য দিতে। নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করার ও বিধান ইসলাম দেয়। শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক প্রদানের কথা বলেছে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিঃ ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পণ্যকে সহজলভ্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ, মজুদ করে মুনাফা লাভকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মূল্যনির্ধারণ করার ব্যবস্থায়ও রয়েছে। এতে গণ মানুষের সুবিধাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

শরীআত দ্বারা নিয়ন্ত্রিতঃ ইসলামি অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল- এ অর্থনীতির সকল বিষয় এবং সামগ্রীক ব্যবস্থাপনা নীতি ও আদর্শ, ইসলামি শরীআত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। শরীআত সমর্থন করে না, এমন কোন নীতি বা কর্মকান্ড ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় বরদাশত করা হবে না। কোন অবস্থায়ই শরীআত বিরোধী কোন তৎপরতা চালাতে দেয় না।

জনকল্যাণমূলকঃ ইসলামি অর্থনীতির বড় বৈশিষ্ট্য হল- এটা হচ্ছে গণমানুষের এবং জনকল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা। সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার যাবতীয় কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়। সীমিত অর্থ দিয়ে কিভাবে বৈধ উপায়ে মানুষের অসীম সমস্যাকে সমাধান করা যায় সে চিন্তাই এ অর্থ-ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। মানুষ ও মানবতার অকল্যাণকর কিছু হোক ইসলামি ব্যবস্থা তা চায় না এবং করতে দেয় না।

সুদবিহীন ব্যাংকিংঃ ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- সুদবিহীন ব্যাংকিং প্রবর্তন। সাধারণ গণমানুষের কল্যাণে সুদবিহীন লেন-দেনের ব্যবস্থা করাই ইসলামি ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য। লেন-দেনের কোন পর্যায়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থা সুদকে সমর্থন করে না। এটাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবর্তনঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামি অর্থনীতির চালিকা শক্তি। মহান আল্লাহ সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণাকে সামনে রেখে এবং জনকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলামি ব্যবসায় নীতি নির্ধারণ করেছে।

জুয়া-লটারী নিষিদ্ধঃ জুয়া ও লটারীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন মানবতার জন্যে আরও একটি অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলাম জুয়া-লটারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধঃ ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- ইসলাম সম্পদের যাবতীয় অপব্যয় ও অপচয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ক. "খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।"

খ. "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"

ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধুতা নিষিদ্ধঃ ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসততা, প্রতারণা, ফটকাবাজি, দূনীতি, ওজনে ফাঁকি, ভেজাল, মিথ্যা শপথ ইত্যাকার যাবতীয় অসাধুতা নিষিদ্ধ রয়েছে।

সারকথা

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামি অর্থ ব্যবস্থাই মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ্য একমাত্র অর্থব্যবস্থা। এটা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক এবং অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নেয়। অনুরূপভাবে এটা নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। এটা একদিকে যেমন শোষণ ও লুণ্ঠনের সকল প্রকার পথ বন্ধ করে, অপরদিকে অন্যায়, বিলাসিতা ও লালসা চরিতার্থের প্রাসাদকেও চূর্ণ করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম কোন জাতীয় জীবনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে?

ক. পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থা
খ. সমাজবাদী জীবনব্যবস্থা
গ. পূর্ণাঙ্গ ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণজীবন ব্যবস্থা
ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

২. যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন-

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য
খ. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
গ. সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
ঘ. ধর্মনিরপেক্ষ অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমাল ব্যয়ের খাত কোনটি?

ক. নিরাশ্রয়ের রক্ষণাবেক্ষণ
খ. মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায়
গ. জরূরি অবস্থার সময় ব্যয় করা
ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

৪. নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই-এটি কার বাণী?

ক. ইসলামের
খ. হাদীসের
গ. মহান আল্লাহর
ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

◆ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনা করতে পারবেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু সিসটেম বা ব্যবস্থা ও মতবাদের উত্থান-পতন ঘটেছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মুক্তির উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে নৈরাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ফ্যাসীবাদ এবং ইসলামি অর্থনৈতিক মতবাদের জন্ম হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে আধুনিক তথা সাধারণ অর্থনৈতিক মতবাদ বলা হয়ে থাকে। এ দু'টি মতবাদই প্রান্তিক ও চরম ভাবাপন্ন এবং সর্বোপরি মানবতা বিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত। আর ইসলাম এতদুভয়ের মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও কালজয়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে।

নিম্নে ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে আধুনিক তথা সাধারণ অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হলঃ

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থা সমাজে ইসলামি আদর্শে আস্থাশীল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে আধুনিক অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করে।

২. ইসলামি অর্থব্যবস্থা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে বৈধ আয়কে অনুমোদন করে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মানবজাতি ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে ভোগ কর এবং কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" "আল-কুরআন" কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থা আয়-উপার্জনের বৈধ বা অবৈধ পথ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করে না। তা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক উপাদান নিয়েও আলোচনা করে। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতি মূলত অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা কিংবা উৎপাদক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিতে ভোক্তা কিংবা উৎপাদক সার্বভৌম ক্ষমতার দাবিদার।

৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিক নয়। আপেক্ষিক অর্থে মালিক মাত্র। পক্ষান্তরে, আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি তার সম্পত্তির চূড়ান্ত মালিক।

৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ সীমিত নয়। কিন্তু সম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করার উপায় কিংবা প্রচেষ্টা সীমিত। পক্ষান্তরে আধুনিক অর্থনীতিতে সম্পদ সীমিত।

৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগ কিংবা বণ্টন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন। পক্ষান্তরে আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ কিংবা বণ্টন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য কেবল মুনাফা অর্জন নয়। সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গরীব ও নিঃস্বদের ভোগের নিমিত্ত একতরফা বিনিময়ের (অর্থাৎ কোন দাম না নিয়ে) জন্যও ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন।

৯. বাজার অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা কার্যকরী চাহিদা (effective demand) দ্বারা নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামি অর্থনীতিতে তা কার্যকরী চাহিদা এবং গরীব ও দুঃখীর জন্য অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা (economic provisioning) বিধানের বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

১০. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পণ্য বিনিময় হচ্ছে সমন্বিত বিনিময় এবং এক তরফা হস্তান্তর (integrated exchange and one-way transfer) যা ইসলামি মূল্যবোধ, বাজার এবং বাজার বহির্ভূত উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময় সম্পূর্ণরূপে বাজার ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

১১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সমাজকল্যাণের ধারণা আধুনিক সমাজকল্যাণের ধারণা থেকে পৃথক। ইসলামি অর্থব্যবস্থা একটি লক্ষ্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা করে এবং এটা লক্ষ্য-নিরপেক্ষ নয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সমাজ কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে যা আর্থিক মানদন্ড দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ইসলাম মানবিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ত্যাগকে উৎসাহিত করে এবং এ ত্যাগের পুরস্কার মহান আল্লাহ তাআলার কাছে রক্ষিত আছে। ত্যাগ ও কল্যাণের সুস্পষ্ট নীতিমালা কুরআন ও হাদীসে বিধৃত আছে। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজকল্যাণের বিষয়টি ত্যাগের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এর মানবকল্যাণের ধারণাটিও কুরআন-হাদীস সমর্থিত ধারণা নয়।

১২. ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষ একটি সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় জীব। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে আধুনিক অর্থনীতি অনুযায়ী মানুষ শুধু একটি সামাজিক জীব। নৈতিকতার বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত।

১৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মানুষের সকল কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার নাম অভাব নয়। কুরআন-হাদীস কর্তৃক অনুমোদিত এবং মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অভাব। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থব্যবস্থায় যে কোন বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অভাব।

১৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অভাব অনিয়ন্ত্রিত এবং লাগামহীন নয়। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অভাব অনিয়ন্ত্রিত এবং অসীম।

১৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোন্ অভাবটি প্রথমে পূরণ করতে হবে সেটা ইসলামি মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কোন্ অভাবটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নীতিমালা নেই।

১৬. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অভাব পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (priority) নির্ধারণের বিষয়টি সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিবেচনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ অভাবটিই সর্বাগ্রে পূরণ করতে হবে, যদ্বারা সর্বাধিক সমাজকল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভরশীল।

১৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় দাম বহির্ভূত বাজার ব্যবস্থা থাকতে পারে। শূন্য দাম কিংবা ঋণাত্মক দামে ক্ষেত্র বিশেষে পণ্য বিনিময় চলতে পারে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে দাম বহির্ভুত কোন বাজার থাকতে পারে না। তাই ইসলামি অর্থনীতির বাজার আধুনিক অর্থনীতির বাজারের চেয়ে বড়।

১৮. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বাজার-দাম বণ্টন ধারণার (equity consideration) ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাজার-দাম মুনাফার ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠত। ফলে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বাজার-দাম আধুনিক অর্থনীতির বাজার-দামের চেয়ে নিম্ন।

১৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থা সুদবিহীন এবং সুদ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, আধুনিক অর্থনীতিতে সুদ জাতীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২০. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ভোগের পাঁচটি নীতি রয়েছে। নীতিগুলো হচ্ছে- (১) বিচার সাম্য, (২) পরিচ্ছন্নতা, (৩) আত্মসংযম, (৪) উপকারিতা এবং (৫) নৈতিক কল্যাণ। ভোগের ক্ষেত্রে এ পাঁচটি নীতি মেনে চলতে হবে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে ভোগের ক্ষেত্রে এরূপ ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই।

২১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বর্তমান ভোগ হচ্ছে প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত আয়ের (expected desirable income) অপেক্ষক। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিতে বর্তমান ভোগ হচ্ছে বর্তমান আয়ের অপেক্ষক। ইসলামি অর্থনীতি গরীব ও নিঃস্ব লোকদের প্রতি উদাসীন নয়। তাদের বর্তমান ভোগ বর্তমান আয় দ্বারা মেটানো যায় না। তাদের জন্য দান, খয়রাত ও বিভিন্ন সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করা হয়। এ আয় হচ্ছে গরীব ও নিঃস্ব লোকের জন্য প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত আয়। অনুরূপভাবে, যারা ধনী তাদের অতিরিক্ত আয়, যাকাত এবং ফিতরা প্রভৃতির মাধ্যমে বণ্টনের পর অবশিষ্ট যে আয় থাকবে, তাই হচ্ছে তাদের প্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত আয়। সুতরাং ধনী ও গরীব উভয়ের ভোগও প্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে গরিব ও নিঃস্বদের জন্য দরদ অনুভব করার কোন অবকাশ নেই। আধুনিক অর্থনীতিতে নৈতিক বিবেচনাও অনুপস্থিত। তাই আধুনিক অর্থনীতিতে বর্তমান ভোগ কেবলমাত্র বর্তমান আয়ের ওপর নির্ভরশীল। যাদের আয় নেই, তাদের ভোগ করার কোন অধিকার নেই।

২২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কার্যকরী চাহিদা কার্যকরী প্রয়োজনের সাথে (effective need) সম্পৃক্ত। কার্যকরী প্রয়োজন হচ্ছে এমন কতকগুলো মৌলিক মানবিক প্রয়োজন, যেগুলো মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। গরীব ও নিঃস্বদের ক্রয়ক্ষমতা নেই বলে তারা ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কার্যকরী প্রয়োজন থেকে কোনক্রেমেই বঞ্চিত হবে না। কার্যকরী প্রয়োজন বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল প্রয়োজনকে বুঝায়। সুতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কার্যকরী প্রয়োজন কার্যকরী চাহিদার চেয়ে ব্যাপক। অতএব ইসলামি অর্থব্যবস্থা হচেছ- কার্যকরী প্রয়োজন-কার্যকরী চাহিদা +মৌলিক প্রয়োজন -এর সমষ্টি। কিন্তু আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কার্যকরী চাহিদাই একমাত্র চাহিদা।

২৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যোগানের ধারণাটিও একটু ভিন্ন। ইসলামি অর্থনীতিতে যারা পুঁজির অভাবে উৎপাদন করতে পারে না, তাদেরকে পুঁজির যোগান দেয়াও একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করা হয়। ফলশ্রুতিতে ইসলামি অর্থনীতিতে যোগান আধুনিক অর্থনীতির যোগানের চেয়ে ভিন্ন। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যোগান হলো সম্ভাবনাময় ক্ষমতাভিত্তিক যোগান (Potential Capacity-based supply), যা কম সুবিধাপ্রাপ্ত উৎপাদকের যোগান এবং বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত উৎপাদকের যোগানের যোগফলের সমান। বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত উৎপাদক অবকাঠামোগত অসুবিধার কারণে দক্ষস্তরে উৎপাদনে সক্ষম নয়। সুতরাং ইসলামি অর্থনীতিতে মোট যোগান আধুনিক অর্থনীতির মোট যোগানের চেয়ে বড়।

২৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পছন্দ হচ্ছে (individual preference) শর্তসাপেক্ষ এবং সমাজ কল্যাণ নিরপেক্ষ নয় বরং তা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, শহরে যদি রাস্তায় অতিরিক্ত মোটরগাড়ীর ভিড় জমে যায়, তবে তা পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অতিরিক্ত শিল্প-কারখানা স্থাপনের ফলে শিল্প-কারখানার ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ হতে পারে। এ সকল বাহ্যিক প্রভাব কেবলমাত্র বেআইনী যে তা নয়, তা কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা এবং নৈতিকতারও পরিপন্থী। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত পছন্দে এরূপ কোন নৈতিকতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা সমজকল্যাণের বিবেচনা জড়িত নয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পছন্দের (individual choice or preference) ক্ষেত্রে দক্ষতার পাশাপাশি বণ্টনসাম্য (equity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে দক্ষতার বিবেচনাটাই মুখ্য।

২৫. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা কিভাবে উৎপাদিত হবে, তা উৎপাদনকারী ফার্মসমূহের মধ্যে সীমিত প্রতিযোগিতা ও সচেতন সহযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, বাজার অর্থনীতিতে তা নির্ধারিত হয় ফার্মসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বারা।

২৬. ইসলামি অর্থনীতিতে রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আয়ের সুষম বণ্টন এবং গরীব ও নিঃস্ব লোকদের মাঝে মৌলিক প্রয়োজনীয় (basic needs) দ্রব্যাদি সরবরাহ করা। ইসলামি রাজস্ব ব্যবস্থা সাধারণত এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাকাত, জিজিয়া, খারাজ বা ভূমিকর, খুমুস (khums), লুকতাহ্ রাজস্ব (lukatah revenue), সাদকাহ (sadaqah), কাফ্ফারা আদায় করে থাকে। অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিতে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় খরচ নির্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহ করা এবং করই হচ্ছে তার মোক্ষম অস্ত্র। সমাজকল্যাণের ধারণা এরূপ অর্থনীতিতে গৌণ বা অনুপস্থিত।

ওপরে বর্ণিত সাধারণ তথা আধুনিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, ইসলামি অর্থনীতিই সর্বজন গৃহীত ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানবজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম। কারণ এ উভয় ব্যবস্থা আজ মানব জাতির প্রধান ও মৌলিক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদেরকে একমাত্র কল্যাণধর্মী, আদর্শবাদী ও উদার অর্থব্যবস্থার দিকে ধাবিত হতে হবে। আর এ ব্যবস্থার নাম হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা, যা মানবতার সকল অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

একথায় উত্তর দিন

১. পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ সাধারণত কোন মতবাদের অন্তর্ভুক্ত?
২. কোন অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়?
৩. কোন অর্থনীতিতে বিনিময় সম্পূর্ণভাবে বাজারব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?
৪. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষকে একটি সামাজিক জীব হিসেবে ধারণা করা হয়?

শূন্যস্থান পূরন করুন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থা ..... ইসলামি ..... মানুষের ..... কর্মকান্ড নিয়ে..... করে।
২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ..... নয়। কিন্তু ..... ব্যবহার উপযোগী করার ..... সীমিত।
৩. ইসলামি ..... মানুষ একটি ....., নৈতিক ..... জীব।
৪. ..... অর্থব্যবস্থা ..... বিহীন এবং ..... জাতীয় ..... নয়।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থার সাথে আধুনিক অর্থব্যবস্থার তুলনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন,
- ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন,
- সমাজতন্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ঃ 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র সংজ্ঞানুসারে- "সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ জনগণের যথাযথ আনুগত্যের ওপর ভিত্তিশীল যে পলিসি অবলম্বন করে, তা-ই সমাজতন্ত্র।"

তবে বলা যেতে পারে, পুঁজিবাদের ব্যর্থতা ও কুফলের ফলে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব। এ অর্থ ব্যবস্থার মূল হলো, ধন-সম্পদের যাবতীয় উপায়-উপাদান সমাজের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মালিকানাধীন থাকবে। কার্যত সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা রাশিয়াসহ বহুদেশে একটা বড় রকমের ডিগবাজী খেয়েছে এবং ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ- ানিসহ মানুষের চিন্তা, মত ও কর্মের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না।

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা ঃ ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেন- "যে সমাজ বিজ্ঞান ইসলামি দর্শনের আলোকে মুসলিম অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তা-ই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা।"

ব্যাপক অর্থে বলা যায়- "সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীন আরোপিত আদর্শিক বিশ্বাসগত ও নৈতিক বিধি-নিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, উপার্জন, বণ্টন, ভোগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় তৎপরতা পরিচালনার জ্ঞান ও বাস্তাব কার্যক্রম গ্রহণ করে যে অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা-ই ইসলামি অথীনিতি।"

ইসলামি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের কাছ থেকে যোগ্যতানুসারে এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। এ উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করে ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রহিত করে। কিন্তু ইসলাম এমন এক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, যা বহির্কাঠামোর দিক থেকে পুঁজিবাদের সদৃশ মনে হলেও আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত। নিম্নে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য-নিরূপণ করা হল-

১. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়। এ অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সুবিচার এবং ভারসাম্যপূর্ণ তথা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত এবং নিয়ন্ত্রিকত। তবে ব্যক্তির সম্পদে রাষ্ট্র ও সমাজের অধিকার রয়েছে।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অর্থোপার্জন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। ব্যক্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী কর্মে নিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় অর্থোপার্জন করার অধিকার ব্যক্তির জন্য স্বীকৃত। অর্থের ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়ের জন্য ইসলামি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থায় সুদকে উৎসাহিত করা হয়। কেননা, ব্যাংক, বীমা ও সরকার সুদকে চালু রেখেছে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করার অধিকার রাখে। এ ব্যবস্থায় সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামি অর্থ

ব্যবস্থায় ব্যবসাকে বৈধতা দান করা হয়েছে এবং যাকাত, ফিতরা, সাদাকা ও দানের মাধ্যমে বিনা সুদে অর্থনীনদের সাহায্য করার বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি শ্রম এবং সম্পদ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি নিজে কোন সম্পদের মালিক নয়। শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে সে রাষ্ট্র থেকে রেশন ও ভাতাদি পেয়ে থাকে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা। এ ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ শুধু তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় ও সংরক্ষণ করে মাত্র।

৫. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মুক্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে খর্ব করা হয়েছে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, আত্মিক স্বাধীনতা এবং মুক্তির সমান সুযোগ রয়েছে।

৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তির মঙ্গল চিন্তার সুযোগ নেই। সে যন্ত্রের মত শ্রম দেয়, বিনিময়ে খাদ্য ও বস্ত্র পেয়ে থাকে। অপরের মঙ্গল চিন্তা করার সুযোগ এখানে নেই। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় নিজের মঙ্গল চিন্তা করে অপরের মঙ্গল চিন্তা করারও সুযোগ রয়েছে। এখানে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটানোর পর সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকলে এমন কতকগুলো বিধানের আওতায় এসে যায়, যার ফলে সে অপর ব্যক্তির প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং আর্থিক অনুদান দিতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

৭. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তির অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা হয় ইসলামি চেতনাবোধ ও নৈতিকতার বিকাশের দ্বারা। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার খেয়াল ও খুশিমত সম্পদ ভোগ না করে আল্লাহর বিধান মুতাবিক ভোগ ও বণ্টন করে।

৮. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে সমাজ বা রাষ্ট্রের গোলাম হিসেবে মনে করা হয়। এতে মনে হয় মানুষ যেন রাষ্ট্রীয় গোলামী করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় গোলাম হিসেবে চিন্তা করা হয় না। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত। তাই, ইসলাম মানুষকে শুধু সামাজিক জীবন হিসেবেই নয় বরং আদর্শিক ও নৈতিক জীবন হিসেবে সৃষ্টির সেরা বলে স্বীকৃতি দেয়।

৯. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার নিজস্ব প্রয়োজনের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রয়োজনে কাজ করে থাকে। এ অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিককে যন্ত্রের মত ব্যবস্থা করা হয়। শ্রম এবং উৎপাদন অনুসারে ভোগ করার অধিকার এখানে অনুপস্থিত। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার নিজ প্রয়োজন, সমাজ, রাষ্ট্র, অপরাপর মানুষ এমনকি অন্যান্য প্রাণীকূলের কল্যাণের জন্য ও কাজ করে থাকে।

১০. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র মূল্যায়ণ করা হয় না। ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছে তার সত্তাকে সঁপে দেয়, ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব হয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহর বান্দাহ এর তাঁর খলিফা হিসেবে অপরাপর মানুষ, সমাজ রাষ্ট্র এবং সৃষ্টিকূলের কল্যাণের জন্য কাজ করে। কাজের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন। তবে ইসলাম এ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

১১. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্যহীন ব্যবস্থার কথা বলা হলেও তা শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তাবে তাদের মধ্যেও শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা উদার অর্থ ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। ইমলামে শ্রমিক, মালিক, প্রভূ-ভৃত্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী হিসেবে কোন শ্রেণী বৈষ্যম নেই। কেননা ইসলাম সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে এবং সকলের পেশা ও কর্মকে শ্রদ্ধা করে। এখানে একজন আরেকজনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

১২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের কোন চিন্তাই করতে পারে না। সে অধিক শ্রম ব্যয় করলেও তা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

অপর দিকে ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ক্ষুন্ন করে না এবং ব্যক্তি অধিকার হরণ করে না। তবে এখানে সম্পদ এককেন্দ্রিক না করে সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করে। ফলে সকলে সম্পদের ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে।

১৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় বাজার চাহিদা ও রাষ্ট্রযন্ত্র মজুরি নির্ধারণ করে। এতে নূন্যতম মজুরির গ্যারান্টি দেওয়ার কথা বলা হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামে বাজার চাহিদা ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দিকে খেয়াল রেখে উৎপাদন ও মজুরি নির্ধারণ করা হয়।

১৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদনে কোন নৈতিক মূল্যবোধের দিকে লক্ষ রাখা হয়না। জনগণের চাহিদানুযায়ী বস্তুবাদী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে এখানে উৎপাদন করা হয়। পক্ষান্তরে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। জনগণের খেয়াল খুমিত ভোগ-বিলাসের জন্য এখানে উৎপাদন করা হয় না। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় হারাম দ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. পুঁজিবাদের ব্যর্থতা ও কুফলের উপর সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।
২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মানুষের চিন্তা, মত ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে।
৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, উপার্জন, বণ্টন ও ব্যবহারসহ সবকিছু ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশিমত নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে না।
৫. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে।
৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদনে নীতি-নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পরিচয় দিন।
২. ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিন।
৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার পাঁচটি পার্থক্য তুলে ধরুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

পাঠ ঃ ৬

অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় ইসলাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলামি অর্থনীতির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলাম বিশ্বমানবের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও কল্যাণময় অর্থ ব্যবস্থা পেশ করেছে। একমাত্র ইসলামি অর্থনীতিই বিশ্বমানবতাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারে। তাছাড়াও মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পারে। মূলতঃ ইসলামের অর্থ-দর্শন জীবন দর্শনের একটি অপরিহার্য অংশ। তাই ইসলামি জীবন দর্শন, ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা এবং অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা। এ জন্যই অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হতে পারে। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের মানব রচিত পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থ ব্যবস্থা মানবতার কল্যাণ সাধনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা কী

ইসলামি অর্থনীতি কি কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা, না বিধিবদ্ধ শাস্ত্র বা বিজ্ঞান, এ ব্যাপারে কোন কোন অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বস্তুত ইসলামি অর্থনীতি একটি সিস্টেম এবং বিধিবদ্ধ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান উভয়ই। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। আধুনিক অর্থনীতির মতোই ইসলামি অর্থনীতিও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির আচরণ নিয়ে আলোচনা করে না। তবে ইসলামি অর্থনীতিতে আধুনিক অর্থনীতির স্বার্থপরতা ও উদাসীনতার পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধে সক্রিয়। ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা হিসেবে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ যে সকল সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সারবস্তু হচ্ছে, "যে সমাজবিজ্ঞান ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তা-ই ইসলামি অর্থনীতি।" অপরদিকে যে শাস্ত্র মানব জীবনের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করে, তা আধুনিক অর্থশাস্ত্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কোন স্থান নেই।

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা আধুনিক ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই চরম ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ এককেন্দ্রিক না করে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। সূতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিরাজ করবে। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অবদানগুলো নিম্নরূপ-

দারিদ্র্য বিমোচন

সমাজের মানুষ যখন আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেও জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় না। তখন মানুষ কু-রিপু ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরাধের দিকে ধাবিত হয় এবং সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ- যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত, ওয়াসিয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ও সামগ্রীক স্বার্থে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। কাজেই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে দারিদ্রের অবসান ঘটে। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা

সমাজের এক শ্রেণীর লোক যখন সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-বসনে দিন কাটায়; পক্ষান্তরে অপর শ্রেণী অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করে, তখনই সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, চুরি-ডাকাতি, লুট-তরাজ, হিংসা-জিঘাংসা ইত্যাদি শান্তি বিনষ্টকারী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। ফলে সমাজে অশান্তি দেখা দেয় এবং প্রত্যেকে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি চালু হলে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত থাকে না ; বরং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। সমাজ এক সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে থাকে। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি

বেকারত্ব এক সর্বগ্রাসী অভিশাপ। বেকারত্ব দারিদ্র্য ডেকে আনে এবং বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া অনেকে মূলধনের অভাবে কোন কর্মের সংস্থান করতে পারে না। ইসলামি সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। এজন্য ইসলাম নির্দেশিত যাকাত, সাদকাহ, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে লোকদের অভাব বিমোচন করা হয়। যাকাত ও সাদকাহর অর্থ সংগ্রহ করে ইসলামি সমাজে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় এবং লোকদের বেকার হাতকে কর্মীর হাতে ও ভিক্ষুকের হাতকে দাতার হাতে পরিণত করে। ফলে আর্থ-সামাজিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

অর্থের লোভ দূর হয়

কথায় বলে, অর্থই অনর্থের মূল। অর্থের মোহই মানুষকে ইতর থেকে ইতরতর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। অর্থের মোহ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। এ অবস্থায় মানুষ হালাল হারামের কোন বিচার না করে। যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জন করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। আর সমাজে সৃষ্টি করে অশান্তি ও অরাজকতা। কিন্তু ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় অর্থের প্রতি উদগ্র মোহ ও লালসাকে দূরীভূত করে দিয়েছে, অর্থকে মানুষের জীবনের মূললক্ষ্য হিসেবে নয়, বরং জীবন ধারণের একটি উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এজন্য কেউ যেন অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে না পারে, ইসলাম সে ব্যবস্থা দিয়েছে। ফলে ইসলামি সমাজে অর্থের মোহ থাকে না, এ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ আল্লাহ ভীতিকে প্রাধান্য দেয়। যে কোন কর্মকান্ডে মানুষ মানুষের উপর বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর উপর যুলম-নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকে। এতে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি

ইসলামি অর্থ-দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তোলা। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সমাজে প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করে এবং সর্বদা অন্যের অভাব ও প্রয়োজন মোচনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। আল কুরআনের শিক্ষার আলোকেই মানুষ-মানুষের প্রতি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। মহানবী (সা) এর শিক্ষা এ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মাহনবী (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় আর তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত কাটায় সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সৃষ্টি হয় এবং অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়।

সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি

ইসলামি অর্থ-দর্শনে একই সাথে ব্যক্তি স্বার্থ ও সামগ্রীক স্বার্থ বিজড়িত। তাই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এতে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, বদান্যতা, মহানুভবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধমূক মহৎ গুণরাজিরও বিকাশ ঘটে। আর পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্যও বটে। যেমন- এখানে ধনী-দরিদ্র ও মালিক-শ্রমিককে বিপক্ষ না ধরে বরং পরস্পরের বন্ধু হিসেবে মনে করা হয়। এ অর্থ ব্যবস্থায় একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। প্রভূ-ভৃত্য হিসেবে নয়। যার ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।

অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

মূলত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের-ই নামান্তর। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার ও অবিচার দূর হয়ে সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন

ইসলাম ন্যায়বিচারমূলক জীবনবিধান নিশ্চিত করে। তাই শ্রেণীবৈষম্য ইসলামি অর্থনীতিতে স্থান পায় না। অন্য যে কোন সমাজে দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর মানুষ সমাজে সীমাহীন সম্পদের প্রাচুর্যে গা ভাসিয়ে দেয়। আর অপর শ্রেণী বঞ্চিত, নিঃস্ব হয়ে মানবেতরভাবে বেঁচে থাকে। ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেই এরূপ বৈষম্য দূর করা যায়। এজন্যে ইসলাম যাকাত, ফিতরা, বায়তুল মাল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে।

উত্তরাধিকার বণ্টনের ফলে শান্তি

উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টনের ক্ষেত্রে সমাজে অনেক সময় সংঘাতের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অনেক সমাজে উত্তরাধিকার বণ্টনের সুষ্ঠু বিধান নেই। ফলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু

উত্তরাধিকার নীতি রয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার নীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ যথার্থ বণ্টিত হয়। ফলে সম্পদ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিলি বণ্টন নিয়ে বহু বিবাদ-কলহ থেকে সমাজ মুক্ত হয়। মানুষ সম্পদের অভাবে অর্থনৈতিক দৈন্যতায় ভোগে না। আর এতে সমাজে সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ

অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কালোবাজারী সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অনাচার যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, মজুতদারী, মুনাফাকারী, কালোবাজারীসহ অন্যান্য নৈতিকতা বিরোধী ব্যবসা-বাণিজ্যকে হারাম তথা নিষিদ্ধ করেছে। ফলে ইসলামি সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং এ সংক্রান্ত জটিলতা থেকে সমাজ নিরাপদ থাকে।

শোষণমুক্ত নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা

বস্তুত ইসলামি অর্থ-দর্শন হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সম্পূর্ণ সোপর্দ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। কাজেই বস্তুবাদী অর্থ ব্যবস্থার সুপ্ত শোষণের মনোবৃত্তি এখানে অনুপস্থিত। H.G.Wells তাই যথার্থই বলেছেন, ইসলাম যে সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে, তা ইতিহাসে নজীরবিহীন। কাজেই শোষণ মুক্ত নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

সারকথা

ইসলামি অর্থ-দর্শন হচ্ছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিজকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এখানে সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থার নির্দেশ রয়েছে। তাই, কোন মানুষই এ অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হয় না। এ অর্থ ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিকের বৈষম্য স্বীকার করা হয় না। শ্রমিক মালিক একে-অপরের সম্পূরক হিসেবে এখানে বিবেচনা করা হয়। তাই, মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণ-নির্যাতন করে না। বরং শ্রমিককে তার জীবন-নির্বাহ করার জন্য উপযুক্ত বেতন-ভাতাদি প্রদানের তাগিদ করে। ফলে, একে অপরের বন্ধু-হিসেবে কাজ করে। ফলে সমাজে শান্তি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিরাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থ দর্শন হচ্ছে-

ক. জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ
খ. বস্তু দর্শনের অংশ
গ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অংশ
ঘ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অংশ

২. কোন অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় ?

ক. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়
খ. সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায়
গ. ধর্মনিরপেক্ষ অর্থব্যবস্থায়
ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থায়।

৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

ক. এটি দারিদ্রের অবসান ঘটায়
খ. এটি সামজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
গ. এটি সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সৃষ্টি করে
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বুঝায় ? লিখুন।
২. সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনে ইসলামি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরুন।
৩. সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৪. অর্থনৈতিক সুবিচার এবং শোষণমুক্ত নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামি অর্থব্যবস্থার অবদান উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থব্যবস্থার অবদান বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন।

ইউনিট ২

ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন

মানুষের জীবন অপরিহার্য প্রয়োজন ও আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরছে। মানুষের অসংখ্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনকে বৈষয়িক বা বস্তুতান্ত্রিক এবং নৈতিক বা মানবিক প্রয়োজন এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই প্রয়োজনগুলো পূরণ না করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না বা জীবনধারণ করতে পারে না। মানুষের এই প্রয়োজন কেবল ব্যক্তি জীবনেই অনুভূত হয় না, সমাজ ও জাতীয় জীবনেও এটা অনিবার্য। সমাজের মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন পূরণ হয় তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান, লেন-দেন ও সহযোগীতার মাধ্যমে। এ কারণে প্রত্যেকটি প্রয়োজনেরই দু'টি দিক অবশ্যম্ভাবী। একটি তার ব্যক্তিগত অপরটি সামাজিক। এ উভয় দিকের সকল প্রয়োজন পূরণ হওয়া ছাড়া মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখিন হতে বাধ্য।

মানুষের এই উভয়বিধ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবতীয় অপরিহার্য উপায়-উপাদান মানব সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির বুকে পূর্ব থেকেই মহান আল্লাহ একত্রিত করে রেখেছেন।

মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যে সকল উপাদান আবশ্যক তা বিশ্ব প্রকৃতির বুকে অফুরন্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু তা উপার্জন সাপেক্ষ। মানুষের শ্রম-মেহনতের সাহায্যেই তাকে ব্যবাহারোপযোগি করে তোলা আবশ্যক, তার সাথে শ্রম যুক্ত না হলে তা মানুষের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

বস্তুতঃ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পদ উৎপাদন আবশ্যক। এ জন্য অর্থশাস্ত্রে মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ নির্দেশ করতে গিয়ে উৎপাদনকে একটি সতন্ত্র বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতি মূলতঃ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন শুধু রাষ্ট্রের জন্য। কারণ তাদের নিকট ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই নেই। প্রতিটি মানুষ রাষ্ট্রের জন্য উৎপাদন ঘটাবে। তারা শুধু জীবনধারণের পরিমাণ অংশই পাবে। অবশ্য এখন সোসালিষ্ট ব- কে উৎপাদন ক্ষেত্রে কিছুটা সংস্কার পরিলক্ষিত হলেও তাদের অর্থনীতি ইসলামের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য। কারণ ব্যক্তি মালিকানা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবগত অভ্যাস। আর ইসলাম হল ফিতরাতের ধর্ম। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদীদের নিকট উৎপাদনের লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানা অর্জন করতে গিয়ে মানুষ অসদুপায় অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু ইসলাম এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এতে রয়েছে ব্যক্তি মালিকানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। কিন্তু তা অন্যের ক্ষতি সাধন করে নয়। এছাড়া উৎপাদন ক্ষেত্রে ইসলামে রয়েছে কিছু বিধি-নিষেধ যা অনুসরণ করলে গোটা মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।

আলোচ্য ইউনিটে ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটকে ৫টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা।
- ❖ পাঠ-২ : উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শ্রম।
- ❖ পাঠ-৩ : উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধন।
- ❖ পাঠ-৪ : উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমি।
- ❖ পাঠ-৫ : উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সংগঠন।

পাঠ ঃ ১

ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য
এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-
- অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন কি তা বলতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- উৎপাদনের উপকরণের বর্ণনা দিতে পারবেন।

অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন

ব্যাপক অর্থে উৎপাদন বলতে কোন কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। কেননা মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। বরং তার গঠন-আকৃতি পরিবর্তন করে এক নতুন প্রকৃতি তৈরি করতে পারে। মানুষের এই নতুন আকৃতি সৃষ্টির নামই উৎপাদন।
প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের মতে, মৌলিক (Material) দ্রব্যসামগ্রীর নতুন সৃষ্টিই উৎপাদন।
মার্শাল বলেন- এ পৃথিবীতে মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। কোন বস্তুর মৌলিক অবকাঠামোকে নতুন রূপে পরিবর্তন করতে পারে মাত্র।
আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদগণের মতে, ব্যাবহার উপযোগী কোন সামগ্রী তৈরিই উৎপাদন।
Cairn Cross Zvi Introduction to Economics গ্রন্থে বলেন- The making of good for sale or the rending of paid services.
অতএব উৎপাদন হল- নির্দিষ্ট সময়ে মানবীয় শ্রম-শক্তি ও মৌলিক বস্তুর (Material Thinks) সন্নিবেশন ও উত্তম বস্তু সৃষ্টির প্রচেষ্টা যা মানুষের অভাব পূরণ করে। আর এ শ্রম বা প্রচেষ্টা বস্তুর আকৃতি ধ্বংস বা পরিবর্তন করেও হতে পারে আবার তাকে স্থানান্তর বা গুদামজাতকরণের মাধ্যমেও হতে পারে। একই ভাবে ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির প্রগতির প্রচেষ্টাও হতে পারে। যেমন- শিক্ষা ও চিকিৎসা।

ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা

১. উৎপাদনে উৎসাহ দান ঃ ইসলাম মানুষকে উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করেছে। রাসূল (সা) বলেন-

ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة.

"যখন কোন মুসলমান বীজ বপন করে অথবা শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ অথবা প্রাণি ভক্ষণ করে তখন ওটা ঐ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সাদকাহ বা দান হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)
অত্র হাদীসে মুসলিম ব্যাক্তিকে উৎপাদনের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তার এ উৎসাহ শুধুমাত্র ইহকালিন সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেই সীমিত নয় বরং পরকালিন শান্তিতেও বিস্তৃত।
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উৎপাদন ও শ্রমকে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং একে ইহ ও পরকালিন সৌভাগ্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

"নারী ও পুরুষ যে কেউ সৎকর্ম সম্পাদন করবে এমতাবস্থায় যে সে মুমিন, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।" (সূরা আন- নাহল : ৯৭)

২. ইবাদতের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক ঃ অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

"তিনিই তো তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিঝক আহার কর। আর তাঁর কাছেই তো পুনরুত্থান হবে।" (সূরা আল-মুলক : ১৫)
তিনি আরো বলেন ঃ

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

"যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও তাকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল-জুমুআহ : ১০)
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

من امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি নিজ হাতে উৎপাদন ও শ্রম করতে যেয়ে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্থভাবে সন্ধ্যায় ফিরে আসে কিয়ামত দিবসে তাকে নিষ্পাপ অবস্থায় উঠানো হবে।" (তাবরানী ঃ আল-আওসাত)
আল-কুরআনে মহান আল্লাহ রিযক অন্বেষণকারীকে আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীর পর্যায়ভুক্ত ঘোষণা করেছেন ঃ

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.

"কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। " (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০)

কোন কোন স্থানে রাসূল (সা) রিযক অন্বেষণের প্রচেষ্টাকে ইবাদত বন্দেগীর উচ্চতর স্তর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্মুখে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল যে ব্যক্তি অধিক মাত্রায় ইবাদত করে, তখন রাসূল (সা) বললেন, তার ভরণপোষন কে করে ? সাহাবীগণ বললেন, তার ভাই। রাসূল (সা) বললেনঃ اخوه اعبد منه তার ভাই তার চেয়ে অধিক ইবাদতকারী। (সুয়ুতী : জামে উসসগীর)

৩. পৃথিবী আবাদকরণের নির্দেশ ঃ মহান আল্লাহ এ পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু মানুষের জন্য বাধ্যগত করেছেন। গোটা বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়ানো ছিটানো আল্লাহর অনুগ্রহ রাজির একত্রিকরণ ও এসব উপকরণকে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন সৃষ্টি এবং পৃথিবী আবাদ করা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। এ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.

"আমি ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলল, হে আমার গোত্র ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদের বসতি স্থাপন করেছেন।" (সূরা হুদ : ৬১)

এ আয়াতে পৃথিবী আবাদ করার নির্দেশ এসেছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী বলেন- তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহ নির্মাণ ও গাছ রোপনের মাধ্যমে পৃথিবীকে আবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন- (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, ২/৫০৭)। এটাই উৎপাদনের নির্দেশ। কেননা পৃথিবী আবাদকরণের নির্দেশ পরোক্ষভাবে উৎপাদনের নির্দেশ বহন করে এজন্য যে, উৎপাদন ব্যতীত পৃথিবী আবাদ করণ সম্ভব নয়।

৪. পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত পরিচালনায় উৎপাদন ঃ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতকার্য পরিচালনার জন্য মানুষের পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। তিনি বলেন-

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাকুলকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি।"(সূরা আল-বাকারা :৩০)

খিলাফত পরিচালনার সাথে ইসলামি অর্থনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আল্লাহ পৃথিবীর সব কিছু মানুষের অধিনস্ত করে দিয়েছেন।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ (خليفة) খলীফা শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। যার ভাবার্থ আমি পৃথিবীতে আমার খলীফাদের সৃষ্টি করেছি। যাদের একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে, যতে করে তাদের খিলাফত চিরকাল থাকবে।
ইসলামের দৃষ্টিতে খিলাফত একটি আক্বীদাগত ব্যাপার, যা মুসলিম ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান ও চাল-চলনে পরিদৃষ্ট হবে। আর মুসলিম ব্যক্তির আচার-অনুষ্ঠান এমন হবে যার মাধ্যমে তাকে খিলাফতের ভার বহন করতে সহায়তা করবে। এজন্য মহান আল্লাহ মানব জাতিকে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যায়ের সাথে খিলাফতের উল্লেখ করেছেন, যাতে ধন-সম্পদের মালিক একচেটিয়াভাবে নিজের অধিকার মনে না করে, বরং এটা দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, ঐ মালের মধ্যে অন্যেরও হক রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.

"আল্লাহ তোমাদের যে ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।" (সূরা আল-হাদীদ:৭)
অত্র আয়াতে এটাই বোঝা যায় যে, মানব জাতি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে কাজ করছেন। পৃথিবীতে যে সব ধন-সম্পদ আছে তারা তার ব্যাবহার করতে পারবে। কিন্তু একই সময় তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত আদেশ-নিষেধের সম্মুখীন হবে। সুতরাং সে অযথাও খরচ করতে পারবে না আবার অতিরিক্ত কৃপণতাও দেখাতে পারবে না। বরঞ্চ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীতে খিলাফত পরিচালনার জন্য মানুষের যে কাজ করা অবশ্য করণীয় তা নিম্নরূপ:
১. নিজ ধন সম্পদে জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা মনে রাখতে হবে। কেননা খিলাফত-এর মানেই হল, কোন জিনিসে তার একচেটিয়া মালিকানা নেই। সুতরাং ইসলাম সম্পদের মালিকদের সঠিক পথে মালের উৎপাদন ও ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। যেমন ঃ উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদ, গুদামজাতকরণ ও এমন কাজ থেকে নিষেধ করে, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আবার ব্যবহারের বেলায় অযথা খরচ ও অতিরিক্ত কৃপণতা করতে নিষেধ করে।
২. সম্পদের মালিককে মনে রাখতে হবে যে, তার সম্পদের একটি অংশ তাকে যাকাত দিতে হবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের একক মালিক নয়, বরং সে হল উহার ধারক ও বাহক। কারণ তার মালের মধ্যে যাকাত তথা ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্যদের হক রয়েছে।
খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মানুষ একে অন্যকে সাহায্য করবে। সুতরাং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-নিষেধ মানতে হবে। সমাজে সম্পদ পূঞ্জীভূত ও গুদামজাত করা যাবে না, সুদের আশ্রয় নেয়া যাবে না, অযথা খরচ করা যাবে না। কেউ মালের উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অন্যায়ের আশ্রয় নিলে তাকে বাধা দান করতে হবে। যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর সঠিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানব সমাজের কল্যাণ রক্ষিত হয়। (ড. মুহাম্মদ ফারুক আননাবহানী ঃ আল-ইক্তেজাহ আল-মেজায়ী ঃ ১২ ও ড. মাহমুদ বাবেলী ঃ আল-ইকতেছাদ ঃ ৯৭)

৪. মৃত জমিন পূনরুজ্জীবিত করা ঃ মৃত জমিন বা পতিতভূমিতে গাছ রোপন, শস্য উৎপাদন, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে আবাদ করার প্রতি ইসলাম মানুষকে উৎসাহ প্রদান করে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এটাকে তাঁর অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

"তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত পৃথিবী, আমি একে জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা ভক্ষণ করে।" (সূরা ইয়াসিন : ৩৩)
ইসলামি অর্থনীতিতে পতিত ভূমি যে আবাদ করবে সেটা তার মালিকানা বলে স্বীকৃত হবে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

من احى ارضا ميتة فهى له , و ما اكلت العافية منها فهى له صدقة.

"যে কোন ব্যক্তি মৃত অর্থাৎ অনাবাদী জমিকে জীবিত করবে সেটা তারই হবে। অন্য কেউ যদি তা থেকে খায় তবে তা তার জন্য সাদকাহ হবে।" (আহমদ ও নাসাঈ) পতিতভূমি বলতে ঐভূমিকে বলা হয় যা কোন ব্যক্তি মালিকনাভুক্ত নয় বা সামষ্টিক সম্পত্তিও নয় বা জনসাধারণ উপকৃত হয় এমন সাধারন ভূমিও নয়।

মৃতভূমি পূনরুজ্জীবিত করার শর্তাবলী
১. তা কোন মুসলিম ব্যক্তি অথবা মুসলিম বিশ্বে বসবাসরত আহলুজ্জীম্মার মালিকানাধীন হবে না।

২. তা শহর বা লোকালয়ে হবে না। যা দ্বারা ভবিষ্যতে উপকৃত হওয়ার আশা পোষণ করা যেতে পারে।

৩. তা সর্বসাধারণের উপকারের জায়গা হতে পারবে না। যেমন ঃ হাট-বাজার, নদী-নালা ইত্যাদি।

৪. তা জীবিতকরণের সময়সীমা সুন্নাত মোতাবেক তিন বছরের অধিক হতে পারবে না। তবে হ্যাঁ সমাজের মঙ্গলার্থে যদি বেশী সময় লেগে যায় তবে অতিরিক্ত সময়ের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৫. ইমাম বা শাসকের অনুমতি নিতে হবে।

৬. তা পূনরুজ্জীবিতকারী এমন যোগ্য তার অধিকারী হতে হবে যাতে সে ভূমি পূনরুজ্জীবিত করতে পারে। অন্যথায় তার থেকে ঐ জমি কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

পতিতভূমি পূনরুজ্জীবিতকরণের উপকারিতা

১. সমাজের জনগোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মে উৎসাহ দান করা এবং পতিতভূমি থেকে মুনাফা ভোগ করা।

২. বেকার সমস্যা লাঘব করা। কেননা অধিক পতিত জমি আবাদ হলে কর্মসংস্থান বেড়ে যাবে, যাতে বেকার সমস্যা দূর হবে।

৩. সমাজে ব্যক্তি মালিকানার সম্প্রসারণ ঘটে। যাতে সমাজে খাদ্যের ঘাটতি হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্রে আমদানী-রপ্তানী বেড়ে যায়। এ ছাড়া পূনরুজ্জীবিতকারীর সম্পদ থেকে রাষ্ট্রে যাকাত, ওশর (ফসলের এক-দশমাংশ) ও জমির খাজনা (যদি ওশর ও খাজনা বিষয়ক জমি হয়) রাজকোষে জমা করতে হবে। সাধারণ অর্থনীতিতে উৎপাদন ধারণায় এক ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণ অর্থনীতিতে উৎপাদন তার উপকরণের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের উপকরণসমূহের যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে শুধু এর মধ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া সীমিত নয়, বরং সবকিছুর যথাযথ ব্যবহারের পরেই উৎপাদন সংক্রান্ত এক বিশেষ ধারণা প্রদান করা হয়। আর তা হল, উৎপাদনের ফলাফল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

أفرأيتم ما تحرثون ۔ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ۔ لو نشاء لجعلناه
حطاما فظلتم تفكهون ۔ إنا لمغرمون ۔ بل نحن محرومون

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্ন কারি ? আমি ইচ্ছা করলে তা খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হয়ে যাবে হতবুদ্ধি। তখন তোমরা বলবে, আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম।" (সূরা আল-ওয়াক্বিয়া ঃ ৬৩-৬৭)

উৎপাদনের উপকরণ

কোন দ্রব্য সৃষ্টি বা সেবামূলক কর্মে যেসব বস্তু-সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে কতকগুলো স্থির এবং কতকগুলো পরিবর্তনশীল। আর এ উপকারণ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একমতের অভাব রয়েছে।

পুজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উপকরণগুলোকে মোট চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যাথা- (১) জমি, (২) শ্রম, (৩) মূলধন ও (৪) সংগঠন। সংগঠনকে আধুনিক পরিভাষায় উদ্যোগ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা থেকে প্রত্যেকটি উপকরণ তাদের প্রাপ্য অংশ পেয়ে থাকে এভাবে ; জমির জন্য ভাড়া, শ্রমের জন্য মজুরী, মুলধনের জন্য সুদ এবং সংগঠন বা উদ্যোগের জন্য মুনাফা।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ একটিই তা হল শ্রম। দৈহিক, বুদ্ধিভিত্তিক বা পরিচালনাগত সকল প্রকার শ্রমই এর পর্যায়ভুক্ত। শ্রমের বিনিময়ে মজুরী প্রদান করা হয়। উৎপাদনের বাকী উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে তা পরিচালনা করে। কেননা এ অর্থব্যবস্থায় সমস্ত সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে সকলে একমত নয়। ইসলামি অর্থনীতিবিদ আবু সাউদ সনাতন নিয়মই সমর্থন করেন। মুফতি মোহাম্মদ শফি মনে করেন, সংগঠনকে আলাদাভাবে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে দেখানোর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা এটা শ্রমেরই পর্যায়ভুক্ত। এম. এ. মান্নানের মতে, যেহেতু মূলধনের মধ্যে নানা ঝামেলা বিদ্যমান সেহেতু এটাকে উৎপাদনের উপকরণের তালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিৎ। আল জুনায়েদ অন্যান্য উপকরণগুলোকে অপরিবর্তিত রেখে মূলধনকে মানবমূলধন ও মূলধনী সামগ্রী এ দুভাগে ভাগ করেছেন। (এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামি অর্থনীতি ঃ ৭৭)

ড. সুয়াদ ইব্রাহীম সালেহ শ্রম, মূলধনও তাকওয়া এই তিনের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তাকওয়া বা আল্লাহভীতিকে আলাদা উপকরণ হিসেবে দেখানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কেননা উৎপাদনের উপকরণ বলতে ঐ সব উপকরণ বুঝায় যা সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তাকওয়া এমন এক গুণ যা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। অতএব তাকওয়া উৎপাদকের গুণাবলী হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে নয়।

অর্থনীতিবিদ ড. মাহমুদ বাবেলী সময় (Time)-কে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে দেখেছেন। সময় মানব জীবনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা প্রতিটি ব্যক্তির সমগ্র কাজের জন্য আবশ্যক। সতন্ত্রভাবে তাকে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করা অর্থনীতিবিদদের নিকট অপ্রয়োজনীয়।

উপকরণসমূহের শ্রেণীকরণ বিষয়ে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে এ ধরণের মতপার্থক্যের একমাত্র কারণ হল, কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সরাসরি কোন কিছু না পাওয়া। অর্থনীতিবিদ এ. এইচ. এম. সাদেক দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলামি শরীয়াতে উপকরণের শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, তবুও উপকরণের শ্রেণীকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামি শরীয়াহ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, শ্রম নির্দিষ্ট মজুরীতে এবং পুনঃ ব্যবহারযোগ্য ভৌত সম্পত্তি (যেমন- দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি ও জমি) নির্দিষ্ট ভাড়ায় দেওয়া-নেওয়া করা যায়। এটারও অনুমোদন করা যায় যে, মূলধন ও উদ্যোক্তা লাভের পূর্বনির্ধারিত অংশ পাবে। ইসলামি অর্থনীতিতে এ দুটো উপকরণকে একত্র করা যায় না। কারণ মূলধন ও মুনাফার অংশ এক নয়, এটা পুর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করতে হয় এবং মূলধনকে লোকসানের (যদি হয়) ঝুঁকি বহন করতে হয়। কিন্তু উদ্যোক্তা এ ঝুঁকি থেকে মুক্ত। এ ধরনের শরীয়াহ ভিত্তিক ইংগিত থেকে উৎপাদনের উপকরণসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। (এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামি অর্থনীতি ঃ পৃ-৭৮)

১. শ্রম,
২. ভৌত সম্পত্তি
৩. মূলধন
৪. উদ্যোক্তা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানা
ক. স্বীকৃত
খ. স্বীকৃত নয়
গ. মোটামুটি স্বীকৃত
ঘ. ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকৃত।

২. প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের মতে-উৎপাদন হচ্ছে-
ক. মৌলিক দ্রব্য-সামগ্রীর নতুন সৃষ্টি
খ. বস্তুর মৌলিক কাঠামোকে নতুন রূপদান
গ. ব্যবহারোপযোগী কোন বস্তু তৈরি করা
ঘ. উত্তর কোনটিই সঠিক নয়।

৩. পৃথিবীতে মানুষের পরিচয় কি ?
ক. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি
খ. মনুষ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সাধারণ প্রাণী
গ. মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণীমাত্র
ঘ. উত্তর সব কয়টিই সঠিক।

ঘ) ইসলামি অর্থনীতিতে সাধারণ মৃতভূমি আবাদের কয়টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ?
ক. সাতটি
খ. ছয়টি
গ. পাঁচটি
ঘ. তিনটি।

ঙ) উৎপাদনের উপকরণসমূহ কয়ভাবে বিভক্ত ?
ক. পাঁচভাগে
খ. চারভাগে
গ. দুইভাগে
ঘ. তিনভাগে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপাদান বলতে কি বুঝায় ? লিখুন।
২. উৎপাদন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি ? লিখুন।
৩. পৃথিবীতে খিলাফত পরিচালনায় উৎপাদনের গুরুত্ব লিখুন।
৪. সাধারণ পতিত বা মৃত ভূমি আবাদ করার শর্তাবলী লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ বলতে কি বুঝায় ? ইসলামে উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শ্রম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- শ্রমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- শ্রমের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- শ্রম ও শ্রমিকের ব্যাপারে আইয়ামে জাহিলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারবেন।
- শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবেন।
- "তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নির্ভরশীলতা মানুষকে শ্রম থেকে দূরে ঠেলে দেয় না।" তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পাবেন।
- শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

শ্রমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞা সাধারণ অর্থনীতি থেকে আলাদা নয়। উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে শারীরিক ও মানসিক উভয় শ্রমই অন্তর্ভুক্ত। অর্থনীতির ভাষায় মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা সেবামূলক কাজে মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা বা পরিশ্রম ব্যয় করে তাকে শ্রম বলে। তাই এটা শারীরিক শ্রম (যেমন- দিনমজুর, কৃষক, মাঝি, জেলে) বা বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম (যেমন- শিক্ষাদান, ডাক্তারী) বা পরিচালনাগত শ্রম (যেমন- উকিল, সংগঠক) হোক। অর্থাৎ এ মানব সেবার মধ্যে সাধারণ শ্রমজীবি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক স্টাফ উভয়ই থাকতে পারে।

অর্থনীতিবিদ মার্শাল শ্রমের সংজ্ঞায় বলেন- Any exertion of mind or body under gone, partly or wholely with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work. অর্থাৎ, মানসিক বা শারীরিক যে কোন প্রকারের পরিশ্রম যা আংশিকভাবে আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উপকারের নিমিত্তে করা হয় তাই শ্রম।

মানুষের শ্রম-শক্তি তিন প্রকার

ক. বুদ্ধিশক্তি- জ্ঞানপ্রতিভা (Intellect) যা আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। (১) সাংবাদিক বিষয়ক (Journalistic), (২) গবেষণামূলক (Research), (৩) সাংগঠনিক কার্য সম্বন্ধীয় (Administative), (৪) বিচার বিভাগীয় (Judicial)

খ. শৈল্পিক দক্ষতা ও কুশলতা (Skill and Expert Knowledge)- এটা আবার তিন প্রকার (১) কৃষি কাজে দক্ষতা ও কুশলতা (Agricultural), (২) শিল্পকর্ম সম্পর্কিত (Arts), (৩) বাণিজ্য সম্বন্ধীয় (Commercial)|

গ. দৈহিক শ্রম (Physical Power)- দৈহিক বল কেবল মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্যই একটি উৎপাদক উপায়। তারা সাধারণতঃ এ একটি মাত্র শক্তির সাহায্যেই জীবিকা উপার্জন করে। তাদেরকেই মেহনতী জনতা বলা হয়। (মাওঃ আব্দুর রহীমঃ ইসলামের অর্থনীতি ঃ ৩৮)

উদ্যোক্তা বা সংগঠককে শ্রমের পর্যায়ে নিয়ে আসলেও দুয়ের মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। শ্রমিক শ্রমের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত পারিতোষিক যেমন, ঘন্টা প্রতি, দিন প্রতি বা প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরী পায়। কিন্তু উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ উদ্যোক্তা তার প্রচেষ্টার ফল পূর্বাহ্নেই জানতে পারে না বরং তা অনিশ্চিত।

শ্রমের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

শ্রমের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে-

১. শ্রম ও শ্রমিকের অভিন্নতা ঃ উপাদানের অন্যান্য উপকরণসমূহ এবং এর মালিককে আলাদা করা যায়। যেমন- ভূমি এবং তার মালিক বা জমিদার সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। একইভাবে পূজি ও পূজিপতিও ভিন্ন। কিন্তু শ্রম ও শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা শ্রম শব্দটি আসলেই শ্রমিকের বিষয়টি চলে আসে । আবার শ্রমিক শব্দ আসলেই শ্রম হতে আসে।

২. শ্রম বন্টন পরিবর্তনশীল ঃ বিশ্বস্ততা, বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমের পরিসর পরিবর্তন যোগ্য। শ্রমিক এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য হলে তার শ্রমবন্টন উচ্চস্তরের হতে পারে। আবার এ ব্যাপারে সে অপরিপক্ক হলে তার অবনতিও হতে পারে।

৩. শ্রমের সামর্থ্যের দরকষাকষি সীমিত ঃ মালিক শ্রেণী শক্তিশালী ও শ্রমিক বা মজুর শ্রেণী দুর্বল হওয়ায় শ্রমিকের মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে দরকষাকষি কম হয়ে থাকে। কেননা মজুর শ্রেণী তাদের জীবন চালানোর জন্য উপর ওয়ালাদের নীতি মানতে বাধ্য থাকে। ফলে, তারা শ্রমের মূল্য আদায়ের ব্যাপারে বঞ্চিত থেকে যায় এবং মালিকের দ্বারা শেষিত হতে থাকে।

৪. শ্রমিকের উপস্থিতি আবশ্যক ঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানে মালিকের উপস্থিতির প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু শ্রম বা শ্রমিকের উপস্থিতি ছাড়া উৎপাদন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রম এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শ্রমের মৌলিক মূল্যবোধ, উৎস ও বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি যেমন- চাষাবাদ, শিল্প, ব্যবসা, প্রসাশন বা মানুষ জীবন ধারণের জন্য যে শ্রম করে তা সবই শ্রমের পর্যায়ভুক্ত।

ইসলাম শুধু শ্রম ব্যায় বা যথাযথ বন্টন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং শ্রমকে আমানতের পর্যায়ে নিয়ে তার যথার্থ প্রয়োগ ও হক আদায়ের গুরুত্ব প্রদান করে। রাসূল (সা) বলেন-

ان الله يحب احدكم اذا عمل ان يتقن.

"তোমাদের যে কেউ কোন কাজ করলে এবং তা উত্তমরূপে সম্পাদন করলে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।" (বায়হাকী) এ উত্তমরূপে সম্পাদনকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

"তোমরা সৎকাজ করলে তোমাদের নিজেদের করবে এবং মন্দকাজ করলে তাও নিজেদের জন্যই করবে।" (সূরা বণী ইসরাঈল : ৭)

উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করা একই সাথে দৈহিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমকে শামিল করে। কেননা উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের দৈহিক শ্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমের প্রভাব থাকে না। কিন্তু তার প্রভাব উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রমের ধরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

শ্রম ও শ্রমিকের ব্যাপারে আইয়ামে জাহেলিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

শ্রম ও কর্মের ব্যাপারে ইসলাম ও আইয়ামে জাহিলিয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তখনকার বর্বর বেদুঈনরা তাদের জীবিকা নির্বাহে পশুচারণ, শিকার, লুটতরাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলার প্রহারাদান ইত্যাদিকে নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করত। পক্ষান্তরে অন্য সকল প্রকার কাজ-কর্ম ও পেশাকে ঘৃণা করত। যেমন- চাষাবাদ, কারিগরি, নৌচালনা, ব্যবসা ইত্যাদি। এসম্পর্কে মহাপন্ডিত এবং সমাজকল্যাণের জনক ইবনু খালদুন বলেন ঃ "আরব বেদুঈনরা শ্রমজীবী যেমন- কারিগরী প্রথা ও অন্যান্য পেশাজীবী কাজকে ঘৃণা করত। প্রকৃতপক্ষে শ্রম ও কাজকর্মই আয়ের উৎস। শ্রম ও কাজকর্ম না থাকলে মানুষের আয়-উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় ও মানুষ বেকার হয়ে যায়।" (আল-মুকাদ্দামা ঃ ১৫০)

তৎকালীন শহরবাসীরা যেসব কাজ করত তা দেখে বেদুঈনরা নাক সিটকাত। তখকার শ্রমজীবীদের মধ্যে কেউ ছিল কৃষিজীবী, যেমন- মদীনাবাসী, আবার কেউ ছিল ব্যবসায়ী যেমন- মক্কাবাসী, আবার কেউ ছিল নাবিক যেমন- ওমানবাসী। (The Encyclopedia of Islam : 1/375)

এছাড়াও তৎকালে বিভিন্ন পেশার মানুষ পাওয়া যেত। যেমন- কারিগর, লৌহকার, করাতমিস্ত্রী। কিন্তু এসব পেশাজীবিরা আরব বেদুঈন ও অন্যান্যদের কাছে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে পরিগণিত হত।

কোরাইশরা মদীনাবাসীদের ঘৃণা করত। কেননা তারা চাষাবাদ করে খেত। আবু জাহল যখন বদর যুদ্ধে নিহত হয় তখন তার প্রাণবায়ু বের হওয়ার আগে সর্বশেষ কথা বলেছিল ; আমি আমার নিহত হওয়ার ব্যপারে যে আক্ষেপ করছি, তার চেয়ে বেশী আক্ষেপ করছি এ জন্য যে, একটি চাষীর হাতে আমার ইহলীলা সাঙ্গ হল। অর্থাৎ বদর যুদ্ধে তার নিহত হওয়ার চেয়ে মদীনাবাসীর হাতে তার নিহত হওয়ার জন্য বেশী আক্ষেপ করেছিল। কারণ

মদীনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী। তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে সে বলেছিল- فلو غير اكار قتلنى হায় আফসুস "! যদি কৃষক ছাড়া অন্য কোন লোক আমাকে হত্যা করত তবে কতই না ভাল হত।
অপরপক্ষে জাহেলী যুগে সম্মানিত মহিলারা দুগ্ধদানের বিনিময়ে অর্থাৎ ধাত্রীমাতার পেশা গ্রহণের বিনিময়ে জীবিকার্জনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। যদিও তারা ক্ষুধায় কষ্ট পেত, তবুও তারা এ পেশা গ্রহণ করত না। তারা জাতীয় পেশাকে খাদেমী বা গৃহভৃত্যের পেশা হিসেবে জ্ঞান করত। এভাবে তারা যে কোন প্রকার চাকরী-বাকরী বিশেষ করে ধাত্রী পেশাকে ঘৃণা করত।
উল্লিখিত বর্ণনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রম ও কাজকর্ম করে জীবিকার্জন জাহেলী যুগের লোকদের নিকট কতই না অপমানকর ছিল। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, জাহিলী যুগে শ্রম ও শ্রমিকদের মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। (জামাল উদ্দীন ইয়াদ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিক ঃ ৯-১৩)

শ্রমের গুরুত্ব

এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রমই হল জীবিকার্জনের সর্বোত্তম পন্থা। আর শ্রমই বয়ে আনে মানব সমাজে নতুন জীবন। ইসলাম শ্রমের প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করেছে এবং শ্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর শ্রমকেই দুনিয়া ও আখেরাতের হিসাব-নিকাশের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

"এবং বল, তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ অবলোকন করবেন। এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কাজ দেখবেন।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ১০৫)
মহানবী (সা) শ্রমের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

افضل الكسب بيع مبرور و عمل الرجل بيده.

"সর্বোত্তম আয় হল মাকবুল বা গৃহীত বেচা-কেনা অর্থাৎ যে বেচা-কেনায় ধোকাবাজী ইত্যাদি নেই এবং মানুষের হাতের কামাই বা শ্রমলব্ধ উপার্জন।" (আস্সুয়ুতি ঃ আল জামেউস সগীর)
অন্য হাদীসে তিনি বলেন ঃ

ان الله يحب المؤمن المتحرف.

"মহান আল্লাহ পেশাজীবী বা কর্মজীবী মানুষকে ভালবাসেন।" (আস্সুয়ুতি ঃ আল জামেউস সগীর)
অন্য হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

"শ্রমিককে তার মজুরি দাও তার ঘাম শুকাবার আগে।" (ইমাম সুয়ুতি ঃ আল জামেউস সগীর)
উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা শ্রম ও শ্রমিকের বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।
অর্থনৈতিক দিক থেকে মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরই শ্রমকে উৎপাদনের উৎস হিসেবে ধরা হয়। অতি প্রাচীনকালেই আল্লামা ইবনু খালদুন শ্রমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "শ্রম হল উৎপাদনের স্তম্ভ বা মূল এবং সকল প্রকার রিযক ও আয়ের উৎস। অনুরূপভাবে তিনি বলেন ঃ অধিক শ্রম অধিক সম্পদ আহরণ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও অধিক আবাদীর উপায়।" (আল-মুকাদ্দামাহ ঃ ৩২১)
কিছুকাল আগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার ২৩ ও ৩৪ ধারায় শ্রমকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধীনতায় গণ্য কর হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ স্বাধীনভাবে তাদের কর্ম বেছে নিতে পারবে। উহার ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে শ্রমিক ও কর্মজীবিরা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আর প্রতিটি মানুষ তাদের ইচ্ছামাফিক ঐ সংগঠনে যোগ দিতে পারবে। অবশ্য ঐ সংগঠনটি হবে শান্তিপূর্ণ এবং কাউকে তাতে যোগ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। (ড. সাঈদ মুহাম্মদ আহমদ বানাযাহ ঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ঘোষণা ও এতে ইসলামি শরীয়তের ভূমিকা ঃ ৬৬)
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন মাত্র কিছুকাল আগে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু ইসলাম এখন থেকে চৌদ্দশত বছর আগে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা

একমাত্র ইসলামই শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে। এমন কি পার্থিব কাজকর্মকেও ইসলাম ইবাদতের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। শুধু তাই নয় বরং কাজকর্মকে জিহাদের সমপর্যায়ের বলে গণ্য করেছে। বর্ণিত আছে, কোন সাহাবী এক শক্তিশালী যুবককে দ্রুতগতিতে তার কাজে যোগদান করতে যেতে দেখে বললেন, হায় ! যদি ঐ যুবকটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঐভাবে গমন করত ! তখন রাসূল (সা) বললেন-

لا تقول هذا. ان كان خرج فيسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله , و ان كان خرج فيسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله , فان كان خرج رياء و مفاخرة فهو فى سبيل الشيطان.

"তুমি এ কথা বলো না। যদি যদি সে তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য রোজগারে বের হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সওয়াব পাবে। আর যদি সে ভিক্ষা ও দারিদ্রতার গ- ানি থেকে বাঁচার জন্য নিজ নফসের নিমিত্ত রোজগারে বের হয় তবুও সে জিহাদের সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও গৌরবের জন্য বের হয়, তবে তা হবে শয়তানের রাস্তায় বের হওয়ার শামিল।" (হাফেজ আল-মুনজিরী ঃ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : হজ্জ)

উক্ত হাদীসে জীবিকার্জনের জন্য শ্রম ও কর্মকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নামাযের সাথে শ্রমকে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন-

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله.

"নামায শেষ হলে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক সন্ধানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।" (সূরা আল-জুমুআহ : ১০)

অনুরূপভাবে আল্লহ শ্রমকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি বলেন-

وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله.

"কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০)

শ্রমের মাধ্যমে রিযক সন্ধানের জন্য আল্লাহ হজ্জের মৌসুমেও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন-

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

"যদি তোমরা (হজ্জের মৌসুমে) তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে দেয়া রিযক সন্ধান কর তাতে কোন প্রকার দোষ নেই।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৮)

অত্র আয়াতের শানে নুযুলে ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হজ্জ মৌসুমে মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা থেকে বিরত থাকত। কেননা তারা বলত, হজ্জের দিনগুলো আল্লাহর জিকরের দিন। তখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা) ও যারা তাঁর অনুসরণ করে সেসব মুসলমানগণের জন্য সারা রাত জেগে ইবাদত করার বিধানকে শিথিল করেছেন এ জন্য যে, যাতে দিনের বেলায় জীবিকান্বেষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله.

"তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি জাগরন কর কখনো রাতের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গীদের একটা দলও তোমার সঙ্গে দন্ডায়মান হয়। আল্লাহই দিন ও রাত পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসেব রাখতে পারবে না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। কারণ তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহসন্ধানে দেশ-বিদেশে সফর করবে।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০)

আল্লাহর বাণী "فتاب عليكم" এর অর্থ হল, অত্র সূরার প্রথমে অধিক রাত জাগরণে যে নির্দেশ এসেছিল তোমাদের উপর সে নির্দেশের শিথিলতা দেয়া হল। আর আয়াতের يضربون فى الارض এর অর্থ- ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য ভ্রমণ করা। (আল খতীব শারবীনী ঃ তাফসীরুল কুরআন ঃ ৪/৪২২)
মানুষ নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে যেমন সওয়াবের অধিকারী হয় তেমনিভাবে শ্রম ও কাজকর্মের মাধ্যমেও সওয়াবের অধিকারী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة.

"সত্যবাদী-বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে থাকবে।" (ইবনে মাজাহ: ২/৭২০)
রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন-

من امسى كالا من عمله , بات مغفورا له.

"যে ব্যক্তি সারাদিন কাজ করতে যেয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে সন্ধায় উপনিত হয় রাতে তাকে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" (আস্সুয়ুতীঃ জামে আছছাগীর ঃ ২/১৬২)
রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ

ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له صدقة.

"যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বীজ বপন করে বা কোন শস্য উৎপাদন করে আর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ অথবা কোন প্রাণী ভক্ষণ করে তখন তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।" (বুখারী, হাদীস নং ৬০১২)
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা শ্রম ও শ্রমিক, কৃষিকাজ ও কৃষিজীবি-বৃক্ষ রোপণকারীকে সুউচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমন কি মুসলিম ব্যক্তির রোপণকৃত গাছের ফল পশুপাখি, কীট পতঙ্গ ইত্যাদিতে খেলেও মুসলিম ব্যক্তি উহার সওয়াব প্রাপ্ত হবে। শ্রমের মর্যাদা বর্ণনা দিতে গিয়ে এখানে আরো কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হল-
১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে একজন সাহাবী তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন, ঐ সাহাবীর হাত খসখসে ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত এমন কেন ? সাহাবী বললেন, এটা রশী টানার দাগ। আমি বাগানে কাজ করি, শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা আমার সংসার চালাই। তখন তিনি ঐ লোকটির হাত চুম্বন করলেন এবং বললেন-

هذه يد يحبها الله و رسوله.

"এটা এমন একটি হাত- যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।" (মুহাম্মদ আল-গাজালী ঃ ইসলাম ও সমাজতন্ত্রবাদ ঃ ৮২)
উক্ত সাহাবীর হাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চুম্বন দানের অর্থ হচ্ছে, তিনি এ শ্রমিককে তার শ্রমের ও উৎপাদনের জন্য অধিক উৎসাহ দান করেন। শ্রমের উৎসাহ দানের অর্থ হল, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।
২. শ্রমের মাধ্যমে হালাল রিযক সন্ধান ইসলাম ওয়াজিব করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

طلب الحلال واجب على كل مسلم.

"শ্রমের মাধ্যমে হালাল রুযী সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।" (আল-মুনজিরী ঃ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ঃ ২/৫৪৬)
৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

"হালাল রিযক সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।" (মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ ২/৮৪৭)
অত্র হাদীসে হালাল রুযীর জন্য শ্রম ও কর্মকে ফরয বা অবশ্যকরণীয় বলা হয়েছে।
মহান হাদীস বিশারদ ইমাম মোল্লা আলী আল-ক্বারী অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- হালাল খাদ্য উপার্জন করা তাকওয়া বা আল্লাহভীতির চাবিকাঠি। (মিরকাতুল মাফাতিহ ঃ ৩/২৯৮)
হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ্শায়বানী বলেন ঃ আহলুস্সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ ফকীর মতে প্রয়োজনীয় রিযক কামাই করা ফরয। (কিতাবুল কাসব ঃ ৪৪)

সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে, মুসলিম সমাজে এমন স্তরের কোন লোক থাকবে না যারা বেকার অথবা যারা অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে খাবে এবং অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন-

لان ياخذ احدكم حبله ثم ياتى الجبل فياتى بحزمة من حطب على ظهره فيبعها فيكلف الله وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه.

"তোমাদের কেউ হাতে রশি নিয়ে পাহাড়ে আসবে অতঃপর কাঠের আটি নিজ পিঠে বহন করবে। অতঃপর উহা বাজারে বিক্রয় করে নিজ জীবিকা অর্জন করবে এটা তার মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার চেয়ে অধিক শ্রেয়। কেননা ভিক্ষা করতে গেলে কেউ তাকে ভিক্ষা দিবে আবার কেউ ফিরিয়ে দেবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২০৪৭)

২. একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তিকে আলুথালু বেশে নামাযে রুকু-সিজদাহ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে ? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ এ লোকটি একজন আবেদ (যে বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদত করে) লোক। তখন রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির ভরণপোষণ কে দেয় ? তারা উত্তর করলেন, তার ভাই শ্রম করে এবং ঐ আবেদ ভাইয়ের ব্যয়ভার বহন করে। তখন রাসূল (সা) বললেন-

اخوه اعبد منه - তার শ্রমিক ভাই তার চেয়ে অধিকতর আবেদ। (শায়খ মুহাম্মদ আবু যুহরাহ ঃ ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ঃ ১৯৬)

মহানবী (সা) নিজ হাতে কাজ করতেন।

এখানে শ্রম ও শ্রমিকের অধিক মর্যাদার জন্য এ কথার চেয়ে বেশী কিছু নেই যে, মহানবী (সা) নিজেও বহু প্রকার কর্মসাধন তথা বেতনভোগী হয়ে কাজ করেছেন। তিনি পাহাড়ে ছাগল চড়াতেন। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন-

ما من نبى الا رعى الغنم.

"এমন কোন নবী নেই যিনি ছাগল চরান নি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২২৬১)

অনুরূপভাবে নবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর মালামাল নিয়ে শাম (বর্তমান সিরিয়া) দেশে যেয়ে ক্রয়-বিক্রয় করতেন। তিনি যে কোন কাজে মুসলমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করতেন না। (মুহাম্মদ আলী হাবরাহ ঃ আত্‌তারবীয়াতুল ইকতেছাদীয়াহ ঃ ৫৩-৫৪)

এছাড়া রাসূল (সা) তাঁর খাদেমদের সাথে কাজে অংশ গ্রহণ করতেন তাদের শ্রম লাঘবের জন্য। তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে নিজ হাতে তালি দিতেন, জুতা সাফ করতেন, গৃহের আসবাবপত্র কিনে উহা নিজেই ঘরে ঢুকাতেন এবং সাজিয়ে রাখতেন। মেহমানদের খিদমত করতেন। এমনকি তার খাদেমদেরও খেদমত করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর খাদেম, বিশিষ্ট সাহাবী আনাস (রা) বলেন-

خدمته نحوا من عشر سنين , فوالله ما صحبته فى سفر او حضر لاخدمه الا وكانت خدمته فى اكثر ما خدمت له.

"আমি প্রায় দশ বছর যাবত নবীর (সা) খিদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি যখনই নবীর সাথে কোন সফরে যেতাম অথবা মুকিম অবস্থায় থাকতাম এবং তার খিদমতের ইচ্ছা করতাম তখন দেখতাম তাকে আমার খিদমতের চেয়ে তিনি আমার বেশী খিদমত করতেন।"

এমনই ছিল নবী ও রাসূলগনের তরীকা। তাঁরা নিজ হাতে কাজ করে খেতেন। যেমন, দাউস (আ) যুদ্ধের বর্ম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ب ۔ بأسكم فهل أنتم شاكرون.

"আমি তাকে তোমাদের জন্য যুদ্ধের বর্ম তৈরি করতে শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না ?" অর্থাৎ তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮০)

ইমাম কুরতুবী বলেন, অত্র আয়াত শিল্প-কারখানা স্থাপন, কারিগরি বিদ্যা ও তার উপকরণ গ্রহণের একমাত্র দলীল। মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবী দাউদ (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি যুদ্ধের বর্ম তৈরি করতেন এবং নিজের হাতের কামাই খেতেন। বাবা আদম (আ) কৃষক ছিলেন, নূহ (আ) করাতী ছিলেন, লোকমান (আ) দর্জী ছিলেন, তালুত (আ) চামড়া দাবাগাতের ব্যবসায়ী (চর্মকার) ছিলেন, কেউ কেউ বলেন, তিনি ভিস্তি ওয়ালা ছিলেন। (আহকামুল কুরআন ঃ ১১/২২১)

সাহাবীগণ প্রথম থেকেই শ্রমের মর্যাদা অনুধাবন করেন। সর্বপ্রথমে মুহাজির সাহাবীগণ মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের পরে শ্রম পেশা অবলম্বন করেন। তাঁরা মক্কায় তাদের ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আসেন। মদীনায় পৌঁছার পর আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের (আনসারদের) মালামাল বিনামূল্যে ভাগ করে দিতে

চাইলেন কিন্তু মুহাজিরগণ তা নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বরং তারা তাদের হাতের কামাই ও পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা জীবিকার্জনের পথ বেছে নেন। সূতরাং মুহাজিরদের কেউ ব্যবসায়ের ময়দানে নেমে পড়েন, আবার কেউ আনসারদের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করেন, এ শর্তে যে, আনসারদের ক্ষেত্রে আনসাররাই চাষাবাদের আসবাবপত্র-সরঞ্জাম বহন করবেন এবং মুহাজিরগণ তাদের কাজের বিনিময় লব্ধ ফসলের একটি অংশ গ্রহণ করবেন।

উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মানুষকে কর্ম ও শ্রমের প্রতি উৎসাহ দান করতে গিয়ে বলতেনঃ "আল্লাহ সে ব্যক্তির উপর রহম করবেন, যে বেশী বেশী কথা বলে না বরং বেশী বেশী কাজ করে। কর্মের শক্তি ঐ সময়ই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে, যখন দিনের কাজ ঐ দিনেই সম্পাদন করবে এবং তা আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না। আর আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসাকারী ঐ ব্যক্তি যে মাটিতে বীজ বপন করে অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে।" (ড. তম্মাভীঃ উমর বিন খাত্তাবঃ ৪৭২)

সূতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলাম মানুষকে কর্ম ও শ্রমের প্রতি আহবান করে এবং উৎসাহ দান করে। যার বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে কুরআন, হাদীস এবং রাসূল (সা) ও সাহাবীগণের কার্যক্রম থেকে পেয়েছি। অতএব নিঃসংকোচে এ কথা বলা চলে, ইসলাম কর্ম তৎপরতা ও সজীবতা তথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধর্ম। ইহা বেকারত্ব ও স্থবিরতা তথা অলসতার ধর্ম নয়।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নির্ভরশীলতা মানুষকে শ্রম থেকে দূরে ঠেলে দেয় না

ইসলাম মানুষকে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার দিকে আহবান করেছে। কিন্তু তাওয়াক্কুল শ্রম বা কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং তাওয়াক্কুল দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কর্মসম্পাদনে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা, যাতে ব্যক্তির শ্রম ও তার কাজ আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ অথবা অন্য যে কোন পেশাই হোক না কেন, তাতে মানুষ লাভবান হতে পারে, আবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অবশ্য বান্দার সকল কাজ-কর্মে তার এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহই একমাত্র রিযকদাতা, তিনি বান্দাদের হতে কখনো বিচ্ছিন্ন নন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন-

لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا و تروح بطانا.

"যদি তোমরা মহান আল্লাহর উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল করতে পার, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে রিযিক প্রধান করবেন, যেমনভাবে পাখি ও বিহঙ্গকুল রিযকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, উহারা খাদ্যের সন্ধানে প্রত্যুষে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় আর সন্ধ্যা বেলায় উদরপূর্তি অবস্থায় ফিরে আসে।" (তিরমিযী ঃ ৭/৯২)

হাদীসের ভাবার্থ হল, মানুষকে একইসাথে কাজও করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলও হতে হবে। রাসূল (সা)-এর অমীয় বাণী এ কথার সরাসরি ইঙ্গিত বহন করে। এ উদ্দেশ্যে যখন এক সাহাবী তাকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আমার সওয়ারীটি ছেড়ে দেব এবং আল্লাহর উপর ভরসা করব ? তদুত্তরে মহানবী (সা) বললেন ঃ بل قيدها و توكل "তুমি উহাকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর।" (আল-হায়সামী ঃ মাজমা' আযযাওয়ায়েদ ঃ ১/২৯১)

এমনিভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান বোধগম্য ও সুস্পষ্ট। যেমন-আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন আর তার হাতে ছিল একটি কাঠদন্ড। তিনি উহা দ্বারা মাটিতে দাগ কাটছিলেন, অতঃপর তিনি তার মাথা উত্তোলন করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোকই নেই, বরং প্রত্যেকের জন্য জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। এতদশ্রবণে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আমরা আমল করব না, বরং এর উপরেই নির্ভর করব। তিনি বললেন, না বরং তোমরা আমল কর। আর প্রত্যেকের জন্য সে কাজই সহজ করে দেয়া হবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى.

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা সভ্য বলে গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে এবং নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে আর যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি তারজন্য কঠোর পথ সুগম করে দেব।" (সূরা আললাইল : ৫-১০)

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলী যুগে কাজ-কর্ম বিশেষ করে চাষাবাদকে ঘৃণা করা হত। কোরেশরা মদীনাবাসীদের ঘৃণা করত। কেননা তারা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু ইসলাম শ্রম বা আমলের অধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে হালাল কার্যাবলীসম হকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি যে স্তরের লোক তাকে তার দক্ষতা হিসেবে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।
ইসলামে শ্রম ও কর্মের মর্যাদা দিতে গিয়ে মহানবী (সা) বলেন-

ما اكل احد طعاما قط خير امن عمل يديه وان نبى الله داؤد علية السلام كان ياكل من عمل يد يه.

"স্বীয় হস্তে উপার্জিত খাদ্য হতে অধিক উত্তম আর কোন খাদ্য নেই। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) তাঁর নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতেন।" (সহীহ বুখারী ঃ হাদীস নং-২০৭২)
নবী দাউদ (আ) একজন লৌহকার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وألنا له الحديد ـ أن اعمل سابغات

"আমি তার জন্য লৌহকে নমনীয় করে দিয়েছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর।" (সূরা সাবা ঃ ১০-১১)
উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অপরিসীম।

তাওয়াক্কুল (توكل) ও তাওয়াকুল (تواكل)-এর মধ্যে পার্থক্য

তাওয়াক্কুল ও তাওয়াকুল-এর মধ্যকার পার্থক্য আমাদের জানা প্রয়োজন। তাওয়াক্কুল হল শুধু আল্লাহর উপরই হয়ে থাকে। তাওয়াকুল হল, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের উপর ভরস করা। আল্লাহ বলেন-

فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

"অত:পর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দিও, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তার উপরই ভরসা করলাম। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি।" (সূরা আত-তাওবা : ১২৯)
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

"বল, তিনিই আমার প্রতিপালক ! তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করি। আর তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন স্থল।" (সূরা আররা'দ : ৩০)

এমনিভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে মানুষ সকল প্রকার তাগুতী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আর আল্লাহর উপর ভরসার ফলে মানুষ আত্মার প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং বেশী বেশী নেক কাজ করতে পারে। চাই সে কাজ দুনিয়ার হোক অথবা পরকালের হোক।

তাওয়াক্কুলের মানে এই নয় যে, মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। বরং তাওয়াক্কুল এর আসবাব গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে ঐ সাহাবীর কাহিনী উল্লেখযোগ্য যিনি রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি আমার সওয়ারীটি বন্ধনমুক্ত করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব ? উত্তরে রাসূল (সা) বলেছিলেন, উহাকে বেধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা কর। রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি যদি তার সওয়ারীটি না বেধে আল্লাহর উপর ভরসা করতেন, তবে তা হত তওয়াকুল।

রাসূল (সা) আসবাব বা অসীলা গ্রহণ না করলে তিনি তাঁর মাথায় যুদ্ধের টুপি পরিধান করতেন না। আর খন্দক যুদ্ধে তিনি কাফিরদের প্রতিহত করার মানসে মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করতেন না। বরং তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন পরিশ্রম না করে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করেই বসে থাকতেন।

শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ইসলাম মানুষকে কর্মের প্রতি আহবান করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা এর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে ভক্ষণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।" (সূরা আল-মূলক:১৫)

ইসলাম কর্ম ও উপার্জনের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে দু'ভাবে-

প্রথমত: মানুষের জন্য কর্ম প্রচেষ্টায় অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা বিলুপ্ত করণের মাধ্যমে। এজন্য যে ব্যক্তি পতিত জমি সংরক্ষণ করে, তা তার জন্য বৈধ করা হয়েছে আর তার সে জমিতে মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত: মুসলমানদেরকে অপর মুসলমান ভাইয়ের কাজকে তুচ্ছ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ইসলাম নিজ হস্তে কর্ম সম্পাদনকে সর্বোত্তম আমল মনে করে।

রাসূল (সা) বলেন-

ইসলাম কোন ব্যক্তির জন্য কর্মকে তার অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছে। অতএব ইসলামি রাষ্ট্র সক্ষমদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে। রাসূল (সা) এ দায়িত্বে সদা সচেষ্ট ছিলেন। একদা এক ব্যক্তি তার কাছে যাচনা করল, তিনি তাঁর লোহার আংটি বাজারে দুই দিরহামে বিক্রয় করে লোকটিকে তা দিয়ে দিলেন এবং বললেন-

كل باحدهما واشتر بالاخر فأسا واعمل به.

"এ দুয়ের একটি থেকে কিছু কিনে খাও আর অপরটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে তার মাধ্যমে কাজ কর। অতপর লোকটির অবস্থার উন্নতি হল।"

রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এমনই ছিল। তিনি ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রত্যেক নাগরিকের শ্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক। একইভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে জ্ঞানী, দক্ষ ও বৈষয়িক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্বও রাষ্ট্রের রয়েছে। যাতে তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হতে পারে।

ইসলামের সোনালী দিনসমূহ এ সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামি রাষ্ট্র বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন- কাগজ শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও এ ব্যাপারে মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। (আল-মাকরীযী ঃ আল-খিতাত ঃ ১/৪১৭)

ইসলাম শুধু মাত্র কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাকেই যথেষ্ট মনে করেনি বরং শ্রমের যথাযথ মূল্য প্রদান ও শ্রমের মজুরী প্রদানে বিলম্ব না করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন-

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।" (ইবনে মাযাহ ঃ ২/৮১৭)

প্রত্যেক শ্রমিক তার কাজের যথাযথ হক আদায়ের ব্যাপারে এবং প্রত্যেক মহাজন তার অধিনস্থ শ্রমিকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল (সা) বলেন-

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته.

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী ঃ হাদীস নং-২৫৫)

ইসলাম শ্রমিকের সহযোগিতা, তার অধিকার ও মর্যাদা হরণ না করা, মহাজনের পক্ষ থেকে তাকে অবহেলা না করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। তার শক্তি-সামর্থ ও স্বাচ্ছন্দ অনুযায়ী কাজ করাতে এবং তার স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টসাধ্য বোঝা চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৮৬)

শুধু তাই নয় বরং ইমাম গাজালী প্রশাসকের উপর শ্রমিকদের জন্য শ্রমের উপকরণ সরবরাহ করাকে আবশ্যকীয় করেছেন। (ইয়াহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন ঃ ৯/১৭৪৬)

আল্লামা শাতেবী দেখিয়েছেন যে, সামষ্টিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিকদের প্রশিক্ষণদান ও তাদের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ৩টি পর্যায়ে হতে পারে। আর এর প্রত্যেক প্রকার জনসমষ্টির স্বার্থে পালন করা আবশ্যক। (আল-মুয়াফাকাত ঃ ১১৯-১২৪)

ইমাম আবু যুহরাহ এ পর্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

প্রথম পর্যায়

এ পর্যায় হবে শিশু, কিশোর, যুবক সবার জন্য ব্যাপক। কেউ এ থেকে পিছু পড়ে থাকবে না। যে এ স্তর থেকে ছুড়ে পড়বে সে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হতে পারবে না। অবশ্য এ স্তর সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিগণের ব্যাপার ভিন্ন। যে এ প্রথম স্তরে অবস্থান করে সে জাতি কাংখিত সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে রত থাকে। তারা হল শ্রমিক সমাজ বা মেহনতী জনতা। জাতি তাদের কর্মের প্রতি বিশেষভাবে মুখাপেক্ষী। আর তারাই কর্ম বা শ্রমের মূল ভিত্তি।

দ্বিতীয় পর্যায়

এট হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের স্তর। এটি এমন একটি স্বতন্ত মর্যাদার স্তর যা শ্রম, উৎপাদন ও জ্ঞানের অনুশীলনকে বিশেষভাবে বিশেষায়িত করে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিচারক, আইজ্ঞ, শিক্ষক প্রমুখ যারা সমাজের প্রধান প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন তারাই এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

এটাকেই ইমাম শাতেবী ব্যক্তিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে পারদর্শী করে তোলা এবং তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (শাইখ আবু যাহরাহ ঃ ইসলামি সমাজব্যবস্থা ঃ ৫৫)

ইসলাম ব্যক্তির শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের তত্ত্বাবধান করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং শ্রমের যথার্থ মজুরী প্রদানের নির্দেশ প্রদান করে। আল্লাহ বলেন-

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.

"প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবেনা।" (সূরা আল-আহক্বাফ : ১৯)

রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে খাটাতে নিষেধ করেছেন। (সুনান নাসায়ী)

শরীয়তের বিধান হচ্ছে, কারো উপর সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপানো যাবে না। বৃদ্ধ বা অতিশয় বয়স্ককে এমন কাজে খাটানো যাবে না যাতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে নারীদের এমন দায়িত্ব দেয়া যাবে না যা তাদের স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। রাসূল (সা) বলেন

عليكم بالاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا.

"তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী কাজ কর। কেননা আল্লাহ কখনো বিরক্ত হবেন না, যতক্ষণ তোমরা বিরক্ত না হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৩)
মহানবী (স) আরো বলেন-

لا تكلفوهم ما لا يطيقون.

"তাদের যা সাধ্যে কুলায় না তা তাদের উপর চাপিয়ে দিও না।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন-

১. মানুষের শ্রমশক্তি প্রধানত কয় প্রকার ?
ক. তিন প্রকার
খ. চার প্রকর
গ. দুই প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার।

২. জাহেলী যুগে কোন পেশা ঘৃণিত ছিল?
ক. চাষাবাদ, কারিগরি, ও নৌ চালনা
খ. কৃষি কাজ
গ. ধাত্রীমাতার পেশা
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৩. শ্রম সম্পর্কে ইসলামের বিধান হল-
ক. শরীরের ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিকের মজুরী দিয়ে দাও।
খ. মানুষের হাতের দ্বারা পরিশ্রম লব্ধ উপার্জনই সর্বোত্তম উপার্জন।
গ. মহান আল্লাহ শ্রমজীবি মানুষকে ভালবাসেন।
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৪. ইসলামে শ্রমকে তুলনা করা হয়েছে-
ক. সাওমের সাথে
খ. ইবাদতের সাথে
গ. জিহাদের সাথে
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৫. কোন্ যুদ্ধ হতে ফেরার পথে মহানবী (সা) সাহাবীর হাতে চুম্বন করলেন ?
ক. খায়বরের যুদ্ধ
খ. তাবুকের যুদ্ধ
গ. উহুদের যুদ্ধ
ঘ. খন্দকের যুদ্ধ।

৬. সকল নবী-রাসূল সাধারণত যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে-

ক. ছাগল চড়ানো
খ. উট চড়ানো
গ. ঘোড়-দৌড় শিক্ষা
ঘ. কৃষি কাজ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শ্রম বলতে কী বুঝায় ? শ্রমের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
২. শ্রমের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. শ্রম ও শ্রমিকের ব্যাপারে আইয়ামে জাহিলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করুন।
৪. শ্রমের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৫. ইসলাম শ্রম ও শ্রমিকের কী মর্যাদা দিয়েছে ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৬. শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম শ্রম ও শ্রমিকের যে মর্যাদা দিয়েছে তার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিন।

পাঠ ঃ ৩

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- মূলধনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মূলধনের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- মূলধনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূলধনকে উৎপাদনে ব্যবহারের নির্দেশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- 'মূলধন বিনিয়োগ পন্থা কি' তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূলধন অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনীতির সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারবেন।

মূলধনের সংজ্ঞা

অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে মূলধন বলা হয় ঐ উৎপাদিত পণ্যকে যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব। অতএব পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, শিল্পসামগ্রী, সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

মূলধনের সংজ্ঞায় অর্থনীতিবিদগণ মতভেদ প্রকাশ করেছেন।

বার্মাক বলেন- Capital is the produced means of production.

এ্যাডাম স্মিথের ভাষয় মূলধন এমন সম্পত্তি যা দ্বারা আয় সম্ভব।

মার্শাল বলেন- আয়ের প্রবাহমান ধারাই মূলধন।

Banhome Bake এর মতে- মূলধন একটি উৎসাহিত উপকরণ।

লিপসের ভাষায়- মূলধন রয়েছে, "সমস্ত মানবসৃষ্ট জিনিস যা নিজের জন্য ভোগ করা হয় না বরং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তাকারী সব মানুষের তৈরি উপকরণ যথা হাতিয়ার, কল-কব্জা ও সাজ-সরঞ্জামাদি।"

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণে মূলধনের দু'টি অর্থ প্রতীয়মান হয়-

১. মূলধন উৎপাদনের উপকরণ

২. মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ

যেহেতু সাধারণ অর্থনীতিতে মূলধনের ক্রিয়ামূলক পারিতোষিক সুদ, সেহেতু ইসলামি অর্থনীতিতে এর ব্যবহার অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধনের গুরুত্বকে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে মূলধনকে উপকরণ হিসেবে রেখে ইসলামি অর্থনীতিতে একে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ. এইচ. এম. সাদেক ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মূলধনের সংজ্ঞা নিরুপন করেছেন এভাবে ঃ

সব ধরনের বাস্তব ভিত্তিক অভিষ্ট সাধনার্থে ভৌত সামগ্রী নয়, বরং অর্থ সংক্রান্ত সম্পদের মূলধন হিসেবে ধরা হয়। এটা সবারই জানা যে, সাধারণ অর্থনীতিতে সুদ হল মূলধনের অতিরিক্ত অংশ। কোন উদ্যোক্তা বা অর্থনীতিবিদ দালান-কোঠার সুদ হিসেব করে না। একটা দালান বা মেশিনের সুদ কত ? এটা কি প্রতি বর্গফুটে হিসাব করা হয় ? প্রকৃত রীতি আলাদা, একজন উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে অর্থ নেয় এবং তা দালান-কোঠা ভাড়া, নির্মাণ, মেশিন ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদিতে ব্যায় করে। অর্থ দিয়ে যে সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে তার উপরে নয় বরং যে অর্থ ধার দেয়া হয়েছে তার উপরই ব্যাংক সুদ ধার্য করে। সে অর্থ দিয়ে শ্রমিক, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপকদের বেতন দেয়া হয়, তার উপরও সুদকষা হয় কিন্তু এগুলো মূলধন হিসেবে গণ্য করা হয় না। অতএব বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থ বা অর্থ সংক্রান্ত সম্পদই মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। (এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামি অর্থনীতি ঃ ৮০)

উপরোক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে বলা যেতে পারে- ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মূলধন বলা হয়ে ঐ সম্পদকে যা পরিবর্তন বা ব্যয় ছাড়া ব্যবহারযোগ্য নয়। যেমন- নগদ টাকা পয়সা ও পণ্য সামগ্রী।

সাধারণ অর্থনীতিতে মূলধনের ক্রিয়ামূলক পারিতোষিক সুদ। উৎপাদনে লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন মূলধনদাতা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন মূলধন যোগানদাতা মুনাফা পাবে এবং তাকে উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি বহন করতে হবে।

মূলধনের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্যযোগ্যঃ

১. সনাতন অর্থনীতিতে মূলধন উৎপাদিত উপকরণ কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে মূলধন এমন সম্পদ যা পরিবর্তন বা ব্যয় সাপেক্ষে ব্যবহার্য।

২. ইহা যোগানের ফলাফল।

৩. মূলধন উৎপাদনশীল। মূলধনের বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৪. মূলধন ক্ষয়শীল। তার কোন স্থায়িত্ব নেই। কেননা উৎপাদন সামগ্রীসমূহ ব্যবহার শেষে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

৫. এটা এক শ্রেণীভুক্ত নয় বরং এর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপান্তর বর্তমান।

মূলধনের প্রকারভেদ

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন-

১. গঠনগত দিক থেকে;

ক. আর্থিক মূলধন ঃ তরল অর্থ, প্রায় মুদ্রা, নগদ ক্যাশ।

খ. দৃশ্যমান মূলধন ঃ যন্ত্রপাতি।

২. অভিপ্রায়গত-

ক. উৎপাদনশীল মূলধন ঃ পণ্য সামগ্রী।

খ. আমদানীমূলক মূলধন ঃ শেয়ার।

৩. ব্যাবহার প্রকৃতির দিক থেকে ঃ

ক. স্থায়ী মূলধন ঃ বাড়ী, ঘর।

খ. বিনিময়গত মূলধন ঃ কাঁচা মাল।

৪. মালিকানাগত দিক থেকে ঃ

ক. বিশেষ মূলধন ঃ ব্যক্তি বা সংস্থার মূলধন।

খ. বিদেশের নাগরিকের মূলধন।

৫. উৎসগত দিক থেকে ঃ

ক. দেশীয় নাগরিকের মালামাল।

খ. বিদেশী নাগরিকের মূলধন।

মূলধনের এ প্রকারভেদসমূহের মধ্যে ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে ঐগুলোই মূলধন যা কেবল ইসলামি অর্থনীতি প্রদত্ব মূলধনের সংগার আওতাভুক্ত।

মহান আল্লাহ মূলধনকে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন-

وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.

"কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবেনা এবং অত্যাচারিত ও হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৯)

এখানে মূলধন বলতে ঐ ধনাগারকে বলা হয়েছে যা জাহেলী যুগে প্রদান করা হত সুদের ভিত্তিতে। এ জন্য এটা হারাম কিন্তু অর্থনৈতিক তৎপরতায় মূলধন ব্যবহার ও উৎপাদনে অংশীদারিত্ব বৈধ।

মূলধনকে উৎপাদনে ব্যবহারের নির্দেশ

ধন-সম্পদ সঞ্চিত করে রাখা এবং তা জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ না করা ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। ব্যক্তি বা সামষ্টির নিকট কোন মূলধন সঞ্চিত হলেই তা আরো অধিকতর উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করার স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে-

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।" (সূরা আত্-তওবা : ৩৪)

এখানে ফি সাবিলিল্লাহ বলতে ঐ সকল ক্ষেত্রকে বুঝায় যেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করলে মানবতার কল্যাণ সাধিত হয় এবং মানুষ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। এছাড়া সমাজে অর্থলোভীকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে-

ويل لكل همزة لمزة. الذى جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।" (সূরা আল-হুমাযাহ ঃ ১-২)

মূলধনকে উৎপাদনে ব্যবহারের স্পষ্ট নির্দেশ রাসূল (সা)-এর মুখেও এসেছে ঃ

الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

"সাবধান ! তোমাদের কেউ ইয়াতিমের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলে আর তার (ইয়াতিমের) নগদ টাকা-পয়সা থাকলে তা অবশ্যই ব্যবসায় নিযুক্ত করবে। তা অকাজে ফেলে রাখবে না। অন্যথায় বাৎসরিক যাকাত ও সাদকাহ তার মূলধন নিঃশেষ করে দেবে।" (তিরমিজী, মুয়াত্তা মালিক)

মূলধন বিনিযোগ পন্থা

মূলধন বিনিযোগের বিভিন্ন পন্থা রযেছে। যেমন-

১. ব্যক্তিগত কারবার
২. অংশিদারিত্ব কারবার
৩. ব্যক্তিগত কারবার ঃ

মানুষ নিজের পুঁজি দ্বারা নিজে কারবার করবে। অর্থাৎ পুঁজিপতি নিজ উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালনা করবে, নিজে শ্রমিক খাটাবে ও তাদের মজুরী প্রদান করবে।

অংশিদারিত্ব কারবার

ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় এই কারবারকে মুদারাবাহ ও ম শারাকাহ কারবার বলে। মুদারাবাহ কারবারে পুঁজিপতি পুঁজির যোগান দেয় এবং উদ্যোক্তা (ব্যক্তি/সংস্থা/ব্যাংক) শ্রমের যোগান দেয়। আবার মুশারাকাহ পদ্ধতিতে পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা উভয়ে মূলধন যোগান দেয় আর উদ্যোক্তা এককভাবে শ্রম যোগান দেয়।

মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনীতির সীমারেখা

ইসলামের রয়েছে একক ও অতুলনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলধন সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মূলধন সংগ্রহ ও রুজি রোজগার হালাল ও শরীয়ত নির্ধারিত উপায়ে হতে হবে। আল্লাহ বলেন-

يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮)

অত্র আয়াতে মানব জাতিকে রুজী-রোজগারের বেলায় হালাল ও শরীয়ত সমর্থিত পথ অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে এবং হারাম তথা শয়তানের নীতি পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বলেন-

اى عبد نبت لحمه من سحت فالنار اولى به.

"যে বান্দার দেহের রক্ত-মাংস হারাম থেকে গঠিত তার জন্য জাহান্নামের আগুনই যথেষ্ট।" (মুসনাদে আহমদ ঃ ৩/৩২১)

এ হাদীস আমাদেরকে এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছে যে, মুয়ামালাত ও কামাই-রোজগারের ক্ষেত্রে হারাম পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে, যে শরীর উপার্জনের ব্যাপারে কতগুলো সীমারেখা দিয়েছে যা অতিক্রম করা যাবে না। আরো কতগুলো হারাম পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছে যার মাধ্যমে আয় উপার্জন হারাম। ঐ হারাম পন্থাগুলো নিম্নরূপ-

১. সুদ ঃ

ইসলামি শরীয়ত সুদকে হারাম করেছে। যার দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

প্রথমত ঃ কুরআন

১. মহান আল্লাহ বলেন- وأحل الله البيع وحرم الربا

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় কে হালাল ঘোষণা করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৭৫)

২. আল্লাহ বলেন-

يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.

"হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদ যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৮)

উল্লিখিত আয়াতসমুহে রিবা হারাম করা হয়েছে এবং রিবা সম্পর্কিত সকল প্রকার লেন-দেন ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ সুন্নাহ

মহানবী (সাঃ) বলেন-

لعن الله اكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه.

"মহান আল্লাহ সুদখোর, সুদদাতা, সুদ বিষয়ক লেখক ও উহার সাক্ষ্যদাতাকে লা'নত করেছেন।" (সহীহ বুখারী: হাদীস নং-২০৮৬)

অত্র হাদীস রিবা হারাম হওয়ার প্রকাশ্য দলীল। এ ছাড়াও রিবা সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে, যাতে রিবা বা সুদ বিষয়ক লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর তাতে রিবা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ ইজমা

মুসলিম উম্মাহ এ কথার উপর একমত যে, রিবা হারাম।

চতুর্থত ঃ কিয়াস

কিয়াস বা সাধারণ জ্ঞানেও রিবা হারাম। কেননা রিবা বা সুদের লেনদেন দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

রিবা একটি সামাজিক ব্যধিতুল্য। যা মানুষের মধ্যকার পরস্পর সাহায্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট করে দেয়। আর এ পাস্পরিক সাহায্য ও ভাতৃত্ববোধই হল মুসলিম সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (আহমদ মহিউদ্দিন আল আজুয ঃ মানাহেজুশ শরীয়াতুল ইসলামিয়া ঃ ২/৭০)

আল্লামা মওদুদী (রঃ) সুদ ও সুদী কারবার প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমরা যখন সুদের অপকারিতা ও কুফলের ব্যাপারে অন্তরের গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে, সুদের মাধ্যমে পুজি বা সম্পদ একত্রিত করণের প্রচেষ্টাকে বিবেকও সমর্থন করে না। কেননা রিবা বা সুদ কৃপণতা শিখায়, মন-মানসিকতাকে সংকুচিত করে, হৃদয়কে শক্ত করে, সম্পদের পূজারী বানায়, বস্তুবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করাসহ অন্যান্য কুফল বয়ে আনে। (শায়খ মওদুদী ঃ কিতাবুর রেবা ঃ ৪০-৪১)

সুদী কারবার নৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিকর। স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকও সুদকে প্রত্যাখ্যান করে। পূর্ববর্তী সকল ঐশী জীবনব্যবস্থায়ও সুদ হারাম ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় সুদকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। তারা সুদের মাধ্যমে জীবন ধারণের সামগ্রী তথা সম্পদ অর্জনকে নিষিদ্ধ মনে করত। (Internafional Encyclopedia of Science : 7/474)

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মও সুদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আমেরিকান বিশ্বকোষে বলা হয়েছে ঃ খৃষ্টান, ইয়াহূদী ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন হারে সুদ হারাম করে। (Encyclopedia Amrican : 15/250)

ড. ফজলে ইলাহি বলেন ঃ সুদ মানবতার জন্য ক্ষতিকারক। কারণ সুদের কারণে সমাজ এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে যাতে ঐ সমাজের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ঐ সমাজের একতায় ফাটল ধরে। রিবার আরো ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক দিক হল এই যে, যে সমাজে সুদের প্রচলন রয়েছে সে সমাজের লোকেরা সমাজের উপকারে বিভিন্ন কল-কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করে না। কেননা কল-কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ না করে সুদে মাল খাটালে তাতে বিনা কষ্টে সে সুদের একটি মোটা অংশ লাভ করে।

ইমাম রাযী বলেন ঃ কোন কোন মনীষী সুদ হারামের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন। কেননা সুদ মানুষকে কামাই-রোজগার ও আয় উপার্জনের কর্ম থেকে বিরত রাখে। কারণ দিরহামের

মালিক (সম্পদের মালিক) যখন সুদের কারবারের মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত দিরহাম লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন সে আয় উপার্জন ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি ছেড়ে দেয়। কেননা এসব কাজে তাকে কঠোর পরিশ্রমের সম্মুখীন হতে হয়। (তাফসীরুল কবীর ঃ ৭/৮৭)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী বলেন ঃ যখন মালের দ্বারা সুদের বিনিয়োগ শুরু হয়ে যায়, তখন কৃষিকাজ, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। অথচ কৃষি, কল-কারখানা স্থাপন আয় উপার্জনের মূল উৎস। (হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ ঃ ১০৬)

কিছু পাশ্চত্য অর্থনীতিবিদ -তন্মধ্যে স্যার টমাস ক্লিপার (sir Thomas Clepper) গুরুত্ব সহকারে একথা বলেছেন যে, সুদী লেনদেন ও সুদের উচ্চহার মানুষকে পরিশ্রমের স্থানে অলস বানায়। এবং মানুষকে উপার্জকের বদলে সুদখোর বানায়। (Economic Doctorins of Islam : 3/98)

জার্মান অর্থনীতিবিদ সালভিউজেনস মূলধনের ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ সুদের হার বৃদ্ধির কারণে মূলধনের হার কমে যায়। সুদের হার যত বৃদ্ধি পাবে মূলধনের হার তত কমবে, আবার সুদের হার যত কমবে মূলধন তত বৃদ্ধি পাবে। (The General Theory of Employment, Interest & Money : 356)

সুদের ক্ষতিকারক অন্যতম দিক হচ্ছে, এটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। বর্তমান বিশ্ব ক্রমবর্ধমান দ্রব্যম ল্যের অভিযোগ করে আসছে। এর মূল কারণ হল সুদ ভিত্তিক লেনদেন। কেননা সম্পদের মালিক বা পুঁজিপতি তার অর্থ সম্পদ শিল্প, কল-কারখানা, কৃষিকাজ, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে রাজী হয় না। কারণ এখানে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভ-লোকসান উভয়েরই সম্ভবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় লাভের অংশ চলমান সুদের হারের চেয়ে অনেক কম হয়। এক কথায় উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভ-লোকসান নির্ধারিত থাকে না। কিন্তু সুদের বিনিময়ে অর্থ বিনিয়োগ করলে এসব ঝুঁকি বহন করতে হয় না। নির্ধারিত হারে বিনিময় পাওয়া যায়। ফলে পুঁজিপতিরা সম্পদ সুদের বিনিময়ে বিনিয়োগ করে। এজন্য কল-কারখানায় উৎপাদন কমে যায় এবং স্বল্প উৎপাদনের কারণে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি থাকে। (ড. ফজলে ইলাহী জহির ঃ সুদ দূরীকরণের উপায় ঃ ৮৫)

সুদের আরেকটি ভয়াবহ পরিণতি হচ্ছে, ইহা বেকারত্বের কারণ। কেননা পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদ সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে ফলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা হ্রাস পায় এবং কর্মের পরিধি কমে যায়। আর কর্মের পরিধি কমে যাওয়ায় সমাজে বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Social Justice in Islam : 14)

২. প্রতারণা ঃ

প্রতারণার কারণে মানুষ ইসলামি আখলাক ও সচ্চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা সম্পূর্ণ হারাম।

একদা মহানবী (সা) একটি খাদ্যের স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে তিনি ভেজা অনুভব করলেন। তিনি খাদ্যের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী ব্যাপার হে খাদ্যের মালিক ? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যে বৃষ্টির পানি পড়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি ভেজা অংশ উপরিভাগে রাখলে না কেন, যাতে মানুষ দেখতে পেত ? অতঃপর তিনি বললেন-من غشنا فليس منا.

"যে আমদেরকে ধোকা দিবে এবং আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।" (সহীহ মুসলিম, শরহে নবভী ঃ ১২/২০৮)

মজুতকরণ

ইসলাম মানুষকে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে। ব্যবসা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মানুষের মঙ্গল সাধন। কিন্তু ব্যবসায়ের পণ্য বাজারজাত না করে তা কুক্ষিগত করে মজুত করলে বা গুদামজাত করলে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর লোক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এর ফলে বাজারে পণ্য হ্রাস পায়। যার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এজন্য ইসলামে মজুতকরণ হারাম করা হয়েছে। (আহমদ, মহীউদ্দীন আল-আজুয : ইসলামি খিলাফত ঃ ১০৬)

মজুতকরণের মানে হল, অধিক মূল্য লাভের আশায় ব্যবসায়ী পণ্য গুদামজাত করে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা। অতঃপর মূল্যের উর্ধগতি দেখে তা বাজারে ছাড়া। অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা অধিক মুনাফা লাভের আশায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বাজারজাত না করে তা কুক্ষিগত করে রাখে, আবার যখন ঐ

পণ্যের দাম বেড়ে যায় তখন উহা বাজারে ছাড়ে। এহেন গর্হিত কর্ম ইসলামি শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে দরিদ্ররা। রাসূল (সা) বলেন-

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

"বাজারে খাদ্য আমদানীকারীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযকপ্রাপ্ত আর মজুতকারীরা আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত।" (সুনান ইবনু মাজাহ : ২/৭২৮)

অন্য হাদীসে রাসূল (সা) বলেন- لا يحتكر الا خاطئى.

"পাপী লোক ছাড়া কেউ মজুত করে না।" (আশ্‌শাওকানী ঃ নায়লুল আওতার : ৫/২৪৯)

ঘুষ

কোন কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করাই ঘুষ। ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করা বা এর কারবার করা হারাম। কেননা ঘুষের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে মানুষের কোন কল্যাণই নেই, বরং রয়েছে জুলুম বা অন্যায়। ইসলামি জীবনব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সমস্ত রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থায় ঘুষকে হারাম করা হয়েছে। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ঘুষের কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সূতরাং মূলধন উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের জন্য ঘুষের আশ্রয় নেয়ার কোন স্বাধীনতা নেই।
ঘুষ হারাম হওয়ার দলীল হচ্ছে, রাসূল (সা)-এর বাণী

لعن الله الراشى والمرتشى والرائش.

"মহান আল্লাহ ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা ও এ দু'জনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী (দালাল)-কে লা'নত করেন।" (সুনান আত-তিরমিজী ঃ ২/৩৯৭)

লা'নতের অর্থ হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে চলে যাওয়া। ঘুষখোরের উপর আল্লাহর লা'নত কলতে বুঝায় ঘুষ গ্রহণ ও দান থেকে অধিক ভীতি প্রদর্শন। সূতরাং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঘুষ সম্পর্কীত লেন-দেন থেকে বিরত থাকতে হবে।

অপহরণ বা ছিনতাই

অপহরণের আরবী হল الغصب যার মানে হল, অন্যায়ভাবে এবং প্রকাশ্যে কারো মালের উপর চড়াও হওয়া। (ইবনু কুদাম ঃ আল মুগনি ঃ ৫/২৩৮)
ইসলামি শরীয়াতের দৃষ্টিতে আয়-উপার্জন ও সম্পদ সঞ্চয়ের বেলায় এহেন গর্হিত কাজ হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন-

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

"হে মুমিনগণ ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে হলে কোন দোষ নেই।" (সূরা আন-নিসা : ২৯)

মহান আল্লাহ অপহরণ ও ছিনতাইয়ের নিষেধাজ্ঞা ও তার শাস্তি সম্পর্কে বলেন-

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا..

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হল তাদেরকে হত্যা করা হবে।.....।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩৩)
রাসূল (সা) বলেন-

من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الله من سبع ارضين.

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমিন গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত তবক জমিন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেবেন।" (সহীহ বুখারী ঃ ২৪৫২)

সূতরাং কোন ব্যক্তির সম্পদ তথা মূলধন উপার্জনের ক্ষেত্রে অপহরণ বা ছিনতাইয়ের আশ্রয় নেয়ার কোন অধিকার নেই। কেননা এর মাধ্যমে অন্যের প্রতি যুলম করা হয় এবং অন্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১.লিপসের সংজ্ঞা বিশ্লেষণে মূলধনের কয়টি অর্থ প্রতীয়মান করা যায় ?

ক. ২টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ৫টি।

২. মূলধনের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ক'টি ?

ক. ৭টি খ. ৫টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি।

৩. উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধন কত প্রকার ?

ক. চার প্রকার খ. পাঁচ প্রকার গ. দুই প্রকার ঘ. তিন প্রকার।

৪. মূলধন বিনিয়োগের ক'টি পন্থা রয়েছে ?

ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ২টি ঘ. ৫টি।

৫. অংশীদারিত্ব কারবারকে ফিকহী পরিভাষায় বলা হয়-

ক. মুদারাবাহ খ. মুদারাবাহ ও মুশারাকাহ গ. মুশারাকাহ ঘ. বাইয়ে সালাম।

৬. সুদ মানবতার জন্য ক্ষতিকারক এ কথাটি বলেন-

ক. ড. ফযলে ইলাহী খ. অর্থনীতিবিদ মার্শাল গ. অর্থনীতিবিদ ফ্রেসার ঘ. ড. আঃ মান্নান।

৭. অপহরণের আরবী নাম হচ্ছে-

ক. গসব খ. রিবা গ. সারাকা ঘ. খিয়ানাহ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মূলধনের সংজ্ঞা দিন।
২. মূলধনের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৩. মূলধন বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা আলোচনা করুন।
৪. অংশীদারিত্ব কারবার পদ্ধতির বিবরণ দিন।
৫. সুদের ক্ষতিকারক দিকগুলো আলোকপাত করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মূলধন কী ? মূলধনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্যসহ মূলধন বিনিয়োগ পন্থাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ভূমির পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে ভূমির পরিচয় দিতে পারবেন।
- ভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমির পরিচিতি

উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে প্রধান উপকরণ হচেছ ভূমি। ভূমি বলতে সাধারণ অর্থে ভূপৃষ্ঠকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আলো, বাতাস, নদী, পর্বত, বন-জঙ্গল, খনি, সমুদ্র ইত্যাদি যা সৃষ্টিতে মানুষ কোন শ্রম সাধনা ব্যায় করেনি। সব কিছু এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যাপক মার্শালের মতে ঃ ভূমি বলতে সেই সমস্ত সম্পদ 'যা প্রকৃতি, পানি, আলো ও উত্তাপের মাধ্যমে মানুষকে মুক্ত হস্তে উপহার দিয়েছে'।

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের ভাষায়ঃ ভূমি বলা হয় ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদকে যা মানুষ ব্যক্তি মালিকানায় এনে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে।

ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে ভূমি

সনাতন অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমি পরিভাষা ও সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। সনাতন অর্থনীতিতে জমিকে একটা উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। চাহিদার সাথে এর যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। এরূপ ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে অকার্যকর। এক খন্ড জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক নয়। অন্যদিকে সাধারণ অর্থনীতিতে মূলধনকে মোটামুটিভাবে স্থিতিস্থাপক ধরে নেয়া যায় অর্থাৎ প্রয়োজনে এর যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। যদি মূলধনী দ্রব্যটি জটিল কলকব্জা দ্বারা সজ্জিত হয় তবে এর যোগান চাহিদার সাথে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এসব সমস্যার প্রেক্ষাপটে ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণে ভূমির পরিবর্তে ভৌত সম্পত্তি পরিভাষাটি প্রবর্তন করা হয়েছে। আর এই ভৌত সম্পত্তি বলতে ঐসব পূণঃ ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লীজ বা ভাড়ায় খাটানো যায়। ড. এ. এইচ. এম. সাদেকের ভাষায় : "In Islam land is used in a broader sense all those material means that can be leased and rented to be used in the process of the production. Which do not have to be wholly can sumed while used as a factor of production, may be termed as land."

তার মতানুযায়ী এ ভৌত সম্পত্তির যে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে তা হল ঃ

১. এটা প্রাকৃতিক সম্পদ হতে পারে যেমন-জমি অথবা উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ (Produced means of production) যা সনাতন অর্থনীতিতে মূলধন যেমন-কলকব্জা হতে পারে।
২. একে ভাড়ায় খাটানো যায় যেমন- দালান কোঠা
৩. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এর অবচন হতে পারে।

মোটকথা ভৌত সম্পত্তি আসলে দু'রকম, সনাতন উপকরণের সামষ্টি, জমি ও ভৌত মূলধন। (এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামি অর্থনীতি)

অতএব ইসলামি অর্থনীতিতে ভৌত সম্পত্তি বলা হবে ঐসব সম্পদকে যা কোন রকম ব্যয় বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া বারবার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়।

ভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এ পার্থিব জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অপরিহার্য সামগ্রীসমূহ এ পৃথিবীতেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতেই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর" (সূরা আল-আরাফ : ১০)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষের জীবনধারণের যাবতীয় উপায়-উপাদান ভূমি থেকে উৎপাদিত হয়।

খাদ্যের যোগান প্রদান

ভূমি খাদ্য উৎপাদন করে। আল্লাহ বলেন-

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه.

"তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকা সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিক থেকে আহার করো।" (সূরা আল-মুলক : ১৫)

এ আয়াত দ্বারা জানা যায়, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা ভূপৃষ্ট হতে লাভ করা যায়। কিন্তু এ জীবিকা সংগ্রহের জন্য মানুষকে অশেষ শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়। মাটির পরতে পরতে সম্ভবনাময় জীবিকা অনুসন্ধান করে নিতে হয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.

"হে মুমিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

খনিজ সম্পদ সরবরাহ

ভূমি খনিজ সম্পদ সরবরাহ করে। ভূমির অতল গভীরে অসংখ্য প্রকার মহামূল্যবান খনিজ দ্রব্যের স্তুপ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ সবের অর্থনৈতিক মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اطلبوا الرزق فى خبايا الارض.

"মাটির গভীর তলদেশে তোমরা জীবিকার সন্ধান কর।" (তাবরানী)

পরিবহন ব্যবস্থা

ভূমি পরিবহন ব্যবস্থার উপর বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। পণ্যদ্রব্য স্থানান্তর করার জন্য প্রধানত দু'টি পথই ব্যবহৃত হয়ে থাকে- জলপথ ও স্থলপথ। জলপথে নৌকা ও জাহাজই প্রধান বাহন। বর্তমানে আকাশপথও এ কাজে ব্যবহার হচ্ছে। আল্লাহ বলেন-

والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس.

"এবং নৌযান মানুষের উপকারার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সমুদ্রের পথে চলাচল করে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৬৪)

স্থলপথে আমদানী রফতানী কাজে প্রাচীনকালে চতুষ্পদ জন্তুই ব্যাবহার করা হত। আল্লাহ বলেন ঃ

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.

"ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আন-নাহল: ৮)

বর্তমান সময়ে মটর, ট্রাক, রেলগাড়ী প্রভৃতি বাষ্পচালিত যান এ কাজ অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। এসব যানবাহনের সাহায্যে ভারী দ্রব্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে দূরবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে আমদানী রপ্তানি করা যায়। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন-

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.

"এসব তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী দূরবর্তী এমন শহর ও স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু তোমাদের রব বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়াময়।" (সূরা আন-নাহল:৭)

শিল্পে কাঁচামাল যোগান

ভূমি শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগান দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

"অতঃপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, তারপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান ফল ও গবাদিখাদ্য।" (সূরা আবাসা : ২৬-৩১)

উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ভূমি বা ভৌতসম্পত্তির শ্রেণী বিভাজন সম্ভব। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে তা নিম্নরূপঃ

ভূমি বা ভূপৃষ্ট

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূপৃষ্টের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আল্লাহ বলেন-

فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.

"অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন সামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মুশরী, পেয়াজ প্রভৃতি।" (সূরা আল-বাকারা : ৬১)

ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

"অতঃপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, তারপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন উদ্যান ফল ও গবাদিখাদ্য।" (সূরা আবাসা : ২৬-৩১)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এসব ঘোষণা দ্বারা উৎপাাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমির সতন্ত্রতা প্রমানিত হয়।

খনিজ সম্পদ

ভূপৃষ্ঠের সীমা সংখ্যাহীন উপাদান সামগ্রী ও কাঁচামাল ব্যতীত ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের অসামান্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মাটির অতল গভীরে অসংখ্য প্রকার মহামূল্যবান খনিজদ্রব্যের স্তুপ স্বাভাবিকভাবেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, এর পরিমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। খনিজ পদার্থ মাটির সাথে মিশে আছে। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। কেননা মাটির এসব মৌলিক উপাদান দিয়েই মানব দেহের সৃষ্টি হয়েছে। (মাওঃ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, পৃ-৪৪) বৃক্ষ, লতা-গুল্ম, সব্জি ইত্যাদি মাটি থেকে রস গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে আর মাটির রসের সঙ্গে এসব খনিজ দ্রব্য আহরণ করে থাকে। মানুষ এসব গাছ ও লতা ফল-মূল এবং শাক-সব্জি ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে ফলে উল্লিখিত খনিজ পদার্থসমূহের সারাংশ মানব দেহে প্রবেশ করে।

মানব সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য লৌহ, তাম্র, পিতল, ইস্পাত, স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-মানিক্য, পেট্রোল ও কেরোসিন ইত্যাদি দ্রব্য মানুষ খণি থেকেই লাভ করে। এসব দ্রব্য উৎপাদনের স্বীকৃতি রাসূল (সা)-এর কথায় পাওয়া যায়:

اطلب الرزق فى خبايا الارض.

"মাটির গভীর তলদেশে ভূপৃষ্ঠের পরতে পরতে জীবিকার সন্ধান কর।" (তাবরানী)

যে লৌহ বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মেরুদন্ড এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবনী ও শৈল্পিক যন্ত্রপাতির মূল সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.

"আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, তাতে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে এবং তাতে আছে মানুষের প্রভূত কল্যাণ।" (সূরা আল-হাদীদ : ২৫)

প্রাকৃতিক বারিধারা

প্রাকৃতিক বারিধারা বলতে সাগর, নদ-নদী ও নালা বুঝায়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর বহু দেশ ও দীপপুঞ্জ সন্নিহিত সাগরের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে সমুদ্র গর্ভে অশেষ ও অসীম পরিমাণ খনিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে।

ভূভাগের শতকরা ৭১ ভাগ সমুদ্র পরিবেষ্টিত। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, এই বিশাল সামুদ্রিক ভান্ডারে ৫ কোটি লক্ষ টন পরিমাণ দ্রবীভূত উপাদান বা লবন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীব্যাপী প্রগতিশীল সমাজের খনিজ ও ধাতব বস্তুর চাহিদা পূরণের জন্য এ পরিমাণই যথেষ্ট। (মাওঃ আব্দুর রহীম ঃ ইসলামের অর্থনীতি ঃ পৃ. ৪৫)

উর্বরতার দিক থেকে সমুদ্র যে কোন সুউর্বর জমির সাথে তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতি একর জমির উর্বরতার তুলনায় সমুদ্র অধিক উর্বর। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের জমির বেলায় যেমন বন্যা, খরা, পোকা মাকড় ইত্যাদির ভয় রয়েছে সমুদ্রে তা নেই।

সামুদ্রিক সম্পদের এই বিপুল সম্ভাবনার জন্যই আল্লাহ অশান্ত তরঙ্গ, বিক্ষুব্ধ ও সর্বগ্রাসী নদী-সমুদ্রকে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। মানুষ তার তলদেশে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদই আহরণ করতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

سخ ... و ٱلبحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها.

"তিনি সমুদ্রকে তোমাদের জন্য বাধ্য ও অধীন করে দিয়েছেন, যেন তা থেকে তোমরা তাজা মাছ আহার করতে পার এবং রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিদান কর।" (সূরা আন-নাহল : ১৪)

৪. বায়ু, বৃষ্টি ও বিদ্যুত মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনের কাজে অপরিহার্য। বায়ু এবং বৃষ্টি না হলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষা পেতে পারে না। তাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনের জন্যও এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। আল্লাহ বলেন ঃ

وتصريف ٱلرياح وٱلسحاب ٱلمسخر بين ٱلسمآء وٱلأرض لآيات لقوم يعقلون.

"বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও প্রথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৬৪)

বিদ্যুত অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু। কুরআনের ভাষায় বিদ্যুত মানুষের আশা ভরসার প্রধান কেন্দ্র এবং অপূর্ব সম্ভাবনার উৎস। আল্লাহ বলেন ঃ

و من آياته يريكم ٱلبرق خوفا وطمعا وينزل من ٱلسمآء مآء فيحيى به ٱلأرض بعد موتها إن فى ذ لك لآيات لقوم يعقلون.

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুত প্রদর্শন করেন ভয় ও আতংকের জিনিস হিসেবে এবং আশা ও আকাংখার উৎসরূপে, এবং তিনি উর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করেন, পরে তার সাহায্যে মৃতজমি সঞ্জীবিত করেন।" (সূরা আর-রূম : ২৪)

একইভাবে বৃষ্টি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার ঃ

هو ٱلذى أنزل من ٱلسماء مآء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، ينبت لكم به ٱلزرع وٱلزيتون وٱلنخيل وٱلأعناب ومن كل ٱلثمرات إن فى ذ لك لآ ية لقوم يتفكرون

"তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (আন আন-নাহল : ১০-১১)

প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষ আজ নানাভাবে ব্যবহার করে তা থেকে নানাবিধ শক্তি আহরণ করে অসংখ্য কাজে লাগিয়ে থাকে। পানি ও আগুনের ব্যবহারে বাষ্প ও বিদ্যুত এবং ঝর্ণাধারা, তীব্র জলস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ থেকে বিরাট শক্তি উৎপন্ন হয়ে মানব সভ্যতাকে আজ অপূর্ব সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। সুর্যকিরণ, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, আনবিক শক্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি নানা দিক দিয়ে মানুষের জীবন ও সমাজকে উন্নত করেছে।

জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখী

পশু-পাখী ও জন্তু-জানোয়ার অর্থোৎপাদনের এক প্রাচীনতম উপাদান। পশু শিকার করে আহার করা যায়, বিক্রয় করে অর্থ লাভ করা যায়, লালন-পালন ও তার বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে সম্পদ অর্জনের পথ সুগম করা যায়। পশুর হাড়, পশম, চামড়া ও দুধ ইত্যাদি মানব সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদান সম হের অন্যতম। বিশেষ পশুকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজেও ব্যবহার করা যায়। পশুর এ বিচিত্র ও বহুবিধ ব্যবহার কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

"তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও অনেক উপকার রয়েছে এবং তোমরা তা আহার করে থাক।" (সূরা আন-নাহল : ৫)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ.

"গবাদী পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ছোট ছোট পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রিযিক হিসেবে তোমাদেরকে তা দিয়েছেন।" (সূরা আল-আনয়াম : ১৪২)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً.

"ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এসবকে তোমরা যানবাহন কিংবা ভারবহনের কাজে ব্যবহার করবে এবং তা তোমাদের জীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।" (আন-নাহল ঃ ৮)

অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপাদান হিসেবে পাখীরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। এর গোশত ও ডিম উৎকৃষ্ট খাদ্য। হাঁস-মুরগী, কবুতর প্রভৃতি পাখী লালন-পালন করে আজ মানুষ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করছে এবং জীবন-ধারণের উপজীবিকা হিসেবে গুরুত্ব দিচেছ। পাখীর পালক দিয়েও বহু মূল্যবান জিনিস প্রস্তুত হতে পারে। পাখীর ব্যবসা অপেক্ষাকৃত কম মূলধন সাপেক্ষ। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সবল লোকদের পশু পালন ও অস্বচ্ছল লোকদের পাখী পালন ও ব্যবসার নির্দেশ দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. ভূমি বলতে ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায় যা মানুষ ব্যক্তি মালিকানায় এনে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে।
২. মানুষের জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় উপাদান ভূমি থেকে সৃষ্ট।
৩. শিল্পায়নের কাঁচামাল ভূমি যোগান দিতে পারে না।
৪. শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর প্রভৃতি ফলের বাগান পৃথিবীতে এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে।
৫. ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, পটাসিয়াম, আয়োডিন মানব স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য উপাদান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমি বলতে কী বুঝায় ? লিখুন।
২. ভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোকপাত করুন।
৩. 'ভূমি খনিজ সম্পদ যোগান দেয়'- ব্যাখ্যা করুন।
৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বারিধারার গুরুত্ব লিখুন।
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বায়ু, বৃষ্টি ও বিদ্যুতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৬. অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে পশু-পাখির গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ বিচার করুন।

পাঠ ঃ ৫

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সংগঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংগঠনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংগঠন হিসেবে উদ্যোক্তার কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতিতে সংগঠন-এর গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

সংগঠনের সংজ্ঞা

সংগঠন বা Organization এক প্রকার মানসিক শ্রম। কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা বা সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত কোন ক্রমেই ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব নয়। আর এ কারণেই অর্থনীতিবিদগণ সংগঠনকেও স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে দেখেছেন। সংগঠন বলা হয়, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনকে-

M. Gaus Khan বলেন ঃ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ ও দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে শ্রমের ব্যবস্থাপনাই সংগঠন।

আধুনিক অর্থনীতিতে সংগঠনকে উদ্যোক্তাও বলা হয়। আর উদ্যোক্তা শব্দটি ফারসx Entrepreneur থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ঐ ব্যক্তি যে কাজের ভার বহন করে।

অর্থনীতিবিদ লিপনের মতে ঃ একজন উদ্যোক্তা ঐ ব্যক্তি যে নতুন ধরণের দ্রব্য অথবা দ্রব্য উৎপাদনের ঝুকি নেয়। একজন উদ্যোক্তা জমি, শ্রম ও মূলধনের ব্যবস্থা করে এবং এগুলো ব্যবহারে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে বলে ধরে নেয়া হয়।

উদ্যোক্তা হিসেবে সংগঠনের কার্যাবলী

১. উদ্যোগ গ্রহণঃ উদ্যোক্তা বা সংগঠনের প্রধান ও প্রথম কাজ হল, উৎপাদনের বা ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ। লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত সকল দিক বিবেচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করা সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব।

২. উৎপাদনের উপকরণসমূহের সমন্বয় সাধন ঃ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যেমন- ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় সাধন করা উদ্যোক্তার দায়িত্ব। কেননা ভূমি ও মূলধন নির্জীব এবং শ্রমিক ব্যবস্থাপক ছাড়া শ্রম প্রয়োগে অক্ষম।

৩. ব্যবস্থাপনাঃ কৃষি, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উদ্যোক্তার। শ্রম প্রয়োগ, শ্রমিক নিয়োগ, তাদের মজুরী প্রদান ইত্যাদিসহ উৎপাদন সংক্রান্ত সবকিছুর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধায়ন করা উদ্যোক্তার কাজ।

৪. দায়িত্ববহন ঃ সংগঠক বা উদ্যোক্তা উৎপাদনের লাভ, লোকসানের দায়-দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু মূলধন, ভূমি, শ্রমিক এ দায়-দায়িত্ব বহন করে না। উৎপাদনের এসব উপকরণ শুধুমাত্র তাদের বিনিময় পারিতোষিক নিয়েই ক্ষান্ত হয়।

৫. নতুনত্ব প্রবর্তন ঃ অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্কের মতে, সংগঠনের অন্যতম কাজ হল, নতুনত্ব প্রবর্তন করা। গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করে উৎপাদন বৃদ্ধি তার দায়িত্ব। কেননা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলে উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে ব্যয় কমে যায়।

৬. বাজারজাতকরণ ঃ বাজারজাতকরণ সংগঠকের অন্যতম কাজ। সর্বাধিক লাভের জন্য তার দ্রব্যগুলো দেশের দূর-দূরান্তে, সর্বত্র পৌছাতে হবে। এছাড়া মালামাল বিদেশে রপ্তানী করার জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচারের আশ্রয় নিতে হয়।

৭. দ্রব্যের মান নির্ণয় ও নীতি নির্ধারণ ঃ সংগঠন কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করবে এবং তার গুণগত মান কিভাবে রক্ষা করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এবং এতদ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করবে।

ইসলামি অর্থনীতিতে সংগঠন

ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সংগঠনের স্বতন্ত্র্য নিয়ে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান হিসেবে সংগঠন বা উদ্যোক্তার গুরুত্ব স্বীকার্য। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ সংগঠন শক্তি হিসেবে কাজ করে, যখন মিশরাধিপতি রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বভার ইউসুফ (আ)-এর উপর অর্পণ করার প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন ঃ

إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ.

"আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন হলে।" (সূরা ইউসুফ : ৫৪) ইউসুফ তখন বললেন :

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

"ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভান্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫)

বস্তুত এখানে দৈহিক শক্তির কথা না বলে মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা এবং সংগঠন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়, মূলত ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সংগঠন এক নিগূঢ় সত্য। ইসলাম আগাগোড়াই এক অখন্ড সংগঠন। ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ সংগঠনের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণভাবে সমাজ জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) সংগঠনকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের খলীফাকে রাজনৈতিক সংগঠনকারী হিসেবেই প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেয়া সংগত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতিতে সংগঠন বা উদ্যোক্তার সনাতন অর্থ মোটামুটিভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে এখানে একটা মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি উদ্যোক্তা ও মূলধনের মালিকানার সাথে জড়িত। যেখানে উদ্যোক্তা ও মূলধনের মালিক এক নয়, সেখানেই এর তাৎপর্য নিহিত। ইসলামি অর্থনীতিতে দু'ধরনের পদ্ধতি খুবই সনাতন, মুদারাবা ও মুশারাকা। মুদারাবা অর্থ অংশীদারী ব্যবসা। এ ব্যবস্থায় এক অংশীদার সম্পূর্ণ মূলধন যোগান দেয় (যেমন, ব্যাংক) অন্য অংশীদার (উদ্যোক্তা) প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ (যেমন- শ্রম) যোগান দেয়। পূর্বনির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী তারা লাভ ভাগ করে নেয়। আর যদি কোন লোকসান হয় তবে মূলধন যোগানদাতা (ব্যাংক) তা সম্পূর্ণ বহন করে, উদ্যোক্তা এর কোন অংশ বহন করে না। মুশারাকা ব্যবস্থাপনায় উভয় অংশীদারই মূলধনের যোগান দেয় এবং পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে লাভ ও লোকসান ভাগ করে নেয়। অতএব ইসলামি অর্থনীতিতে একজন উদ্যোক্তার আয় পূর্বনির্ধারিত নয়, যদিও অংশীদারিত্ব ব্যবসার ক্ষেত্রে তার লাভের অংশ পূর্বেই অবহিত। (এম.এ. হামিদ,পৃ-৮০)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. সংগঠন কী ?

ক. এক প্রকার মানসিক শ্রম
খ. কাজ ও দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যম
গ. কোন কাজের সমষ্টি
ঘ. কোন কাজের কৌশল অবলম্বন।

২. উদ্যোক্তা হিসেবে সংগঠনের কাজ ক'টি ?

ক. চারটি
খ. পাঁচটি
গ. সাতটি
ঘ. ছয়টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংগঠন কী ? সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের মতামত উল্লেখ করুন।
২. উদ্যোক্তা হিসেবে সংগঠনের কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৩. ইসলামি অর্থনীতিতে সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. সংগঠন বলতে কী বুঝায় ? সংগঠনের কার্যাবলী ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

ইউনিট ৩

ইসলামে ভূমিনীতি

ভূমিকা

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ভূমি হচেছ উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। এটি মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর অফুরন্ত দান। কুরআন-সুন্নাহর নীতিমালা ও খুলাফাই রাশেদুনের কর্মনীতিতেই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ভূমির ব্যবহার, ভূমিতে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মালিকানা নির্ধারণ, অধিকার ও ভোগ-দখলের যাবতীয় নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ফলে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ভূমির অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও গুরূত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ভূমি ও ভূমি-স্বত্বের গুরূত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা ভূমি হতেই উৎপন্ন হয়। কতক ভূমি আবাদী আবার কতক ভূমি চাষের অযোগ্য। এ সকল ভূমির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় হযরত উমরের ভূমি সংস্কার নীতিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় জমিদারী প্রথা স্বীকার করা হয় না। তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিছু কিছু ভূমির স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্বোপরি ভূমির সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। রাষ্ট্র ও জনগণ খাদ্য উৎপাদন, শিল্প-কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ, আবাসস্থল নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ভূমি ব্যবহার করে থাকেন। আলোচ্য ইউনিটে ইসলামে ভূমি স্বত্ব ও মালিকানা, ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ চাষাবাদ, হযরত উমরের ভূমি সংস্কারনীতি, ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে এ ইউনিটকে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠগুলো নিম্নরূপঃ

- ❖ পাঠ-১ : ইসলামে ভূমির স্বত্ব ও মালিকানা
- ❖ পাঠ-২ : ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ চাষাবাদ
- ❖ পাঠ-৩ : হযরত উমরের ভূমি সংস্কারনীতি
- ❖ পাঠ-৪ : ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা।

পাঠ ঃ ১

ইসলামে ভূমির স্বত্ব ও মালিকানা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি

- ভূমির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।
- উপমহাদেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- ভূমির মালিকানা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় ভূমিস্বত্বের স্বরূপ উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভূমির ভোগ ও ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনার আলোকপাত করতে পারবেন।

ভূমিস্বত্বের সংজ্ঞা

উৎপাদনের অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে ভূমি। ভূমিই হচ্ছে উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। এটি মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর দান। যেসব রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান দ্বারা ভূমি ব্যবহার, ভূমিতে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মালিকানা, অধিকার ও ভোগ-দখল সংক্রান্ত যাবতীয় স্বত্বাদি নির্ধারিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ভূমিস্বত্ব বলে। তাই একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিস্বত্ব কি হবে সে বিষয়ে ইসলাম নীরব থাকেনি। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের আমল ভূমি স্বত্ব সম্পর্কে কতগুলো ইতিবাচক নীতিমালা প্রদান করেছে। ফলে ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমির অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ভূমিস্বত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ তথা আধুনিক ও ইসলামি অর্থনীতিবিগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল-

আধুনিক অর্থনীতিতে ভূমির সংজ্ঞা

সাধারণত ভূমি বলতে পৃথিবীর স্থলভাগের অংশ বিশেষ তথা মাটিকে বুঝায়। আধুনিক তথা পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদরা সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলেন।

আলফ্রেড মার্শালের মতে ঃ প্রকৃতি যে সম্পদ জল, স্থল, বায়ু ও তাপের মাধ্যমে মানুষকে উপহার দেয় তাই ভূমিস্বত্ব।

মার্শাল হ্যারীর মতে ঃ যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়ের জন্য কৃষি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভোগ-দখলের অধিকার নিরূপিত হয়, তাকে ভূমিস্বত্ব বলা হয়।

ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের সংজ্ঞা

পাশ্চাত্য তথা আধুনিক অর্থনীতি হতে ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের সংজ্ঞা একটু ভিন্নতর। ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইসলামি অর্থনীতিবিদ ডঃ সাদেক বলেন ঃ "ইসলামে ভূমি শব্দটি একটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়। যেসব বস্তুগত সম্পদকে উৎপাদন কার্যে ইজারা বা ভাড়া খাটানো হয় এবং যা উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের সময় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না, তাকেই ভূমিস্বত্ব বলে।"

ইসলামি অর্থনীতিবিদ ডঃ আব্দুল মান্নান ভূমিস্বত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন, "ভূমিস্বত্ব বা ভূমির মালিকানা মহান আল্লাহর। এর ব্যবহারিক মালিক হল জনসাধারণ ও রাষ্ট্র।"

সূতরাং ভূমির ওপর স্বত্বাধিকার এবং ভূমির ওপর সরকারি রাজস্ব আদায়ের বিধানকে ভূমিস্বত্ত্ব বলা হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমির কোন রূপান্তর না ঘটলেও অপচয় হতে পারে। ভূমি উৎপাদিত ও অনুৎপাদিত উভয়ই হতে পারে। ইসলামি অর্থনীতিতে যে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন ভাড়া বা ইজারা, খাজনা নেই তা ভূমি নয়।

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব

পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই আহার গ্রহণ করতে হবে। এ আহার উৎপন্নের উৎস হল ভূমি। যেহেতু খাদ্যোৎপাদন ও নানাবিধ শিল্প-পণ্যের কাঁচামাল ভূমি বা যমীন হতে উৎপন্ন হয়। সেহেতু অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমিস্বত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এতেই তোমাদের জন্য যাবতীয় জীবিকার ব্যবস্থাও রেখেছি। তোমরা অতি অল্পই শোকর কর।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

"তিনিই তো ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।" (সূরা আল-মুলক : ১৫)

এ মর্মে বহু আয়াত আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মানবজীবনে ভূমির গুরুত্ব দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়। সূতরাং বৈধভাবে বিভিন্ন উপায়ে কৃষি কাজ করে এবং ভূমিকে নানাভাবে ব্যবহার করে খাদ্যোৎপাদন করতে হবে এটাই ইসলামের মূলনীতি।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ভূমিস্বত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো ঃ

কৃষির উন্নতি ঃ ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকের উন্নতি নির্ভর করে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নতি অপরিহার্য। কিন্তু কৃষকের উন্নতি ছাড়া কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয় না।

ভূমিহীনতা রোধ ঃ জমির মালিকানা রাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে অবরুদ্ধ হলে বিশাল আকারে ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব হবে। তখন ভূমিহীন চাষীরা ভূমির উন্নতিতে উৎসাহ্ পাবে না। একটি সুষ্ঠু ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই ভূমিহীনতা রোধ করতে পারে।

সামাজিক প্রতিপত্তি ঃ যাদের দখলে ভূমিস্বত্ব আছে তারা সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোক। অপরপক্ষে যাদের কোন ভূমি নেই বা যারা প্রান্তিক চাষী তাদের সমাজে কোন প্রতিপত্তি নেই। উভয় অবস্থাই অবাঞ্ছিত। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই তা নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে।

রাজনৈতিক গুরুত্ব ঃ রাজনৈতিক জীবনে ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব কম নয়। একটি সুষ্ঠু ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় জোতদার, ধনী কৃষক, ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ে সাধারণ কৃষকদের প্রাধান্য থাকে।

জমি খন্ডকরণ ও অসংলগ্নতা ঃ জমির খন্ডকরণ ও অসংলগ্নতার সাথে ভূমিস্বত্বের সংস্পর্ক আছে। সুষ্ঠু ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই এই অসুবিধা দূর করতে পারে।

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রকারভেদ

ভারবতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ভূমির মালিকানা প্রকৃতি, ভূমির মালিকের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিতে প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. জমিদারী ব্যবস্থা ২. মহলওয়ারী ব্যবস্থা ৩. রায়তওয়ারী ব্যবস্থা। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল-

জমিদারী ব্যবস্থা

এ ব্যবস্থায় জমির মালিক হলেন জমিদারগণ। তারা সরকারকে ভূমির রাজস্ব প্রদান করতেন। কিন্তু তারা সব জমি চাষ করতেন না। জমি চাষ করত কৃষকরা অথচ তারা জমির প্রকৃত মালিক ছিল না। জমিদারী ব্যবস্থা দুশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। স্থায়ী ও অস্থায়ী। অস্থায়ী জমিদারী প্রথা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে যেমন- পাঁচ অথবা দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হত। কিন্তু স্থায়ী জমিদারী প্রথায় জমিদাররা চিরদিনের জন্য জমির মালিক হতেন এবং

সরকারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদান করতেন। বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় স্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা ১৭৯৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। এ ব্যবস্থাই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে পরিচিত।

মহলওয়ারী ব্যবস্থা

মহলওয়ারী ব্যবস্থায় মহল্লা বা গ্রামবাসী যৌথভাবে জমির মালিক হতেন, তারা যৌথভাবে সরকারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান করতেন। গ্রাম্য মাতব্বর গ্রামের চাষীগণের কাছ থেকে ভূমি রাজস্বের অর্থ সংগ্রহ করে সরকারি ট্রেজারিতে তা জমা দিতেন। এ ব্যবস্থায় সাধারণ জমি ৪০ বছরের জন্য পত্তনী দেয়া হতো। পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে এ প্রথা চালু ছিল।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

এ ব্যবস্থায় জমির মালিক হল চাষী। চাষী সরকারকে ভূমি রাজস্ব প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় সরকার ও চাষীর মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী নেই। এরকম ব্যবস্থায় যৌথ মালিকানাও নেই। কৃষক জমি বিক্রয়, দান, ক্রয়, উইল, ওয়াক্ফ করা প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উপরোক্ত তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার মধ্যে রায়তী প্রথা সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে হয়। বর্তমানেও আমাদের দেশে এ প্রথা চালু আছে।

ভূমির মালিকানা

মানুষের মালিকানা সীমিত। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের একক সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। এ বিশ্ব সংসারের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই হাতে। এ বিশাল সৃষ্টির কোন উপাদানে বা এর সামান্য কিছুতেও মানুষের কোন হাত নেই। এমনকি একটি ধূলিকণা, এক ফোঁটা পানি কিংবা একখন্ড শুকনো পাতা পর্যন্ত সৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের নেই। বরং সব মৌলিক সৃষ্টিই মহান আল্লাহর এবং মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও শক্তির বলে সে সব মৌলিক উপাদান বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে মাত্র। আর তার জ্ঞান বা শক্তি ও তাঁর নিজস্ব নয়, তাও মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সূতরাং জগতে মানুষের মালিকানা বলতে কিছুই নেই। মালিকানার সবটুকু একমাত্র আল্লাহর। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

"মূসা বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অত:পর পথ নির্দেশ করেছেন।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ৫০)

তিনি আরো বলেন ঃ لله ما في السماوات والأرض ۔ "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সব আল্লাহরই।" (সূরা আল-বাকারা : ১১৬)

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا "পৃথিবীতে যা কিছু আছে এর সবই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৯)

পৃথিবীর মালিক নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি কর্তা ও পালন কর্তা। তিনি মানুষকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। তাই মানুষ তাঁর বিধান অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উপাদান, উৎপাদন শক্তি ও যাবতীয় সম্পদ ভোগ-দখল করতে পারবে। এটাই ইসলামের মূলনীতি। এ নীতি অনুসারে মহান আল্লাহর মালিকানার অধীনে মানুষের সীমিত মালিকানা স্বীকৃত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان

"ভূমিকে আল্লাহ সমগ্র প্রাণীর জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে ফলমূল, ছড়াবিশিষ্ট খেজুর, গবাদি পশু, ভোজ্য শস্যাদি এবং সুবাসিত পুষ্পরাজি উৎপন্ন হয়।" (সূরা আর-রাহমান ঃ ১০-১২)

বস্তুত মহান আল্লাহর দেয়া এ উত্তরাধিকার বলেই মানুষ সম্পত্তি হস্তান্তর, দান, ক্রয়-বিক্রয় ও উত্তরাধিকারের ক্ষমতা লাভ করেছে। যদিও নিরঙ্কুশ মালিকানা সে কিছুতেই লাভ করতে পারে না। আর ইসলামি নীতি অনুসারেই ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ কিংবা সমুদয় সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

ভূমির উপর সমষ্টির মালিকানা

ভূমির উপর সমাজ ও সমষ্টির মালিকানা ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ ও সমষ্টির এ মালিকানা সীমাহীন ও সর্বগ্রাসী নয়, ব্যক্তিস্বার্থ বিরোধীও নয়। দেশের সমস্ত ভূমিই যদি ব্যক্তি মালিকানা ও ভোগাধিকারে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সামাজিক প্রয়োজন পূরণকরা নানাভাবে ব্যাহত হতে পারে। এজন্য ইসলামি অর্থনীতি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেও ভূমি রাখার অনুমতি দিয়েছে, যেন প্রয়োজনের সময় দেশের ভূমিহীন লোকদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়া সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রের স্থায়ী মালিকানাধীন ভূমি

ইসলামি অর্থনীতি ভূমির রাষ্ট্রীয় মালিকানাও স্বীকার করে। সর্বজনীন রাষ্ট্রীয় কাজ তথা- অসংখ্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রয়োজনীয় কাজ, চাহিদা পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ভূমি থাকা আবশ্যক। সরকারী অফিসারদের অফিস আবাসন ব্যবস্থার স্থান, চারণ ভূমি, পার্ক, রাজপথ, পানিপথ, রেলপথ, স্টেডিয়াম এবং জলাশয় প্রভৃতির ভূমি ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এসব ভূমির ওপর কোন নাগরিকেরই ব্যক্তিগত নিরংকুশ মালিকানা স্বীকৃত হতে পারে না।

ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের স্বরূপ

ভূমির ওপর স্বত্বাধিকার এবং সরকারি ভূমির রাজস্ব আদায়ের বিধানকে ভূমিস্বত্ব বলা হয়। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ইসলামি অর্থনীতিতে শুধু এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত; তা হল ইসলামি ভূমিস্বত্ব। ভূমিস্বত্বের স্বরূপ সম্পর্কে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম তাঁর লিখিত "ইসলামের অর্থনীতি" গ্রন্থে চমৎকার ধারণা দিয়েছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল:

ইসলামেএকটি মাত্র ভূমিস্বত্ব স্বীকৃত

কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের ইতিহাসে একটি মাত্র ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত। জমিদারী, জায়গীরদারী, তালুকদারী, হাওলাদারী প্রভৃতি কর আদায়কারী মধ্যস্বত্বের স্থান ইসলামি অর্থনীতিতে স্বীকৃত নয়। এসব স্বত্ব মূলত পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি।

নিছক খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব ভোগী ইসলাম বিরোধী

খাজনা আদায়কারী মধ্যস্থত্বভোগীরা সরকারকে খুব-ই নিম্নহারে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে একটি বিশাল ভূমির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং জমির মালিক চাষীদের কাছ থেকে নিজেদের মনগড়া হারে কর আদায় করে। জমির মালিক জমি হতে কোন ফসল না পেলেও বা প্রাকৃতিক দূর্যোগে ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলেও জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী এবং সরকার বার্ষিক খাজনা ক্ষমা করেন না। তাই ইসলামি অর্থনীতি এরূপ জমিদারী বা নিছক খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ঘোর বিরোধিতা করে।

ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি মালিকানা

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ ভূমি মালিকানায় বিশ্বাসী। ইসলাম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, কোন ব্যক্তি কিছু পরিমাণ জমির মালিক হতে পারে তবে তার পরিমাণ বা সংখ্যা ইসলাম নির্ধারণ করেনি। বরং ভূমি মালিকের উপর ইসলাম এতো কঠোরভাবে নীতি নির্ধারণ করেছে যে, তাতে কারো পক্ষেই এলাকার সমস্ত বা অধিকাংশ ভূমি গ্রাস করে নেয়া সম্ভব নয়। কাজেই ভূমির প্রান্তিক পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বাতুলতা মাত্র।

ভূমির ভোগ ও ব্যবহার

ইসলাম ভূমির মালিককে দুটি উপায়ে ভূমি ভোগ ও ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়।

এক. ভূমি মালিক নিজে চাষাবাদ করবে।

দুই. কোন কারণবশত নিজে চাষ করতে না পারলে অন্যের দ্বারা তা চাষ করাবে। অথবা চাষাবাদের কার্যে অন্যের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করবে। অন্যের দ্বারা চাষ-বাসের উপায়ও ইসলাম বাতলিয়ে দিয়েছে। যেমন-

- কোন খেটে খাওয়া লোক দ্বারা নিজ তত্ত্বাবধানে জমির চাষ করাবে।
- উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে দিয়ে ভূমি চাষ করাবে।

- প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে কাউকে বছর মেয়াদী ভোগাধিকারের জন্য দিবে।
- নিজের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন না হলে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি থাকলে সেটি কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ বা ভোগদখল করতে দিবে।
- ওপরের আলোচনা হতে বুঝা যায়, ইসলামে ভূমিকে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব ও ভোগাধিকার লাভের নীতি:

অন্যান্য নীতির ন্যায় ইসলাম ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি বা জমি-জমায় মালিকানাস্বত্ব ও ভোগ-দখলের নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামের ভূমিনীতিকে জমির মালিকানা লাভ ও ভোগ দখলের দৃষ্টিতে জমিকে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রথমতঃ আবাদী মালিকানাধীন জমি

এ ধরনের ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্ব বিদ্যমান। এতে মালিক ইচ্ছা মতো চাষাবাদ, উৎপাদন, বৃক্ষ রোপন, বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কাজ কিংবা অন্য যে কোনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এ জমি মালিকের অধিকারভুক্ত থাকবে। এতে মালিকের বৈধ অনুমতি ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ, ব্যবহার বা কোনরূপ অধিকার থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ অনাবাদী মালিকানাধীন জমি

এ ধরনের জমি কারো মালিকানাধীন থাকা স্বত্ত্বেও পতিত অবস্থায় থাকে। এতে বসবাস করা, কৃষি কাজ করা, কিংবা বন-জংগল থাকলেও তা পরিষ্কার করা হয় না, এরূপ পতিত অনাবাদী জমিতে ব্যক্তির মালিকানা থাকবে এবং আবাদী জমির মতই এর বিক্রয়, হস্তান্তর, দান ইত্যাদি করতে পারবে ও এতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বলবৎ থাকবে।

তৃতীয়তঃ জনকল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট জমি

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা কোন গ্রামবাসী কর্তৃক প্রদত্ত পশুপালন, পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, ঈদগাহ্ বা কবরস্থানের জন্য বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট জমি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ জমিতে কারো ব্যক্তি মালিকানা থাকে না। কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষ নিজ স্বার্থে এ জমি ব্যবহার করার অনুমতি পায় না। অথবা এর হস্তান্তর ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না।

চতুর্থতঃ অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি

অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমির মধ্যে এক শ্রেণীর জমি আছে, যেগুলোতে কারো ভোগ-দখলে নেই ও কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ শ্রেণীর জমিকে ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় أرض الموت বা মৃত জমি বলা হয়। ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ এই জমির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন ঃ

هى ارض خارجة البلد لم تكن ملكا لاحد ولا حقا له خالصا.

অর্থাৎ "ইহা জনপদের বাইরে এমন জমি, যার কোন মালিক নেই, এর উপর কারো একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হবে না।"

এজাতীয় জমিতে দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মানুষের অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশে এ রকম যত অনাবাদি পতিত জমি থাকবে সরকারিভাবে সেগুলো কৃষি উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এবং সরকার এগুলো ভূমিহীন লোকদের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করে দেবেন যাতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়। এরূপ প্রাপ্ত জমিতে যে কৃষিকাজ করবে বা জমি আবাদ করবে, সে-ই উক্ত জমির মালিক হবে। এরূপ জমির মালিকানা সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন-

من عمر ارضا ليست لاحد فهى حق له.

"যে ব্যক্তি মালিকহীন ভূমি আবাদ করল সে-ই তার মালিকানায় অগ্রাধিকার পাবে।"

এ সম্পর্কে এক সাহাবী এ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,

اشهد ان رسول الله قضى ان الارض لله و العبد عباد الله فمن احى مواتها

فهو أحق بها.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ মর্মে মীমাংসা করেছেন যে, জমি আল্লাহর, আর মানুষ তাঁর বান্দা। অতঃপর যে একে কৃষি উপযোগী করে তুলবে, সেই-এর মালিক হবে।"

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

و بالامام ان يقطع كل موات و كل ما كان ليس لاحد فيه ملك و ليس احد يعمر فى ذلك بالذى يرى انه خير للمسلمين و اعم نفعا.

"যেসব জমি অনাবাদি, পতিত, মালিকহীন এবং যাতে কেউ চাষাবাদ ও কৃষিকাজ করে না, তা রাষ্ট্র প্রধান লোকদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দেবেন যাতে মুসলমানদের কল্যাণ হয়।"

বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী মানব সমাজের বৃহত্তম কল্যাণের স্বার্থে সকলকেই ভূমির অংশ দিতে হবে। জনগণের যাতে কোনরূপ অমঙ্গল বা ক্ষতিসাধন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি বণ্টন করতে হবে। ইসলামি অর্থনীতি জমিদারী, জোতদারী প্রথাকে মোটেই সমর্থন দেয় না বরং প্রকৃত চাষীদের মধ্যে ভূমির সুষম বণ্টনই হচ্ছে ইসলামের মূল বিধান।

রাষ্ট্রীয় ভূমিস্বত্ব

ভূমিস্বত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হতে লাভ করতে পারে না। আবার সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্র ও হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলো রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনীয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভূমিস্বত্ব বলতে সরকারি ভূমি বা খাস জমিকে বুঝায়। রাষ্ট্রীয় ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে ইসলাম যে সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বনাঞ্চল

যে ভূমিতে প্রকৃতিগতভাবেই বন ও বৃক্ষরাজি জন্মে, এগুলো জনস্বার্থে রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। সামাজিক সম্পদ হিসেবে এগুলো রাষ্ট্র সংরক্ষণ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। তবে রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে বনাঞ্চলের সম্পদ আহরণের জন্য জনস্বার্থে ও নির্দিষ্ট শর্তে তা কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা দেবে।

চারণ ভূমি

সামাজিক স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার বৈশিষ্ট্য যে ভূমিতে বিদ্যমান অর্থাৎ যে ভূমিতে অনায়াসে পশু চরতে পারে তা ব্যক্তি মালিকানায় প্রদান করা যায় না। এগুলো জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে। চারণ ভূমিতে সকল নাগরিকের গৃহপালিত পশু বিচরণ ও আহার গ্রহণ করতে পারবে। এটি কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য খাস নয়। এটি সর্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।

পাহাড়ী ভূমি

এ জাতীয় পরিত্যাক্ত ভূমিতে ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা উহ্য থাকে কেননা এটি মৃত জমির মত নয়। এ জাতীয় ভূমির কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে না বলেই ব্যক্তিগতভাবে কেউ তা লাভ করার চেষ্টা করে না। তবে যদি কেউ এ জাতীয় জমির মালিক হতে চায় তাহলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বত্ব লাভ করতে পারবে।

খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ ভূমি

দৃশ্যমান ভূমির উপরিভাগে যদি নির্ভেজাল খনিজ সম্পদ মওজুদ থাকে তাহলে তা সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। সকল জনগণের তা থেকে উপকার লাভ করার অধিকার থাকবে। সামাজিক সম্পদ হিসেবে রাষ্ট্র এ জাতীয় ভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

যুদ্ধলব্ধ ভূমি

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পেশাদার ও বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী না থাকায় এবং মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজমান থাকায় যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক বৃহদাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টিত হত। তাদেরকে ভূমিও প্রদান করা হত। হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করার নীতি পরিহার করেন। যার ফলে বিজিত দেশের ভূমিতে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফাই ঃ বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পত্তিকে ফাই বলে। এ সম্পদ ও ভূমি একান্তই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তা থেকে কিয়দাংশ জনসাধারণকে দিতে পারবেন।

যুদ্ধে নিহত অমুসলিমদের সম্পত্তি

দেশ ত্যাগী বা যুদ্ধে নিহত অমুসলিমদের সম্পত্তির যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে এ সম্পত্তির মালিক হবে ইসলামি রাষ্ট্র।

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ঃ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়। তবে সাধারণত রাষ্ট্র তা দখল করে না বরং তা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাগ ওয়াকফের শর্তানুসারে জনসাধরণের উপকার ভোগ করা বা ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. 'ভূমিস্বত্ব আল্লাহর এর ব্যবহারিক মালিক রাষ্ট্র ও জনসাধারণ'- এ সংজ্ঞাটি কার ?

(১) আলফ্রেড মার্শালের (২) মার্শাল হ্যারীর

(৩) ড. সাদিক এর (৪) ড. আবদুল মান্নান-এর।

২. আলোচ্য পাঠে ভূমিস্বত্বের ক'টি দিক তুলে ধরা হয়েছে?

ক. সাতটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. তিনটি।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে ভূমিস্বত্ব ক'ভাগে বিভক্ত ?

ক. তিন ভাগে খ. পাঁচ ভাগে

গ. চার ভাগে ঘ. দুই ভাগে।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমি ভোগ ও ব্যবহারের ক'টি দিক আছে ?

ক. চারটি খ. দুইটি

গ. তিনটি ঘ. পাঁচটি।

৫. অনাবাদি ও পরিত্যক্ত ভূমি কোনটি ?

ক . রাষ্ট্রায়ত্ব ভূমি খ. নদ-নদী ও খাল-বিল

গ. ওয়াকফকৃত জমি ঘ. যে জমির কোন মালিক নেই এবং পরিত্যক্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত চারটি সংজ্ঞা লিখুন।

২. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার গুরুত্ব লিখুন।

৩. ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রকারভেদ তুলে ধরুন।

৪. ভূমির মালিকানা ক'ভাগে নির্দিষ্ট হয় ? আলোচনা করুন।

৫. ইসলামি বিধানে ভূমিস্বত্বের স্বরূপ আলোচনা করুন।

৬. রাষ্ট্রীয় ভূমিস্বত্ব বলতে কি বুঝায় ? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্বের স্বরূপ ও মালিকানা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ চাষাবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ◆ পাঠ-২: বর্গা প্রথা উচেছদের সমস্যাগুলো বলতে পারবেন।
- ◆ পাঠ-২: ইসলাম বর্গাচাষ সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ◆ পাঠ-৩: বর্গাচাষ বা অপরের জমি চাষাবাদ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতবাদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- ◆ পাঠ-৪: বর্গাচাষ সম্পর্কে ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।

বর্গাচাষ বা যৌথ চাষাবাদ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে একাংশ মনে করেন, দেশের উন্নতির স্বার্থে বাংলাদেশ হতে বর্গাদারী প্রথা তুলে দেয়া উচিত। কেননা বর্গাদারী প্রথায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধা অনেক বেশি। আবার একাংশ মনে করেন, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বর্গাদারী ব্যবস্থা হঠাৎ বাতিল করা উচিত হবে না। কারণ-

বড় বড় জমির মালিকরা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করলে বহুলোক বেকার হয়ে পড়বে। এতে সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দেবে।

- দেশে পতিত জমির পরিমাণ বেড়ে যাবে।
- দেশে ফসল উৎপাদনের হার কমে যাবে।
- গরীব শোষণের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে।
- ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীগণ বেকার হয়ে পড়বে নতুবা ক্ষেতমজুরে পরিণত হবে।

দেশে শিল্পোন্নয়ন যত বেশি হবে ততই কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বেকারত্ব কমে যাবে, তাতে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান হবে। তখন লোকজন বর্গাচাষ করতে আর এগিয়ে আসবে না। তখন বর্গাদারী প্রথা এমনিতেই উঠে যাবে। দেশ থেকে যতদিন বর্গাদারী প্রথা উঠে না যায় ততদিন বর্গাদারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনে বর্গাচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. ২৬-৩-১৯৮৪ তারিখে যারা কোন জমিতে বর্গাচাষী হিসেবে জমি চাষ করেছেন তারা বর্গাদার হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি পাবেন।
২. জমির মালিক জমি বিক্রি করতে চেষ্টা করলে বর্গাদারকে জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৩. জমির মালিক শ্রম ব্যতীত বাকি খরচ বহন করলে তিনি ফসলের ৬৬.৬৭% ভাগ পাবে, বর্গাদার পাবে ৩৩.৩৩% ভাগ।
৪. বর্গাদার জমি ক্রয় করতে অপরাগতা প্রকাশ করলেও জমিতে তার বর্গাধিকার মোট পাঁচ বছর বহাল থাকবে। যিনি জমি ক্রয় করবেন তাকেও বাকি পাঁচ বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
৫. জমির মালিক কোন খরচ বহন না করলেও তিনি পাবেন ৩৩.৩৩% ভাগ এবং বর্গাদার পাবে ৬৬.৬৭% ভাগ।
৬. জমির মালিক ও বর্গাদার শ্রম ছাড়া বাকি সব খরচ বহন করলে জমির মালিক পাবে ফসলের ৫০% এবং বর্গাদার পাবে ৫০% ভাগ।

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচাষ

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচাষ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ দু'দলে বিভক্ত হয়েছেন। এক মতে বর্গাদারী প্রথা হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মতের প্রবক্তা।

বর্গাচাষ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র) বর্গাচাষ সম্পর্কে বলেন-

المزارعة بالثلث والربع باطلة.

অর্থাৎ "এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে বর্গা দেয়া বাতিল কাজ"। তিনি বলেন- অর্ধেক বা এক-পঞ্চমাংশ বা যে কোন পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে বর্গাদারী প্রথা জায়েয হবে না। তবে যেহেতু হাদীস শরীফে ثلث ও ربع শব্দদ্বয় উল্লেখ আছে তাই তিনি তাঁর ফতোয়ায় এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের কথা উল্লেখ করেছেন। তা না হলে তিনি সব রকমের বর্গাদারী প্রথা হারাম একথাই বলতেন।

হাদীস শরীফে এসেছে- نهى عن المخابرة অর্থাৎ মহানবী (সা) মুখাবারাহ্ নিষেধ করেছেন। মহানবী (সা)-কে مخابره সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- المزارعة بالثلث والربع অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমির বর্গাদান। মহানবী (সা)-এর এ বাণী ব্যাখ্যা হিসেবে তিনভাগে এক অংশ, চার ভাগের এক অংশ, দুই ভাগের এক অংশ, পাঁচ ভাগের এক অংশ ও ছয় ভাগের এক অংশ ইত্যাদি যে কোন ভগ্নাংশকে ধরা হয়েছে এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বর্গাদারী প্রথা স্বীকার করেন না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতামত ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন- বর্গাদারী প্রথা জায়িয। তবে বর্গাদারীর চারটি অবস্থা রয়েছে। যেমনঃ

প্রথমত, اذا كانت الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازالمزارعة

অর্থাৎ "যখন জমি ও বীজ এক ব্যক্তির হয় আর শ্রম ও গরু অপর ব্যক্তির হয়, তখন বর্গাদারী জায়েয হবে।"

দ্বিতীয়ত, اذا كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر للاخر جازالمزارعة

অর্থাৎ- "যখন জমি এক ব্যক্তির এবং গরু বীজ এবং শ্রম অপর ব্যক্তির তখন বর্গাদারী প্রথা জায়িয হবে।"

তৃতীয়ত, و إذا كانت الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لواحد جاز المزارعة

অর্থাৎ- "যখন জমি ও গরু একজনের এবং শ্রম ও বীজ অন্যজনের, তখন বর্গাদারী প্রথা জায়িয হবে।"

চতুর্থত, و ان كانت الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لواحد فهى باطلة

অর্থাৎ- "যদি জমি একজনের এবং গরূ, বীজ ও শ্রম এন্যজনের হয় তখন বর্গাদারী প্রথা বাতিল হবে।" তারা বলেন- "সময় নির্দিষ্ট না হলে এবং উৎপন্ন ফসল দুজনের মধ্যে ভাগ না হলে বর্গাদারী প্রথা জায়িয হবে না।"

বর্গাদারী ব্যবস্থাকে যারা জায়িয বলেন, তাদের মতে বর্গাদারী এক ধরনের ইজারা বা ভাড়া। প্রথম অবস্থায় জমি ও বীজের মালিক বর্গাদারকে কৃষিকাজের জন্য ইজারা দিয়েছে এবং উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মজুরি হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং সে নিজের গরু নিয়ে মজুরি করেছে। দ্বিতীয় অবস্থায় বীজওয়ালা চাষের জন্য জমি ইজারা নিয়েছে এবং উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ মজুরি হিসেবে নির্ধারণ করেছে, আর তৃতীয় অবস্থায় বীজওয়ালা বর্গাদারকে কৃষিকাজের জন্য মজুরি হিসেবে নিয়েছে এবং উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ মজুরির জন্য নির্ধারণ করেছে। এজন্য এসব অবস্থায় বর্গাদারী প্রথা জায়িয। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় বর্গাদার জমি ও গরু উভয়ই ইজারা নিয়েছে এবং উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ মজুরি হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং একটি গরু মজুরি হিসেবে যাচ্ছে যা জায়িয নয়।

বর্গাদারী প্রথা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ শামছুল আলম বলেন, "জমির মালিক সেই, যে জমি চাষ করতে পারে।" তার মতে, লাঙ্গল যার জমি তার। তিনি আরো বলেন- অনুপস্থিত মালিকানা বৈধ নয়। কোন কোন ফকীহ্ বর্গাদারী প্রথা জায়িয মনে করলেও তিনি ইমাম আযমের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে অচাষী মালিকানাকে অবৈধ মনে করেন। তার মতে, বর্গাদারী প্রথা এক ধরনের শোষণ। প্রখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুর রহীমের মতে, "বর্গাদারী কোন শোষণ নয়।" তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ খায়বরের বিজিত জমি ইয়াহূদীদের কাছে বর্গা দেয়া এবং ফাদাকের জমিও বর্গা বন্দোবস্ত দেয়াকে নজির হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাছাড়া মদীনায় আনসারদের জমিও বন্দোবস্ত দেয়াকে নজির হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, সম্প্রতি ধোয়া উঠেছে যে, "লাঙ্গল যার জমি তার, যে নিজে জমি চাষ করবে না জমির ফসলের উপর তার কোন অধিকার নেই এবং এসব শ্লোগানের মাধ্যমে যে নতুন ভূমিনীতি প্রচার করা হচ্ছে তা আর যাই হোক ইসলামি ভূমিনীতি নয় ; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" এসব মন্তব্যে দেখা যায়, তিনি তাঁর বিরুদ্ধ মতকে ইসলাম সম্মত বলতে নারাজ। এ ধরনের বক্তব্য মেনে নেয়া মুশকিল। কারণ বর্গাদারী প্রথা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বৈধ নয়। তবে কি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামতকে ইসলাম বিরোধী বলতে হবে ? ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর দুই ছাত্র

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী ফতওয়া দিলেও কেউ কাউকে ইসলাম বিরোধী বলেননি।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বর্গাদারী মতামত সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন- "ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এ সম্পর্কে নিষেধ ও নেতিবাচক যে উক্তি বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে তা তার সাধারণনীতি নয়। তিনি কেবল ইরাকের শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমির ক্ষেত্রেই পারস্পরিক কৃষিনীতি সমর্থন করেননি। তার কারণ এই নয় যে, তিনি নীতিগতভাবে এটাকে সংগত বলে মনে করতেন না। বরং এর প্রকৃত কারণ হলো উল্লিখিত ভূমিগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল না। সেখানকার জিম্মিদের মালিকানায় জমি ছিল। তা অনিশ্চিত ছিল এবং সে সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ ছিল কাজেই তা কোন ব্যক্তির পক্ষে খরিদ করা এবং অপরের দ্বারা চাষ করানোকে তিনি সমর্থন করেন নি। অন্যথায় অপরের জমি চাষ করানোকে তিনি কখনো নিষিদ্ধ বলে মনে করতেন না।"

উপরে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফারর মতামত নিম্নলিখিত কারণে সমর্থন করা যায় না। যেমন-

- ইমাম আযম (র)-এর মতামত শুধু ইরাকের বেলায় প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়। এই মতের সমর্থনে কোন দলীল বা প্রমাণ উপস্থিত করা হয়নি।
- ইমাম আযমের মতামত পূর্বেই কুদুরী গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর এ মতামত ছিল হাদীস ভিত্তিক। নবী করীম (সা)-এর সংশ্লিষ্ট হাদীসটি শুধু ইরাকের বেলায় প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়। কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়।
- ইরাকী জমির মালিক ছিল জিম্মিগণ। এজন্য বর্গাচাষ যদি হারাম হয় তবে খায়বার বা ফাদাকে জমির মালিকও ছিল জিম্মিগণ অর্থা ইয়াহূদীগণ, তাহলে খায়বার ও ফাদাকের জমিগুলোও বর্গার আওতায় আসা উচিত ছিল না।

সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করলে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বর্গাচাষের ব্যাপারে আরব ও আরবের বাইরের জমিতে পার্থক্য করা হয়েছিল। আরবের জমির মালিকানা ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলমান মুজাহিদগণকে দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু আরবের মুজাহিদগণের কোন মালিকানা স্বত্ব বৈধ করা হয়নি বরং জমির চাষীগণকেই মালিক করা হয়। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফার (রহ)-এর উক্ত বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. বর্গাচাষ প্রথার অসুবিধা হচেছ-

ক. জমির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় খ. চাষী নিঃস্ব হয়ে যায়

গ. আবাদী কমে যায় ঘ. দেশে ফসল উৎপাদনের হার কমে যায়।

২. বাংলাদেশে কত সালে ভূমি সংস্কার আইন পাস হয়?

ক. ১৮৮৪ সালে খ. ১৯৮৪ সালে

গ. ১৭৭৬ সালে ঘ. ১৯৪৯ সালে।

৩. বর্গাচাষ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ কয়ভাগে বিভক্ত হয়েছেন?

ক. তিন ভাগে খ. চার ভাগে

গ. দুই ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে।

৪. মুখাবারাহ কী?

ক. বর্গাচাষ খ. জমিদারী প্রথা

গ. এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশে জমি দেওয়া ঘ. ফসলের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া।

৫. লাঙ্গল যার জমি তার এটি কার মতামত?

ক. অর্থনীতিবিদ আব্দুল মান্নানের
খ. ইমাম আবু ইউসূফের
গ. অর্থনীতিবিদ শামসুল আলমের
ঘ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্গাচাষ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মতামত তুলে ধরুন।
২. বর্গাচাষ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতবাদ উল্লেখ করুন।
৩. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বর্গাচাষ নীতি কেমন হওয়া উচিত? লিখুন।
৪. বর্গাচাষ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ শামসুল হকের মত উল্লেখ করুন।
৫. ইমাম আবু হানীফার (র) মতামত সম্পর্কে সমালোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে যৌথ চাষাবাদ বা বর্গাচাষ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৩

হযরত উমরের ভূমি সংস্কারনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- পাঠ-১: ইসলামের ভূমি সংস্কার নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- পাঠ-২: হযরত উমরের (রা) ভূমি সংস্কার নীতির উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থসংরক্ষণ ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো পরিহার করে তাতে যে পরিবর্তন আনয়ন করা হয় তাকেই ভূমি সংস্কার বলে।

ডঃ ওয়ারনার এ সম্পর্কে বলেন ঃ "প্রকৃত ভূমি সংস্কার বলতে ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষি মজুরদের স্বার্থে সম্পত্তি জমিতে অধিকারের পুনর্বণ্টনকে বুঝায়।" ভূমির মালিকানার নির্ধারণের মাধ্যমে ভূমির পুনর্বণ্টন, প্রকৃত বর্গাদেরকে জমি দান, সরকার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, ভূমির খন্ডিতকরণ ও বিচ্ছিন্নতারোধ, খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন জমিগুলোর একত্রীকরণ, ভাগচাষীদের স্বার্থসংরক্ষণ, কৃষি মজুরদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যাবলী ভূমি সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা যায়।

ইসলামের ভূমি সংস্কার নীতি

ভূমি আল্লাহর দান, মানুষ ও জীব জন্তুর জীবন ধারণের জন্য উহা একটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিস্বত্ব কি হবে সে বিষয়ে নীরব থাকতে পারে না। এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের আমলে কতগুলো ইতিবাচক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল সমাজ বা দেশে বিশেষ করে সকল মুসলিম দেশে এক, একথা বলা যাবে না, তবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে যে কোন দেশ নিজেদের ভূমিস্বত্ব কি ধরনের হবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

জমির মালিকানা প্রশ্নে ইসলাম যে সুন্দর ব্যবস্থা নিরূপণ করেছে তা চাষীদের অনুকূলে। মানুষের মৌলিক চাহিদা যথা- খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-এর প্রত্যেকটির জন্য জমির প্রয়োজন হয়। অতএব জমিতে প্রতিটি মানুষের স্বার্থ রয়েছে। মানব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে প্রতিটি মানুষকেই জমির ব্যবহারিক মালিকানা দিতে হবে। এটাই ইসলামের নীতি। ভূমি বণ্টনের যে নীতি দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীকে ভূমি থেকে বঞ্চিত করে তা ইসলামি ভূমিনীতি হতে পারে না। ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলাদির অধিকাংশ স্বল্প সংখ্যক লোকদের হাতে কুক্ষিগত থাকবে তা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা কোন মানুষের থাকতে পারে না, জমির একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। এ কারণেই জমির মালিক জমিদার হতে পারে না। ইসলাম জমিদারী প্রথার ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম রায়তী প্রথা প্রদান করে। এ প্রথা চাষীদের অনুকূলে। যারা সঠিক চাষী, যাদের লাঙ্গল-জোয়াল আছে, চাষের পশু আছে, চাষাবাদের সরঞ্জাম আছে, তাদের মধ্যে জমির সুষম পন্থায় বণ্টন করাই হলো ইসলামি ভূমি রক্ষার নীতি। আল্লাহ যমীনকে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা এর ফল ভোগ করতে পারে। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ.

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা হিসেবে এবং আকাশকে ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর ফসল উৎপাদন করেন তোমাদের উপজীবিকা হিসেবে।"
(সূরা আল-বাকারা : ২২)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام
سواء للسائلين.

“তিনি পৃথিবীতে উঁচু পর্বতমালাকে স্থাপন করেছেন, তাতে বরকত দান করেছেন এবং চারদিনের মধ্যে সকলের রিযিক বণ্টন করেছেন এমনভাবে যেন যে চায় সে তা সমানভাবে পেতে পারে।” (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা : ১০)

পৃথিবীতে সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী রিযকের অধিকারের প্রশ্নে সকলেই সমান। কিন্তু প্রয়োজন সকলের এক নয় বা রিযক আহরণের যোগ্যতাও সকলের সমান নয়। তাই এদিকে ইংগিত করে মহান আল্লাহ বলেন-

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي
رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.

“আল্লাহ রিযিকে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা অধিনস্থদেরকে তাদের ভরণ-পোষণ উপযোগী এমন কিছু দেয় না যাতে তারা তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে ?“ (সূরা আন-নাহল : ৭১)

আল্লাহতাআলার উক্ত বাণীতে মানুষের আয়ের ক্ষমতার পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে, কেননা আল্লাহ সকল মানুষকে সমান ক্ষমতা দেননি। কিন্তু অন্য আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের অধীনস্থ তথা কম উপার্জনশীল লোকদেরকে তাদের আয় থেকে কিছু দিবে না তা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। দুর্বল, অক্ষম বা কম সক্ষম ব্যক্তিদেরকেও তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেতে দিতে হবে। যদি তারা তা না দেয়, তবে তা হবে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা অন্যের জীবিকার পথ বন্ধ করা কুরআনের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় অপরাধ।

হযরত উমর (রা)-এর ভূমি ব্যবস্থা বা সংস্কারনীতি

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাদানী জীবনে সর্বপ্রথম ভূমি সংস্কার নীতির সূচনা হয়। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা) ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে ব্যাপক নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা যে গড়ে তোলা যায় তা হযরত উমর (রা) বাস্তবে রূপ দিয়ে গেছেন। তিনি এমন একটি সফল ভূমি ব্যবস্থার রূপায়ন করে গেছেন যা সকল যুগের সকল সফল প্রশাসকের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তাঁর খেলাফতকালে আরব উপ-দ্বীপের বাইরে সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও মিশর বিজয় হয়, পরে এসব দেশে একটি যুগোপযোগী ভূমি সংস্কার নীতি প্রদান করা হয়। বিজয়ী আরব মুজাহিদগণ যাতে ইরাক ও সিরিয়ায় জমি কিনতে না পারে সে জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
প্রাচীন যুগের জমিদারী প্রথার ন্যায় কুপ্রথা যাতে বিজিত দেশগুলোতে গড়ে উঠতে না পারে, সে জন্য তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। পূর্বে রোমান শাসকরা কৃষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা নিজেরা ভোগ দখল করত। খলীফা উমর (রা) বিজিত দেশের জমিদারী রাষ্ট্রীয় দখলে এনে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যে দেশের যে জমি যে অমুসলিম চাষীর অধিকারে ছিল সেই চাষীর জমির মালিকানা বহাল রেখে তার কাছ থেকে খারাজ বা ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে অভিজ্ঞ কৃষকরা দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করে কৃষিকার্যে প্রভুত উন্নতি সাধন করে।

হযরত উমর (রা) বিজিত অঞ্চল থেকে খারাজ বা ভূমিকর আদায় করতেন, যা ভূমি রাজস্ব বা খাজনা নামে পরিচিত ছিল। এর সাথে তিনি উশর বা বাণিজ্য শুল্ক নামে একটি নতুন করও আদায় করতেন। খারাজ বা ভূমিকর ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অপরদিকে অমুসলমানদের নিকট থেকে জিযিয়া নামক এক প্রকার রাজস্ব আদায় করা হত। পূর্বে প্রচলিত এ সব করের হার খলীফা উমর (রা) সামান্য পরিবর্তন করেন। গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখতেন, বাকী অংশগুলো মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। পরিত্যক্ত বা উত্তরাধিকারবিহীন ভূমির মালিক ছিল রাষ্ট্র। এ ভূমি থেকেও রাষ্ট্র যথেষ্ট কর আদায় করতো। খলীফা উমর (রা) কর্তৃক এই ভূমি রাজস্ব সংস্কার ব্যবস্থায় এ নতুন কর ধার্যের ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। হযরত উমর (রা)-এর ভূমি সংস্কার নীতি আজ মুসলিম বিশ্বে এক আদর্শ নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। নিম্নে হযরত উমর (রা)-এর ভূমি ব্যবস্থা বা সংস্কারের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো ঃ

সিরিয়া বিজয় ঃ হযরত উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পাঁচ মাস পরেই সিরিয়া বিজয় হয়। প্রবল যুদ্ধের পর সিরিয়াবাসী সন্ধি চুক্তিতে বাধ্য হয়। হযরত উমর (রা) প্রথমে সৈন্যদের মাঝে বিজিত অঞ্চলের জমিগুলো বণ্টন করে দিতে চাইলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামের বিরোধিতার ফলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিজিত অঞ্চলের মূল ভোগ-দখলকারীদের হাতে ন্যস্ত করেন। তার শর্ত ছিল যে, তারা এর রাজস্ব আদায় করবে- যা জনগণের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। ফলে পরোক্ষভাবে সর্বসাধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাওয়াদ বিজয় ঃ ১৫ হিজরী সনে ইরাকের অন্তর্গত সাওয়াদ নামক স্থান মুসলমানদের অধিকারে আসে। হযরত উমর (রা) ইরাক বিজয়ী সাআদকে লিখলেন- "যেসব অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেছে তা জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দাও। কিন্তু জমি ও খাল ইত্যাদি দেবে না। কেননা, তা বর্তমান মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হলে অনাগত মানুষের জন্য কিছুই থাকবে না।"

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ

হযরত উমর (রা) তার সুদীর্ঘ খিলাফতের সময়ে ভূমি ব্যবস্থায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মত এক বিপ- বী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টির অধিকারী। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কৃষক সমাজের উন্নতি ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এজন্যই তিনি বিজিত দেশসমূহে বিশেষত আরববাসীদের জন্য জমি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর ভূমি ব্যবস্থার স্বরূপ বা ধরন নিম্নরূপ ঃ

ক. ইকতা বা ব্যক্তি মালিকানা পদ্ধতি ঃ ইকতা মানে কাউকে কাতিয়াহ বা এক টুকরা জমি বরাদ্দ দেয়া। অর্থাৎ এর দ্বারা কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জমি প্রদান করাকে বুঝায়। নবী করীম (সা)-এর সময়ে এ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু ইসলামে নব্য সামন্ত সৃষ্টির আশংকায় হযরত উমর (রা) এ প্রথার বিরোধী ছিলেন, তবে তিনি কিছু নতুন নিয়ম চালু করেন। ক্রমাগত তিন বছর জমি অনাবাদী রাখলে ঐ জমির উপর ভূমি মালিকের কোন বৈধ অধিকার থাকবে না। হযরত বিলাল (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও হযরত উমর (রা) এ নীতি গ্রহণ করেন। আর তা করা হয়েছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের জন্যই।

খ. হিমা পদ্ধতি ঃ এক বা একাধিক গোত্র যখন কোন জমির মালিক হতো এবং তাদের সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ঐ জমি ব্যবহার করতো, তখন সে পদ্ধতিকে বলা হতো হিমা-পদ্ধতি। হিমা-পদ্ধতিতে ভূমির মালিকগণ তাদের উৎপাদিত শস্যের উপর উশর প্রদান করতো। কোন হিমা উশর দিতে ব্যর্থ হলে তা বাজেয়াপ্ত হতো। মূলত হিমা পদ্ধতি সমবায় চাষ পদ্ধতির প্রাথমিক রূপ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা

হযরত উমর (রা)-এর ফিখলাফত কালে রাষ্ট্রীয় মালিকানা পদ্ধতি ব্যাপকতা লাভ করে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ছিল জমির মালিক ও চাষী ছিল টেন্যান্ট। এতে চাষীর অধিকারে জমি থাকত না এবং তারা জমি হস্তান্তরও করতে পারত না। এ রাষ্ট্রীয় মালিকানা দু'প্রকারে বিভক্ত ছিল। (ক) সাওয়াকী (খ) ফাই।

ক. সাওয়াকী ঃ প্রকৃতপক্ষে সাওয়াকী ছিল জনগণের সম্পত্তি। এগুলো জনগণের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। তা হস্তান্তরের অধিকার কারো ছিল না এবং টেন্যান্ট খারাজ বা কর হিসেবে কিছু অর্থের বিনিময়ে ভূমি আবাদ করতো।

খ. ফাই ঃ এ ধরনের জমি সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে থাকত। রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রয়োজনে তা কাজে লাগাত। আর রাসূল (সা) ও পরবর্তী খলীফাগণও তা করতেন। সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় জমির উপর সকল লোককেই খারাজ প্রদান করা হত।

চাষী মালিক

জমির মালিক নিজেই নিজের জমি চাষ করতো। আরবের সর্বত্র এবং সিরিয়াতে এ প্রথা চালু ছিল। উল্লেখ্য যে, ভূমির মালিকানা ভিত্তিতে চাষীগণ নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

ক. অচাষী মালিক ঃ এ শ্রেণীর লোকদের জমি ছিল, কিন্তু তারা নিজেরা জমি চাষ না করে অন্য লোকদের দ্বারা জমি চাষ করাতো। সিরিয়া ও মিশরে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

খ. ভূমিহীন চাষী ঃ বেসরকারি ভূমি মালিকদের জমির ভোগ-দখলদার চাষীরাই এ শ্রেণীভুক্ত। এ শ্রেণীর চাষাবাদ পদ্ধতি সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

গ. মালিক চাষী ঃ এ শ্রেণীর চাষীদের চাষভূক্ত জমির উপর নিজেদের মালিকানা স্বত্ব থাকত এবং বড় বড় ভূস্বামীর সাথে এদের পার্থক্য ছিল কেবল জ্যোতের আকৃতিতে। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে ভূমিকে পুনর্বিন্যাস করে তা চাষাবাদের আয়ত্তাধীন নিয়ে আসা হতো এবং সম্পূর্ণ শরীআতের নির্দেশমত তা পরিচালিত হতো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর সকল ভূমি ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও সর্ববাদীসম্মত। হযরত উমর (রা)-এর ভূমি ব্যবস্থা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আজকের দুনিয়া যদি হযরত উমরের এ নীতি গ্রহণ করতো তাহলে সমাজে সামন্তবাদ শ্রেণীর উদ্ভব হতো না এবং দরিদ্র কৃষককুল মুক্তি পেতো।

তাছাড়া কুরআন-হাদীস ভূমির যথাযথ ব্যবহারের উপর যে গুরুত্ব-আরোপ করেছে, এর ভিত্তিতে ভূমির চাষাবাদ হলে খাদ্যের অভাবে লাখ লাখ বনি আদম অনাহারে-অর্ধাহারে নিঃশেষ হতো না। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ হযরত উমর (রা)-এর ভূমি নীতিই বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন।

১. মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে পড়ে কোনটি?
ক. শিক্ষা খ. বিলাসিতা
গ. বিদেশ ভ্রমণ ঘ. যোগাযোগ ব্যবস্থা

২. জমিদারী প্রথা সম্পর্কে ইসলামের নীতি হচেছ-
ক. ইসলাম জমিদারী প্রথা সমর্থন করে খ. ইসলাম জমিদারী প্রথার বিরোধী
গ. হানাফী মাযহাবে জমিদারী প্রথা স্বীকৃত ঘ. উত্তর সব ক'টিই ভুল।

৩. আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা কে?
ক. বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহতাআলা খ. প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি
গ. গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষে সৃষ্টি ঘ. নিজে নিজেই সৃষ্টি।

৪. খারাজ শব্দের অর্থ হচেছ-
ক. অমুসলিমরে থেকে আদায়কৃত কর খ. ভূমি কর
গ. মুসলিমদের নিকট থেকে আদায়কৃত কর ঘ. জলাশয় থেকে আদায়কৃত কর।

৫. সিরিয়া বিজয় কোন খলীফার আমলে হয়?
ক. হযরত আবু বকরের (রা) আমলে খ. হযরত উমরের (রা) আমলে
গ. খলীফা মামুনের আমলে ঘ. হযরত আলী (রা)-এর আমলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের ভূমি নীতি আলোচনা করুন।
২. হযরত উমর (রা)-এর ভূমি সংস্কারনীতি লিখুন।
৩. হযরত উমর (রা) -এর জমিদারী প্রথা বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত উমর (রা)-এর ভূমি সংস্কারনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন।
- পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- পূর্ববঙ্গ জমিদারী ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর প্রধান দিকগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ইতিহাস

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এ দেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। এরপর ১৭৬৩ সালে ইংরেজগণ সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করে। এরপরেই তারা এদেশে অস্থায়ী জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে। ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। এ বন্দোবস্তের ফলে এদেশের কিছু অর্থশালী লোক যাদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু তারা কোম্পানির নিকট থেকে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেন। এ জমিদারগণই ইংরেজ আইনে ভূমির চিরস্থায়ী মালিক হলেন। জমিদারগণ নির্দিষ্ট তারিখে ইংরেজ সরকারের ট্রেজারীতে ভূমিরাজস্ব জমা দিতেন। তাদের ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট ও চিরস্থায়ী। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে ইংরেজ সরকার কোন অধিকার রাখেনি। এ ব্যবস্থায় জমিতে কৃষকের কোন প্রকার মালিকানা বা অধিকার বহাল থাকল না। তারা শুধু জমিদারের মর্জিমত জমি চাষ করতে পারত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থা আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এ বন্দোবস্ত তুলে দেয়ার জন্য বহুদিন থেকে দাবি উঠতে থাকে। এজন্য ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়, যা ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত। বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথা বিলোপের সুপারিশ করে। এর ফলে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। এ আইনবলে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

পূর্ববঙ্গ জমিদারী প্রথা ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। এর ফলে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হয়ে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটে। এ আইনের প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১. সরকার ও কৃষকের মাঝে কোন মধ্যস্বত্ব থাকবে না। সরকার সরাসরি কৃষকের খাজনা গ্রহণ করবেন।
২. পরিবার পিছু ১০০ বিঘা অথবা মাথাপিছু ১০ বিঘার অধিক জমির মালিক কেউ থাকতে পারবে না।
৩. দরিদ্র চাষীদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। যাদের তিন একর বা এর চেয়ে কম জমি আছে তারাই দরিদ্র চাষী হিসেবে গণ্য হবে।
৪. জমিদারগণকে তাদের স্বার্থহানির জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাদের আয়ের ৮ গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। ক্ষতি পূরণের টাকা নগদ অথবা ৪০ বছরে আদায়যোগ্য ৩% সুদে বন্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।
৫. জমির খাজনা উৎপন্ন ফসলের ১০% এর বেশি হবে না। ৩০ বছরের মধ্যে খাজনা দ্বিতীয়বার বাড়ানো যাবে না।
৬. জমির মালিক কৃষক হবে এবং মালিকানা বংশ পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে হস্তান্তর করাও যাবে।
৭. কোন পল্লী এলাকায় ৭৫% ভূমি মালিকের অনুরোধে সরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি বাধ্যতামূলক একত্রীকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৮. কোন জমি বিক্রির ক্ষেত্রে জমির পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের অগ্রাধিকার থাকবে।
৯. প্রকৃত চাষীগণই জমি ক্রয় করতে পারবে। প্রকৃত চাষী ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমতি নিয়ে জমি ক্রয় করতে পারবে।

পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ফলাফল

১. এ আইন জমিদারী প্রথাকে চিরতরে বিলোপ করে।
২. জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, পাইক-পেয়াদার অত্যাচার থেকে কৃষকগণ রেহাই পায়।
৩. প্রকৃত চাষীগণ জমির মালিক হয়। তাদের সাথে সরকারের যোগাযোগ ঘটে।
৪. পূর্বের চিরনির্দ্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব বিলুপ্ত হয়ে অনেকগুণ বেশি ভূমিরাজস্ব সরকারের হাতে আসে।
৫. জমিদারগণের জমিদারী না থাকায় তারা তাদের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়, ফলে দেশে শিল্পায়ন শুরু হয়ে যায়।

তবে জমিদারী প্রথা বিলোপ আইনের বহু দিকেই ত্রুটি ছিল বলে তা কৃষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা বয়ে আনতে পারেনি। এজন্য পরবর্তীকালে এ আইনের অনেক সংশোধনী আনা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার নতুনভাবে ভূমি সংস্কার করে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছেন। এসব আইনের মধ্যে ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার এবং ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইন উল্লেখযোগ্য।

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪

১৯৮২ সালে সংগঠিত ভূমিসংস্কার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারি করেন। এ সংস্কার আদেশের প্রধান দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. পরিবার পিছু জমির মালিকানা ১০০ বিঘায় আগের মত বলবৎ থাকবে।
২. যে পরিবারে ৬০ বিঘার বেশি কৃষিজমি আছে তারা আর কোন জমি ক্রয় করতে পারবে না। যাদের ৬০ বিঘার কম আছে তারা ক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিক হতে পারেন তবে নতুন ও পুরাতন জমির মোট পরিমাণ ৬০ বিঘার বেশি হতে পারবে না।
৩. জমিতে কর্মরত বর্গাচাষী আগামী পাঁচ বছরের জন্য বর্গাচাষী হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি পাবেন।
৪. বর্গাশর্ত পালন সাপেক্ষে এবং জমির মালিক নিজে জমি চাষে না আনলে বর্গাচাষী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বর্গাচাষী হিসেবে পরিগণিত হবেন।
৫. জমির উৎপাদিত ফসল তেভাগা নীতিতে বন্টিত হবে। মালিকানার জন্য ৩৩.$^{১}/_{৩}$% শ্রমের জন্য ৩৩.$^{১}/_{৩}$% এবং উৎপাদনের উপকরণের জন্য ৩৩.$^{১}/_{৩}$%।
৬. বর্গাচাষী বর্গাশর্ত পূরণ করলে তাকে জমি থেকে উৎখাত করা যাবে না।
৭. কৃষকদের ঋণের দায়ে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা যাবে না।
৮. খাস জমি কেবল বিত্তহীন কৃষকদের মাঝে বন্টন করা হবে। ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস থেকে খাস জমি বন্টনের কাজ শুরু হয়েছে।
৯. পল্লী এলাকায় বসতযোগ্য জমিও বিত্তহীনদের মাঝে বন্টন করা হবে। তবে বড় বড় শহরে ৫ কাঠার বেশি বসতযোগ্য জমি বন্টন করা যাবে না।
১০. ভরণপোষণের নিম্নতম প্রয়োজন, শ্রম, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের মাত্রা সংরক্ষণের জন্য কৃষি শ্রমিকের মজুরি ৩.২৭ কেজি বা সাড়ে তিন সের চাল বা সমমূল্যে ধার্য করা হয়।

বাংলাদেশে অতীতকাল থেকে যে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার যে ভূমি সংস্কার করেছেন, সে বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমালোচনা হয়েছে বলে তেমন কিছু জানা যায় নি। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ইসলামি ভূমি ব্যবস্থারই প্রায় অনুরূপ।

হযরত ফারূকে আযম (রা) সপ্তম শতাব্দীতে যে ভূমি সংস্কার করেছিলেন তা শুধু সপ্তম শতাব্দীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ইসলামি রাস্ট্রগুলোতে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, মহানবী (সা) বলেছেন-

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين

অর্থাৎ "তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা।"

উমর ফারূক (রা)-এর রাজস্ব সংস্কারকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে বলা যায় ঃ

ভূমি সংস্কারের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চাষী জমির (প্রতিনিধিত্বমূলক) মালিক হবে, অন্য কেউ নয়। এজন্য কোন সাহাবীকে হিজাযের বাইরে তিনি জমি ক্রয় করতে দেননি। এক চাষী যতটুকু জমি নিজে চাষ করতে পারবে,

ততটুকু জমিই সে মালিকানায় রাখতে পারবে, এর বেশি নয়। অতএব, বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা যা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত, তার মধ্যে থাকবে-

১. একজন চাষী স্বহস্তে যে পরিমাণ জমি চাষ করতে পারবে, ততটা জমির মালিক সে হতে পারবে। মোটামুটি হিসেবে এ পরিমাণ ১৫ বিঘা হতে পারে।

২. জমির অনুপস্থিত মালিকানা যতদূর সম্ভব স্বীকার করা হবে না। কারণ, জমির অনুপস্থিত মালিক তো চাষী নয়। সম্পত্তির মালিকানা একজন মুসলমানকে যতটা পরহেযগার বানায়, তার চেয়ে ঢের বেশি তাকে ফাসিক বানায়। অবাধ মালিকানা তাই পাপের দরজাগুলো ধীরে ধীরে খুলে দেয়। তবে যারা অকৃষিকাজে ব্যস্ত, অথচ তা থেকে আয়ের পরিমাণ স্বল্প, তারা জমির অনুপস্থিত মালিক হতে পারেন। তবে তাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এতটুকু হওয়া উচিত, যাতে কৃষি ও অকৃষি খাতের মোট আয় থেকে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ মোটামুটি চলে।

৩। উৎসাহব্যঞ্জক শর্তের বর্গাদারগণ বর্গাজমি চাষ করতে পারে। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর মতানুসারে বর্গাচাষ হবে।

৪। ইসলামের মিরাসী আইন আল্লাহ প্রদত্ত। তা সংস্কার বা সংশোধনের অধিকার কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের নেই। ভূমি সংস্কারে মিরাসী আইনের কারণে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তার নিরসনের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে চাষ এবং খন্ডিত জমি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একজন চাষীকে একস্থানে দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

৫। গ্রামে বা শহরে ৫ কাঠার বেশি জমি পরিবারের বসবাসের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় রাখা উচিত হবে না।

৬। সরকারি অফিস, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য জমির সীমাবদ্ধতা থাকবে না বটে, তবে যাতে অপচয় বা অপব্যয় না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৭. জমিদারী ও সামন্তপ্রথার মত স্বত্ব থাকবে না।

৮। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত ভূমি ব্যবস্থা গৃহীত হলে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমিহীন, বিত্তহীন ও প্রান্তিক চাষী বলে কেউ থাকবে না। শহরে বা নগরে বস্তির সংখ্যা কমবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় অবাধ সম্পত্তি রেখে সুদ ও ঘুষ বর্জন করলেও বা যাকাত-ফিতরা আদায় করলেও তাতে ভূমিহীন-বিত্তহীনদের সংখ্যা কমবে না। মনে রাখা দরকার যে, যাকাত-সাদকাহ গ্রহণের জন্য নাগরিক তৈরি করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান বাংলাদেশকে ঋণমুক্ত দেশ হিসেবে গড়তে হবে।

সীমাহীন সম্পত্তি মানুষকে মানুষ করার চেয়ে অমানুষ করে বেশী। সম্পত্তিহীনতাও মানুষকে মানুষ করার পরিবর্তে অমানুষ করে। এ মনুষ্যত্বহীনতা দু'টি বিপরীত মেরু থেকেই ঘটে থাকে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব মাঝামাঝি অবস্থায় নিহিত আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা কে চালু করেন ?

ক. লর্ড ডালহৌসী খ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক
গ. লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঘ. লর্ড ম্যাকলে।

২. ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়েছিল-

ক. ১৯৪০ সালে খ. ১৯৩৮ সালে
গ. ১৯৫০ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে।

৩. পূর্ববঙ্গ জমিদারী ও প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে-

ক. জমিদারী প্রথা চালু থাকে খ. জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়
গ. জমিদারের অত্যাচার হতে কৃষকগণ রেহাই পায় ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

৪. হযরত উমরের (রা) ভূমিনীতি ছিল-

ক. রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ভূমির মালিক হবে খ. চাষিগণ জমির মালিক হবেন
গ. প্রত্যেকে ১৫ বিঘা জমির মালিক হবে। ঘ. উপরের সব ক'টি উত্তর সঠিক।

৫. ইসলামের মিরাসী আইন কি পরিবর্তনশীল ?

ক. পরিবর্তনশীল নয় খ. প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল
গ. মুসলিম শাসকগণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস লিখুন।
২. পূর্ববঙ্গ জমিদারী ও প্রজাস্বত্ব আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরুন।
৩. পুর্ববঙ্গ জমিদারী ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ফলাফল আলোচনা কর।
৪. বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর আলোকপাত করুন।
৫. ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ভূমিস্বত্ব কেমন হওয়া উচিত ? আপনার মতামত উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস, সংস্কার এবং ইসলামি দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত ? আলোচনা করুন।

ইউনিট ৪

ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা

সম্পদ বণ্টন অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পদের সুষম বণ্টন ছাড়া মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ Bertrand Russell তার "I dislike communism because it is undemocratic and capitalism because it favours exploitation" (Unarmed Victory, 1963, Page-13) উক্তির মাধ্যমে এ সময়ের প্রচলিত দুই অর্থনৈতিক মতবাদ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ এ দুই মতবাদই সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। উৎপাদন, আয় বা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানায় বিপুল অর্থ-সম্পদ একীভূত হতে দেয়া মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এরই সুযোগে দুনিয়ায় পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় এবং তা বিরাট মানবতাকে জীবনযাত্রা নির্বাহের বুনিয়াদী ও অপরিহার্য প্রয়োজন থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। তাই ধন-সম্পদের উৎপাদন ও তার পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন তার বণ্টন ব্যবস্থা যদি বিশুদ্ধ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর পদ্ধতিতে না হয় তবে তা নির্বিশেষে দেশ ও দেশবাসীর জন্য ক্ষতিকর ও বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য ইসলাম ধন-সম্পদ একীভূত ও কুক্ষিগত না করার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।" (সূরা আল-হাশর : ৭) এজন্য প্রয়োজন সম্পদের যথাযথ বণ্টন।

আমরা এ ইউনিটে ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ও সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়গুলোকে ৭টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। পাঠগুলো নিম্নরূপ ঃ

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : সম্পদ কী ও সম্পদের প্রকারভেদ
- ❖ পাঠ-২ : ইসলামে সম্পদ বন্টন নীতি
- ❖ পাঠ-৩ : ইসলামি অর্থনীতিতে যাকাত
- ❖ পাঠ-৪ : ফসলের যাকাত ঃ উশর ও খারাজ
- ❖ পাঠ-৫ : ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ
- ❖ পাঠ-৬ : ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ
- ❖ পাঠ-৭ : ওয়াকফ ব্যবস্থা।

পাঠ ঃ ১

সম্পদ ও সম্পদের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি পাবেন-

- সম্পদ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সম্পদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।
- সম্পদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

সম্পদের পরিচয়

সাধারণ অর্থে ধন-সম্পত্তি ও টাকা পয়সাকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে যেসব দ্রব্য সামগ্রীর উপযোগ আছে, যোগান অপ্রচুর, বাহ্যিকতা ও বিনিময় মূল্য আছে তাকেই সম্পদ বলা হয়। অর্থাৎ সব রকম অর্থনৈতিক দ্রব্যকে অর্থশাস্ত্রে সম্পদ বলে। বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকার দ্রব্যকে সম্পদরূপে গণ্য করা হয়। যেমন- চশমা, ঘড়ি ছাতা, আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুগত সম্পদ। আবার উপযোগ, সীমিত যোগান ও হস্তান্তর মূল্য থাকায় ব্যবসায়ের সুনাম অবস্তুগত সম্পদ। তাছাড়া ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় মানবিক গুণাবলীও সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, সৎকাজ, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষা, মানবতার কল্যাণ সাধান, জ্ঞানদান, জ্ঞানঅর্জন প্রভৃতির কোন হস্তান্তর যোগ্যমূল্য না থাকা সত্বেও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো উত্তম সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। কেননা, অর্থ কড়ির ন্যায় এগুলোও মানুষকে উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে। তাই এগুলো অবস্থাগত সম্পদ। এসকল মহামূল্যবান সম্পদের দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকে। এ সকল সম্পদের মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকেই শুধু সম্পদ বললে সঠিক হবে না। অবস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ মানুষের সামাজিক চাহিদার আলোকে মানবিক কল্যাণ ও তৃপ্তি দিতে পারে। কিন্তু যেসব বস্তু প্রকৃতির অবাধ দান ও সহজ লভ্য, যেমন-আলো-বাতাস ইত্যাদি সেগুলোকে সম্পদ বলা যায় না। কেননা, এসব দ্রব্যের উপযোগ থাকলেও যোগানের সীমাবদ্ধতা ও বিনিময় মূল্য নেই। বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের অর্থনৈতিক ও নৈতিক কার্যকলাপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য

অর্থনীতিতে কোন দ্রব্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে হলে সাধারণত তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যথা- ১. উপযোগ, ২. অপ্রাচুর্যতা, ৩. হস্তান্তর যোগ্যতা এবং ৪. বাহ্যিকতা। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১. উপযোগঃ উপযোগ সম্পদের প্রধান গুণ। মানুষের কোন অভাব মোচনের ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয়। কোন দ্রব্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে হলে অবশ্যই তার উপযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণের কাজে তাকে লাগতে হবে। উপযোগহীন দ্রব্য সামগ্রী দাম দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য নয় এবং সে জন্য তা সম্পদ হতে পারে না।

২. অপ্রাচুর্যতাঃ কেবল উপযোগ থাকলেই কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলা যায় না। সম্পদ হতে হলে দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান অপ্রচুর হতে হবে। দ্রব্য অপ্রচুর বা দুষ্প্রাপ্য না হলে তা লাভের জন্য পরিশ্রম বা অর্থমূল্য লাগে না। সুতরাং তা সম্পদ হতে না। নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান অপ্রচুর নয় বলে সেসব সম্পদ নয়। কিন্তু ধান, পাট, কলম-খাতা, পোশাক এবং শহরের পানীয় জল প্রভৃতির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেগুলো সম্পদ।

৩. হস্তান্তর যোগ্যতাঃ সম্পদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্রব্যের হস্তান্তর যোগ্যতা। ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রব্য হস্তান্তর করা না গেলে তার কোন বিনিময় মূল্য থাকে না এবং তা সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য নয়। একখন্ড জমি হস্তান্তরযোগ্য না হলেও তার মালিকানা পরিবর্তন করা যায় বলে তা সম্পদ।

৪. বাহ্যিকতাঃ দ্রব্যের বাহ্যিকতা সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ দ্রব্য বাহ্যিক হলে হস্তান্তর যোগ্য হয়। যেমন-আসবাবপত্র, কাপড়, বইপত্র, ঘড়ি প্রভৃতি অসংখ্য বাহ্যিক বস্তু হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় তা সম্পদ।

পক্ষান্তরে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ, যেমন-প্রতিভা, দক্ষতা ইত্যাদি হস্তান্তর যোগ্য না হওয়ায় তা অর্থনীতিবিদদের মতে সম্পদ নয়।

যেসব দ্রব্যে উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থনীতিতে সেগুলোকে সম্পদ বলা হয়। এ চারটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি না থাকলে তা সম্পদ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের এ চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই তাকে সম্পদ বলা যাবে না। কেননা, শরীআতে কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম বা ভক্ষণ ও পান করা হারাম সাব্যস্থ হলে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সম্পদরূপে গণ্য হবে না। যেমন-মাদক দ্রব্য সম্পদ নয়, শুকর সম্পদ নয়। আবার সম্পদের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পণ্য বা বস্তুর মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- সূর্যকিরণ, নদীর পানি, নদী থেকে উত্তোলিত বালি ইত্যাদি সম্পদ। কেননা, এগুলোর দ্বারা মানুষ তার বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে থাকে। সাধারণত অর্থনীতিবিদগণ যেমন- কবির প্রতিভা, মেধা ইত্যাদিকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন না এ কারণে যে, এগুলোর উপযোগ থাকা সত্ত্বে এগুলো হস্তান্তর যোগ্য নয়। এসকল মানবিক গুণ উপযোগ থাকায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ায় এগুলো বাহ্যিকভাবে হস্তান্তর যোগ্য না হলেও এর দ্বারা মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। তাই, ইসলামি দৃষ্টিতে এগুলো সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতিবিদরা মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মানব উন্নয়নের কথা বলছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে তারা এ সকল অবস্তুগত জিনিসকে পরোক্ষভাবে সম্পদ হিসেবে স্বীকার করে থাকেন। বস্তুগত সম্পদের দ্বারা যেমন মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মেটানো হয়; তেমনিভাবে অবস্তুগত মানবিক গুণাবলী দ্বারা ও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

সম্পদের প্রকারভেদ

সম্পদকে সাধারণত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ বরা যায়। যথা-১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সমষ্টিগত সম্পদ, ৩. জাতীয় সম্পদ এবং ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

১. ব্যক্তিগত সম্পদঃ কোন ব্যক্তির নিজ মালিকানাধীন সকল সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়। যেমন-নিজস্ব জমি, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম প্রভৃতিকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়। এছাড়া অধ্যাপক মার্শালের অভিমত অনুযায়ী মানুষের কর্মদক্ষতা এবং বিভিন্ন গুণাগুণ ব্যক্তিগত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। কেননা- এসব অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ হস্তান্তরযোগ্য না হলেও মানুষের জীবিকা অর্জনে তা সহায়তা করে।

২. সমষ্টিগত সম্পদঃ সরকার বা জনসাধারণের সমষ্টিগত মালিকানাধীন সম্পদকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্থা-ঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, পোস্টঅফিস, স্কুল-কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ, ইয়াতীমখানা, হাসপাতাল, বাঁধ ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সমষ্টিগত সম্পদের উপর সমাজের সকলের সমান অধিকার ও কর্তব্য থাকে।

৩. জাতীয় সম্পদঃ রাষ্ট্রের সকল প্রকার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। জাতি সামগ্রিকভাবে এ সম্পদের মালিক। জাতীয় সম্পদ হিসেবের সময় দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী মালিকানাধীন সম্পদ বিয়োগ এবং বিদেশে দেশী মালিকানাধীন সম্পদ যোগ করা হয়।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পদঃ যে সকল সম্পদ কোন বিশেষ দেশ বা জাতির মালিকানাধীন নয়, বরং সব দেশই ভোগ করতে পারে তাকে আন্তর্জাতিক সম্পদ বলে। পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদী, রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পদের উদাহরণ।

আলোচ্য পাঠে সম্পদের সাধারণ ধারণা দেওয়া হল। ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের ধারণা সাধারণ অর্থনীতিতে সম্পদের ধারণার সাথে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বস্তু বা পণ্যের চারটি গুণ থাকলেই তাকে সম্পদ বলা হয় না। সম্পদ হতে হলে ইসলামি শরীআতে তার উপাদান, উৎপাদন সবকিছু বৈধ হতে হবে। সাধারণ অর্থনীতির তুলনায় ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যাপকতা কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. সম্পদের বৈশিষ্ট্য ক'টি?

ক. ৩টি
খ. ৫টি
গ. ৪টি
ঘ. ৪টি।

২. সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৫ ভাগে
খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে
ঘ. ৬ ভাগে।

৩. ব্যক্তিগত সম্পদ কোনটি?

ক. রাস্তা-ঘাট
খ. মসজিদ
গ. পোস্ট অফিস
ঘ. ঘর-বাড়ি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সম্পদ বলতে কী বুঝায় লিখুন।
২. সম্পদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৩. সম্পদের প্রকারভেদ লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের পরিচয় দিন এবং সম্পদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

ইসলামে সম্পদ বণ্টন নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধনবণ্টন নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ধন বণ্টন নীতি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধন বন্টনের পর্যায়সমূহ ও তার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ধন বণ্টন বিষয়ে অর্থনৈতিক মতবাদগুলো একরকম নয়। পুঁজিবাদ মানুষের ব্যক্তি মালিকানার অবাধ স্বাধীনতার মাধ্যমে বৈধ-অবৈধ সব ধরনের উপার্জনকে সম্পদ অর্জনের উপায় ঘোষণা করে সম্পদ বন্টনে এক সেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছে। এ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সামষ্টিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ মতবাদ সম্পদ বন্টনের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করেছে। পুঁজিবাদের শোষণ, স্বৈরাচারিতা ও সমাজতন্ত্রের সেচ্ছাচারিতার বিপরীতে ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পদ বন্টনে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। এ বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ও সুষম যা মানবতার জন্য কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক উন্নতির পাথেয়।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধন বণ্টননীতি

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি মালিকানা নির্ভর। এ ব্যবস্থায় মানুষ শর্তহীনভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে। ব্যক্তি মালিকানায় সমাজ, রাষ্ট্র বা অন্য কারো হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। এ ব্যবস্থায় সম্পদ শুধু মাত্র তাদের মধ্যে বন্টিত হবে যারা সরাসরি উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে বা উৎপাদন কাজে যাদের অংশ রয়েছে। অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে উৎপাদক বলে। এ মতবাদের দৃষ্টিতে উৎপাদনের অংশ বা উপকরণ চারটি। সেসব উপকরণ ও ধন বন্টনে তার অংশ নিম্নরূপ ঃ

১. মূলধন ঃ মূলধন বলা হয় ঐ উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণকে যা অধিক মাত্রায় উৎপাদনের জন্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায়। মূলধন তার পারিতোষিক হিসেবে পাবে সূদ।

২. শ্রম ঃ শ্রম বলা হয় ঐ প্রচেষ্টাকে যা মুনাফা সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করা হয়। মানুষের দৈহিক শ্রমই প্রনিধানযোগ্য। শ্রম প্রয়োগকারী শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পাবে।

৩. ভূমি ঃ ভূমিকে প্রাকৃতিক উপদান বলা হয়। ভূমি বলতে ভূপৃষ্ট বুঝালেও অর্থনীতিতে এর বিশেষ অর্থ রয়েছে, যা সৃষ্টিতে মানুষ কোনরূপ চেষ্টা সাধনা ব্যয় করেনি এমন সব সম্পদকে ভূমি বলা হয়। সম্পদ বন্টনের বেলায় ভূমি ভাড়া পাবে।

৪. সংগঠন ঃ সংগঠন বা উদ্যোক্তা বলতে উৎপাদনের ঐ উপকরণকে বুঝায় যা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণসমূহ (মূলধন, শ্রম, ভূমি) একত্রিত করে, উৎপাদন কার্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে এবং এতদসংক্রান্ত লাভ-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বহন করে। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টনে সংগঠনকে মুনাফা প্রদান করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ধন বণ্টন নীতি

ধনতন্ত্রের বিপরীতে সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সামষ্টিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা নির্ভর। এ ব্যবস্থায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই। রাষ্ট্রের সম্পদ শুধু তাদের মধ্যেই বন্টিত হবে, যারা রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে উৎপাদনে শ্রম ব্যয় করবে। চাই এ শ্রম দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক হোক। আর এ শ্রম প্রয়োগের বিনিময় হিসেবে মজুরী প্রদান করা হবে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধন বণ্টন নীতি

ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। বান্দা বা মানুষ সে সম্পদে প্রতিনিধি স্বরূপ। আর এ প্রতিনিধিত্বের অধিকারে নিজ অধীনস্থ সম্পদে সে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। ব্যক্তির সম্পদে সমাজ বা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। এজন্য ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনে দ্বীমুখি প্রভাব বিদ্যমান। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দু' মাধ্যমই এখানে স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থার দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টনের দু'টি পর্যায় রয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে যারা সরাসরি উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু শরীয়াত উৎপাদিত অর্থে তাদের অংশের স্বীকৃত দেয়।

এ দু' পর্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ

প্রথম পর্যায় ঃ যারা উৎপাদনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে।
ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ প্রথম পর্যায়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে যারা সরাসরি উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে বা য়াদের উৎপাদন কাজে অংশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.

"পুরুষ যা অর্জন করে সে তার অংশ পাবে এবং নারী যা অর্জন করে সে তার অংশ পাবে।" (সূরা আন-নিসা:৩২)
এ অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদকের সংখ্যা ও পরিভাষা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের মত নয় বরং এর চেয়ে ভিন্ন, যা নিম্নরূপ ঃ

১. মূলধন ঃ ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মূলধন হল ঐসব সামগ্রী যা ব্যয় বা পরিবর্তন ছাড়া উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন- নগদ টাকা পয়সা, খাদ্য ইত্যাদি। আর মূলধনের বিনিময় হবে মুনাফা সুদ নয়। মূলধনদাতাকে অবশ্যই উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির ঝুকি বহন করতে হবে।

২. ভৌত সম্পত্তি ঃ কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ব্যয় ছাড়া যে সব সামগ্রী পুনঃ পুনঃ উৎপাদন কাজে ব্যবহার্য হয় তাকে ভৌত সম্পত্তি বলা হয়। যেমন- ভূমি, ঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এসব সম্পত্তির বিনিময় হিসেবে তার মালিককে ভাড়া প্রদান করা হবে মজুরী।

৩. শ্রম ঃ উৎপাদনে মুনাফা সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করা হয় তাই-ই শ্রম। দৈহিক শ্রম যেমন- কৃষি, দিনমজুরী, বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম যেমন- শিক্ষক, ডাক্তার আইনগত শ্রম বা ওকালতি সব প্রকার শ্রমই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক পাবে।

৪. উদ্যোক্তা ঃ ইসলামি অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা পদ্ধতি অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। অন্যান্য ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা উৎপাদনের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যবসার প্রকারভেদ অনুযায়ী উদ্যোক্তার দায়িত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- মুদারাবা ব্যবসায় উদ্যোক্তা শুধু পরিচালনাগত শ্রম প্রয়োগের জন্য মজুরী পেয়ে থাকে, এখানে উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির সম্পূর্ণ ঝুকি মূলধনদাতা (ব্যক্তি/ব্যাংক/সংস্থা)-কে বহন করতে হয়। আবার মুশারাকা পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাও মূলধনের যোগান দেয় বিধায় সে মুনাফা পায়। এ ক্ষেত্রে সে পরিচালনাগত শ্রম ব্যয় করার কারণে মজুরী এবং মূলধন যোগান দেয়ার কারণে মুনাফা দু'টোই পেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়

সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল, ইসলাম দূর্বলকে সবল করা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য এক সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে উৎপাদকের সম্পদে সমাজের অক্ষম ও অসহায়দের অংশ নির্ধারণ করেছে। এ পর্যায়ের খাত সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. যাকাত ঃ

সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। যাকাতের বাধ্যবাধকতা কুরআনী আইন দ্বারা সাবস্ত্য ঃ

وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও।" (সূরা আন-নূর:৫৬)
সকল বর্ধিষ্ণু বা পরিবর্তনযোগ্য সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হবে। আর এর লক্ষ্য হল, যুগপৎভাবে ধনীর হৃদয় ও তার সম্পদের পরিশুদ্ধি। আল্লাহ বলেন-

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।" (সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)
যাকাত ঠিকমত আদায় করলে এ উদ্দেশ্য পুরোপুরিই বাস্তবায়িত হতে পারে। দু'ধরনের সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা হবে। প্রথমত প্রকাশ্য সম্পদ এর মধ্যে রয়েছে গরু, ছাগল, উট, দুম্বা প্রভৃতি গবাদি পশু। দ্বিতীয়তঃ অপ্রকাশ্য সম্পদ, এর মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ, রৌপ, খনিজ সম্পদ, নগদ টাকা ও ব্যবসায়িক পণ্য।

যেসব মালের উপর যাকাত ফরয সেসব মাল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হতে হবে। রাসূল (সা)-এর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে- "পাঁচটির কম সংখ্যক উট ও চল্লিশটির কম ছাগলের যাকাত নেই। অনুরূপভাবে দু'শত নগদ রৌপ্য মুদ্রার কমের উপর এবং ফসল ও দানার পাঁচ অসাকের কম পরিমাণের উপর যাকাত নেই।" গরুর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও নির্ভরযোগ্য মত হল, ত্রিশ। অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৭.৫ ভরি সোনা বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরো যে শর্তটি বিদ্যমান তা হল, নিসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর পূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ বা তদুর্ধ সম্পদ যদি কারো অধীনে এক বছর থাকে তবে তাতে যাকাতের বিধান কার্যকর হবে।

যাকাতের সম্পদ যেসব খাতে বন্টিত হবে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছাড়াই আল্লাহর বাণীতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

"সাদকা তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ৬০)

ওশর ও ওশরের অর্ধেক

ওশর শব্দের অর্থ-এক-দশমাংশ। জমির ফসলের এক-দশমাংশ পরিমাণ কর বা রাজস্ব গ্রহণ করা হয় বলে তাকে ওশর বলে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের ১০% এবং ক্ষেত্র বিশেষে ৫% ভূমি রাজস্ব হিসেবে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। ওশর প্রদানের নির্দেশ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত ঃ

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.

"হে মুমিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ বলেন-

وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

"যখন তা ফলবান হয় তখন এর ফল আহার করবে আর ফল তোলার দিনে এর হক আদায় করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনয়াম : ১৪১)

এখানে হক অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিনিময়। আর এ বিনিময় পদ্ধতি রাসূল (সা) নির্ধারণ করেছেন ঃ

فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان غيلا العشر و فيما سقى بالسوانى والنضح نصف العشر.

"যে জমি বৃষ্টি, ঝর্ণধারা বা নদী-নালার পানিতে সিক্ত হয় অথবা তা স্বতই সিক্ত থাকে তার ফসলের এক-দশমাংশ এবং যে জমিতে পানি সিঞ্চনে সিক্ত করা হয় তার বিশ ভাগের একভাগ (৫%) ফসল ভূমির কর রূপে দিতে হবে।" (আবু দাউদ)

সাদকাতুল ফিতর

রমযান মাস শেষে ঈদের দিন প্রত্যেক ধনীব্যক্তি গরীবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা তার মুল্য রোযার ফিৎরা বাবদ বণ্টন করে তার নাম সাদকায়ে ফিতর বা যাকাতুল ফিতর। এ সাদকাহ প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-নারী, স্বাধীন-দাস, ছোট-বড় সকলের উপর ফরয।

الا ان صدقة الفطر واجبة على كل ذكرا او انشى حرا او عبدا صغيرا اوكبيرا مدان من قمح او سواءه صاع من طعام.

"মনে রেখ! সাদকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন, দাস, বড়-ছোট সকলের উপর দুই মুদ গম বা তার সমপরিমান এক ছা খাদ্য প্রদান করা ওয়াজিব।" (তিরমিজী)

ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

রসুল (স.) এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব পরিমান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-দাস, বড়-ছোট সকলের উপর সাদকায়ে ফিতর আদায় আবশ্যক করেছেন। আর ঈদের সালাতে বের হওয়ার আগে তা আদায় করার সময় নির্ধারণ করেছেন।

৪. উত্তরাধিকার ঃ

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্ত সীমিত নয়। বরং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। ব্যক্তির নিজের জীবনে যেসব লোকের সাথে তার বৈষয়িক কিংবা আত্মিক অথবা রক্তের নিকটতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং যে সব লোক তার লাভ-লোকসানকে নিজের লাভ লোকসান বলে মনে করেছে, তার মালিকানা ধন-সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বণ্টন করা হবে। এই উত্তরাধিকার আইন কেবল ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই প্রবর্তিত হবে না বরং উৎপাদনের উপকরণের (Means of production) উপরও কার্যকর হবে।

ইসলামের মীরাসী আইনের মূলনীতি নিম্নরূপ-

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

"পিত-মাতা এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ রয়েছে। তা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"(সূরা আন-নিসা : ৭)

এ আইন প্রয়োগ করা হবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার দাফন-কাফন ও ওসিয়ত পূরণ করার পর।

৫. ওসিয়তঃ

ইসলামি অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবকাশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের উপর ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা-বাসনা কার্যকর করার যে সীমাবদ্ধ অধিকার প্রদান করে, তার মধ্যে ওসিয়ত অন্যতম। আল্লাহ বলেনঃ

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية.

"তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায় তবে তার পিতামাতাও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হলো।" (সূর আল-বাকারাহ : ১৮০) এ আয়াতের ভিত্তিতেই মুলত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ওসিয়ত বিধিবদ্ধ হয়েছে। অতএব প্রত্যেক সম্পত্তিমালিক মৃত্যুর পুর্বে নিজে ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে যদি কোন ওসিয়ত করে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার ওসিয়ত পুরণ করতে হবে। বস্তুত ইসলামি অর্থনীতিতে ওসিয়ত একটি সুপারিশ মাত্র নয়, বরং অনিবার্যরুপে তা কার্যকর করতে হবেই। তাই সম্পদ বন্টনে এ অসীয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এমন অনেক নিকটাত্মীয় থাকতে পারে যারা আইনগত কারণে মৃতের সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করতে পারে না, বরং বঞ্চিত হয়। তখন সম্পত্তির মালিকের কর্তব্য এ সুযোগ ব্যবহার করে মীরাস বঞ্চিত নিকটতম ব্যক্তিদের জন্য ওসিয়ত করা। ওসিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে দুটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য ঃ

প্রথমতঃ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীর জন্য কোন ওসিয়ত করা যাবে না। রাসুল (স.) বলেনঃ

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

"মিরাস ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক যথার্থভাবে দিয়ে দিয়েছেন। অতএব উত্তরাধিকারীর জন্য কোন ওসিয়ত করা যাবে না। (তিরমিযী)

দ্বিতীয়তঃ ওসিয়ত মোট সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ পরিমান করা যাবে। রাসুল (স.) সা'দ বিন আবূ অক্কাস (রা) এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ

الثات والثلث كثير

"------ হ্যাঁ, এক তৃতীয়াংশই আর এই এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট -------- ।"(মুসলিম)

ইসলামি ফিকহবিদগণ ওসিয়তকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেনঃ

১. ওয়াজিব ওসিয়তঃ ওসিয়তকারীর অধীনে আল্লাহ বা বান্দার যেসব আর্থিক হক রয়েছে তা আদায় করার জন্য ওসিয়ত করা। যেমনঃ যাকাত আদায়, আমানত পালন ইত্যাদি।
২. মানদুব ওসিয়ত ঃ যা দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য, তার নৈকট্য এবং মানুষের কল্যাণ প্রত্যাশা করা হয়। যেমন- কোন কল্যাণ সংস্থার জন্য ওসিয়ত করা।
৩. মুবাহ ওসিয়ত ঃ যেমন- বন্ধু-বান্ধবের জন্য ওসিয়ত।
৪. মাকরূহ ওসিয়ত ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এমন কোন কাজের জন্য ওসিয়ত করা।
৫. হারাম ওসিয়ত ঃ যেমন- মদ বিতরণের জন্য ওসিয়ত।

খারাজ ও জিযিয়া

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকৃত জমি থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলা বলে। খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইসলামি রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সাথে জমির জরিপ ও গুণাগুণ নির্ণয় করেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অমুসলিমদের জমি থেকে খারাজ হিসেবে যে রাজস্ব আদায় হবে তা রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থভান্ডারে জম হবে এবং দেশের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ ও সর্বজনীন কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে বন্টিত হবে।

খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে জমির গুণাগুণ উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজনীয় চাষের পরিমাণ পার্থক্য, পানি সেচ করার আবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। যেন জমির প্রকৃত গুণ অনুপাতেই রাজস্ব ধার্য হতে পারে। অন্যথায় ভূমি মালিকের উপর অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা রাজস্ব কম ধার্য হলে তাতে সামষ্টিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হবে, ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে জিযিয়া বলা হয়। জিযিয়া অর্থ বিনিময়। রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে যে নিরাপত্তা দান করে, রাষ্ট্র তারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমাণে কর আদায় করার অধিকার রাখে। জিযিয়া অনুরূপ একটি কর। এ করের স্বীকৃতি কুরআন মজীদে রয়েছে-

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

"যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে নিযিয়া দেয়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ২৯)

জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের কাজ রাষ্ট্র সরকার ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই সঠিক পন্থা। প্রত্যেক ধনশালী উপার্জনশীল ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এ উভয় দিক লক্ষ্য রেখেই তা নির্ধারণ করতে হবে। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, এ ব্যাপারে যেন দাতা ও গ্রহীতা কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার না হয়। জিযিয়া সাধাণত টাকায় আদায় করা হবে। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিশেষ কোন শিল্প পণ্যের মাধ্যমে ও তা আদায় করা অসংগত নয়। নবী (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের থেকে জিযিয়া বাবদ শিল্পপণ্যও গ্রহণ করেছেন। (কিতাবুল খারাজ)

কাফফারাহ

কাফফারাহ বলা হয় গোনাহ মাফের এবং তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাকে। কখনো কখনো মুসলিম ব্যক্তি এমন কোন হারাম কাজ বা অপরাধে পতিত হয় যার শাস্তি বিধানে আর্থিক জরিমানা প্রদান করতে হয়, যেমন- শপথ ভঙ্গ করা, ইহরাম অবস্থায় ইহরামের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু করা ও যিহার ইত্যাদি।
মহান আল্লাহ তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করেন। এতদসত্ত্বেও এ পরিসরে আর্থিক জরিমানাকে বিধিবদ্ধ করার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ হিকমত রয়েছে। তা হল এ সম্পদের মাধ্যমে সমাজের অক্ষম ও অসহায়দের সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করা।

সাদাকাহ ও করযে হাসানাহ

সমাজের অসহায় ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য প্রত্যেক ধনবান মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় ফরয। কিন্তু শুধু এই ফরয আদায় করেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে রেহাই পায় না। সমাজ ও জাতির জন্য প্রয়োজনে আরো অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব তার রয়েছে। রাসুল (সা) যাকাত ও সাধারণ দান বা সাদকাহর মধ্যে পার্থক্যের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন-

ان فى المال حقا سوى الزكوة تلا هذه الاية التى فى البقرة : ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الاخر و الملائكة والكتاب والنبيين و اتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل والسائلين و فى الرقاب و اقام الصلوة و اتى الزكوة.

"যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদে জাতির অধিকার রয়েছে। অতঃপর তিনি সূরা বাকারাহর আয়াত পড়লন- কেবল পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করলেই নেকী পাওয়া যায় না, বরং আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর ভালবাসার বশবর্তী হলে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃসম্বল পথিক, অভাবগ্রস্ত ও দাসদের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং নামায আদায় করা ও যাকাত দেয়াই হল যথার্থ নেক আমল।" (তিরমিজী) এ আয়াত ও হাদীস থেকে দান-সাদকাহ ও মানবতার কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ের আবশ্যকীয়তা বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়া সমাজের লোকদের আকস্মিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য করযে হাসানাহ দেয়াও মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। কুরআন মাজীদে করযে হাসানাহ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে-

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون.

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে ? তিনি তার বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৪৫)

একইভাবে দাস মুক্তকরণে সম্পদ ব্যয় করাও ইসলামে এক গুরুত্ববহ ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত। সম্পদ বন্টনের এ ক্ষেত্রটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও অসীম গুরুত্বের দাবীদার।

কুরবানী ও আক্বীকাহ

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের জন্য পশু কুরবাণী ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফার মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ যা পালন করলে অসীম সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, তার অমান্যকারীকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত করা না হলেও সে রাসূল (সা)-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

আক্বীকাহ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন ঃ

مع الغلام عقيقة فاريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى.

"প্রত্যেক সন্তানের জন্য আক্বীকাহর বিধান রয়েছে। অতএব সে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট লাঘব কর।" (মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

আক্বীকাহ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যায়ের নির্দেশের মধ্যে এক ঐশী হিকমত বিদ্যমান। কারণ এ যবেহের গোশত সমাজের নিঃস্ব মানুষরে মধ্যে বন্টন, তাদেরকে ভক্ষণ করানো এবং পশুর চামড়া বিক্রির টাকা তাদেরকে প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়।

ওয়াকফ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াকফ অর্থ আটক করা বা বন্দী করা। পরিভাষায় ওয়াকফ বলা হয় ঐ সম্পত্তিকে যা মানব কল্যাণে চিরস্থায়ীভাবে বন্দবস্ত করা হয়।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে ওয়াকফ দু' প্রকার ঃ

১. পারিবারিক ওয়াকফ ঃ যেমন- নাতী-নাতীন বা নিকটবর্তীদের জন্য ওয়াকফ করা।

২. কল্যাণমূলক ওয়াকফ ঃ মানব কল্যাণে ওয়াক্তফ করা।

বলা হয়ে থাকে, ওয়াকফের প্রচলন রাসূল (সা) থেকেই শুরু। কেননা তিনি তাঁর সমূদয় সম্পত্তি আল্লাহর পথে বিলায়ে দেন। কেউ কেউ বলেন, মুখাইরেখ ওহুদ যুদ্ধে তার সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। তিনি ওসিয়ত করেন, আমি

যদি যুদ্ধে মারা যাই তবে আমার সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং তা সাদকাহ করে দেন। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ৭ম হিজরীতে খায়বারে উমর (রা) একখন্ড জমি প্রাপ্ত হন অতঃপর তিনি তা ওয়াকফ করে দেন।
রাসূল (সা) বলেন ঃ

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية , او علم ينتفع به , او ولد صالح يدعو له.

"যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের দরজা খোলা থাকে, সাদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎপুত্র যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম)

সাদকাহ জারিয়া বা প্রবাহমান দান বলতে এখানে ওয়াকফ বুঝানো হয়েছে।

অতএব বলা যায়, ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধন বন্টনের যেন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে তা মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিক-নির্দেশনা। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ইসলামি অর্থনীতির এ সম্পদ বন্টন ব্যবস্থাই মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুক্তি দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক করের টিক দিন

১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ক'টি?
ক. তিনটি খ. দুইটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি।

২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিক কে?
ক. রাষ্ট্র খ. জনগণ
গ. আল্লাহ তাআলা ঘ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)

৩. ক'টি ছাগল থাকলে যাকাত দিতে হবে?
ক. ২০টি খ. ৩০টি
গ. ৪০টি ঘ. ২৫টি।

৪. নদী-নালার পানি দ্বারা সিক্ত ফসলের কয়ভাগ যাকাত দিতে হয়?
ক. পাঁচ ভাগের এক ভাগ খ. চারভাগের এক ভাগ
গ. দশ ভাগের এক ভাগ ঘ. বিশ ভাগের একভাগ।

৫. ইসলামি আইনে ওয়াকফ কয় প্রকার?
ক. চার প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. দুই প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধন-সম্পদ বন্টননীতি উল্লেখ করুন।
২. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বন্টননীতি আলোচনা করুন।
৩. ইসলামের মিরাসী আইনের মূলনীতি কী? লিখুন।

৪. খারাজ ও জিযিয়া সম্পর্কে টীকা লিখুন।
৫. সাদাকা ও করযে হাসানা কী? লিখুন।
৬. ওয়াকফ কী? ওয়াকফের গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধন-সম্পদ বণ্টননীতি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৩

ইসলামি অর্থনীতিতে যাকাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- যাকাত শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- যে সকল সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- যাকাতের নিসাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- যাকাতের শর্ত আলোচনা করতে পারবেন।
- যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- যাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

যাকাত শব্দের অর্থ

ইসলাম মানবজাতির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালিন শান্তিই এ ব্যবস্থার মূল কথা। এ পৃথিবীতে প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষের আর্থিক অবস্থা সমান নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

আমিই তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাতে পারে।" (সূরা আয্-যখরুফ : ৩২)

এ কারণেই মানুষ ধনী-গরীব বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের এ অর্থনৈতিক বৈষম্য শুধু পরীক্ষার জন্য। গরীব তার দারিদ্রতা নিয়ে আল্লাহর বন্দেগীতে টিকে থাকতে পারে কি-না ? আবার ধনী তার সম্পদের মোহে আল্লাহকে ভুলে থাকে, না-কি তার সম্পদ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ব্যয় ও নিয়ন্ত্রণ? আল্লাহ ধনীর সম্পদ ব্যবহারের যে নীতিমালা দিয়েছেন তার অন্যতম প্রধান বিষয় হল, আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সমাজের অক্ষম ও দুর্বল মানুষদের সবল করা। এ আর্থিক সাহায্য দুধরনের- এক- অবশ্য পালনীয়, দুই- সেচ্ছায় প্রদেয়। প্রথম প্রকার বা অবশ্য পালনীয় সাহায্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন- যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদি। আলোচ্য অংশে যাকাত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যাকাত (زكوة) শব্দটি আরবী। যার অর্থ- যে জিনিস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণে বেশী হয়। কেননা যাকাত দুজনেরই সম্পদ বৃদ্ধি করে। যাকাতদাতা যাকাত প্রদান করায় আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দেন, ফলে তার সম্পদ বেড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যাকাতগ্রহীতার সম্পদতো বাড়েই। যাকাতের অন্য অর্থ পবিত্রতা ও শুদ্ধকরণ। কেননা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার সম্পদ শুদ্ধ হয়। যাকাতের এ অর্ন্তনিহিত দু অর্থই আল্লাহ এক আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।" (সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)

ইসলামি শরীয়াতের দৃষ্টিতে যাকাত ব্যবহার হয় ধন-সম্পদে আল্লাহ নির্ধারিত নির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বোঝাবার জন্য। যেমন- পাওয়ার যোগ্য অধিকারী লোকদের নির্দিষ্ট অংশের ধনমাল দেয়াকেও যাকাত বলা হয়।
নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের সম্পদ এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকে নির্দিষ্ট হারে সম্পদ আল্লাহ নির্ধারিত পথে ব্যয় করার নামই যাকাত।

অর্থনীতির ভাষায় যাকাত হল, বিত্তশীলদের উপর আরোপিত এক ধরনের কর।

যাকাত ব্যক্তির উপর সমাজের অধিকার। এ অধিকার পূর্ণ করা ইসলামি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্তব্য। এ কর্তব্যের বিধান পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামের অন্য কোন বিধান এত অসংখ্যবার উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ বলেন ঃ

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

"তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও"। (সূরা আল-বাকারা : ৪৩)

যাকাত আদায়যুক্ত সম্পদ

যাকাতের আবশ্যকতা শুধু সঞ্চিত অর্থ-সম্পদের উপর নয় বরং ব্যক্তির নিকট যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ হলেই তাতে যাকাত ফরয হবে। যেসব সম্পদে যাকাত ফরয তা হলঃ

১. নগদ টাকা-পয়সা
২. স্বর্ণ-রৌপ ও তার অলংকার
৩. খনিজ সম্পদ
৪. গবাদি পশু
৫. ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী।

যাকাতের নিসাব

ইসলাম ক্রমবর্ধনশীল সম্পদের যে কোন পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয করেনি। তা যত দূর্বল ও ক্ষীণ হোক না কেন। বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। ফিকহ-এর পরিভাষায় তাকে নিসাব বলে। যাকাত আদায়ী সম্পদের শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিসাব রয়েছে। যেমন-

১. নগদ টাকা পয়সা	ঃ ৭.৫ ভরি সোনা বা ৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্যের টাকা।
২. স্বর্ণ-রৌপ্য	ঃ স্বর্ণ ৭.৫ ভরি, রৌপ্য ৫২.৫ তোলা।
৩. খনিজ সম্পদ	ঃ নির্ধারিত কোন নিসাব নেই। যত কমই হোক তাতে যাকাত দিতে হবে।
৪. গবাদি পশু	ঃ উট-৫টি গরু- মতভেদ আছে, তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হল- ৩০টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা- ৪০টি
৫. ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী	ঃ ৭.৫ ভরি সোনা বা ৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্যের সম্পদ।

যাকাতের হার

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, যাকাতের হার নির্ধারণ। এ হার স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের হার নিম্নরূপ ঃ

- **নগদ টাকা-পয়সা, সোনা, রুপা ও ব্যবসায়িক পণ্যের উপর ------- ২.৫%।**
- **উট** -- ০৫ থেকে ০৯টি উটের জন্য --- ১টি ছাগী
  ১০ থেকে ১৪টি উটের জন্য --- ২টি ছাগি
  ১৫ থেকে ১৯টি উটের জন্য --- ৩টি ছাগি
  ২০ থেকে ২৪টি উটের জন্য --- ৪টি ছাগি
  ২৫ থেকে ৩৫ টি উটের জন্য --- ১টি গরুর মাদী বাচ্চা যার বয়স ১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে ২ বছরে পদার্পণ করেছে।
  ৩৬ থেকে ৪৫টি উটের জন্য --- ২ বছরের পর ৩য় বছরে পদার্পণকারী বয়সের ১টি গাভী।
  ৪৬ থেকে ৬০টি উটের জন্য --- তিন বছর অতিক্রমকারী ৫ বছরের ১টি গাভী।
  ৭৬ থেকে ৯০টি উটের জন্য --- ২ বছর অতিক্রম করে ৩য় বর্ষে পদার্পণকারী উস্ট্রীর দু'টি বাচ্চা।
  ৯১ থেকে ১২০টি উটের জন্য --- ৩ বছর অতিক্রম করে ৪র্থ বছরে পদার্পণকারী উস্ট্রীর ২টি বাচ্চা।
- **গরু--** ৩০ থেকে ৩৯টি গরুর জন্য --- ১ বছর বয়সের ১টি বাছুর।
  ৪০ থেকে ৫৯টি গরুর জন্য --- ২ বছর বয়সের ১টি বাছুর।
  ৬০ থেকে ৬৯টি গরুর জন্য --- ১ বছর বয়সের ২টি বাছুর।

৭০ থেকে ৭৯টি গরুর জন্য --- ২ বছর বয়সের ১টি বাছুর ও ১ বছরের ১টি বাছুর।
৮০ থেকে ৮৯টি গরুর জন্য --- ২ বছর বয়সের ২টি বাছুর।
৯০ থেকে ৯৯টি গরুর জন্য --- ১ বছর বয়সের ৩টি বাছুর।
১০০ থেকে ১১৯টি গরুর জন্য --- ২ বছর বয়সের ১টি বাছুর ও ১ বছরের ২টি বাছুর।

- **ছাগল/ভেড়া/দুম্বা ঃ**

  ৪০ টি থেকে ১২০টির জন্য --- ১টি।
  ১২১ টি থেকে ২০০টির জন্য --- ২টি।
  ২০১ টি থেকে ৩৯৯টির জন্য --- ৩টি।
  ৪০০ টি থেকে ৪৯৯টির জন্য --- ৪টি।
  ৫০০ টি থেকে ৫৯৯টির জন্য --- ৪টি।
  অতঃপর প্রতি ১০০টির জন্য ১টি করে।

- **খনিজ সম্পদের যাকাত-** ২০% বা একপঞ্চমাংশ।

যাকাতের শর্ত

যাকাত ব্যবস্থার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে যা পূরণ করা আবশ্যক। ইসলামি ফিকহর দৃষ্টিতে সে শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

ইসলাম গ্রহণ

যাকাতের হুকুম মুসলমানদের জন্যই বাধ্যতামূলক। অমুসলিমদের উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। ইসলামের প্রথম স্তম্ভ তথা ঈমান আনলেই কেবল বাকী স্তম্ভগুলোর বিধান তার উপর প্রয়োগ করা হবে। যাকাত শুধু মুসলমানদের জন্য ফরয। তার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখযোগ্যঃ

خ ذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم.

“তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের দুআ করবে। তোমার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর।” (সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বালকের উপর যাকাত ফরয নয়। এ বিষয়ে ফকীহ তথা ইসলামি আইনশাস্ত্রে পারদর্শী প িতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বালকের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বালকের সম্পদে যাকাত ফরয নয়।

জ্ঞানবান হওয়া

আকেল তথা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। এ শর্তের ভিত্তিতে পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয়তা প্রয়োগ হয় না। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার মত এ শর্তের ব্যাপারে ফকীহগণ দু'দলে বিভক্ত হয়েছেন। কেউ বলেন, পাগলের মালের যাকাত দিতে হবে। আবার অন্যদের মতে পাগলের মালে যাকাত দিতে হবে না।

মালিকানা সম্পর্কিত শর্তাবলী

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদ ও তার মালিকানা সম্পর্কিত বিশেষ শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

পূর্ণাঙ্গ মালিকানা ঃ সমস্ত ধন-সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ মানুষকে তা দান করেছেন। বান্দা আল্লাহর সম্পদের প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্বের অধিকারে বান্দা সে সম্পদ ভোগের অধিকার পায়। অতএব যেসব সম্পদে বান্দা পূর্ণাঙ্গ ভোগের মালিকানা পায় সেসব সম্পদেই কেবল যাকাত ফরয।

খ. প্রবৃদ্ধি ঃ যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে সে মাল প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে। অর্থাৎ সে মাল তার মালিককে মুনাফা বাড়িয়ে দেবে। পরিমাণে ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

গ. নিসাবের শর্ত ঃ ইসলাম ক্রমবর্ধনশীল ধন-মালের যে কোন পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয করেনি, তা যতই দুর্বল ও ক্ষীণ হোক না কেন, বরং যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হওয়া অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। ফিকহর পরিভাষায় তাকেই নিসাব বলে।

ঘ. মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ঃ কোন কোন ফকীহ মালের বর্ধনশীলতা ছাড়াও নিসাবের পরিমাণা মালিকের মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার শর্ত করেছেন। হানাফী ফকীহগণের নিকট এটা আবশ্যকীয় বিধান।

ঙ. ঋণ মুক্তি ঃ পূর্ণাঙ্গ মালিকানা ও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার সাথে সাথে এ শর্তও আরোপ করা হয়েছে যে, যাকাতদাতা সমস্ত প্রকার ঋন থেকে মুক্ত হবে। কেননা ঋণ মুক্ত করা যাকাতের উদ্দেশ্য। ইবনু রুশদ বলেন- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর থেকে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তুলে নেয়াই শরীয়াতের লক্ষ্য। শরীয়াতের দলীলাদি, তার অর্ন্তনিহিত ভাবধারা ও তার সাধারণ নীতিমালা সবকিছু থেকে একথাই প্রমাণিত হয়।

চ. এক হিজরী বছর অতিক্রমণ ঃ সম্পদ মালিকের হাতে একবছর বা পূর্ণ চন্দ্র বার মাস- থাকলেই যাকাত ফরয হবে। পশু, নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়িক পণ্যের ব্যাপারে এ শর্ত আরোপিত হয়েছে। বলা যায় এ হচ্ছে মূলধনের যাকাত। কিন্তু কৃষি ফসল, ফল-ফলাদি, মধু, খনি ও গচ্ছিত ধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে একবছর কালের মালিকানার কোন শর্ত নেই। কেননা এগুলো হলো উৎপাদনের যাকাত।

যাকাতের প্রাপক

যাকাতের সম্পদ যেসব খাতে বন্টিত হবে তা আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

"সাদকা তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ৬০)

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আট শ্রেণীর লোক যাকাতের প্রাপক বা হকদার। সে আট শ্রেণী হল ঃ

ফকীর-মিসকীন ঃ

ফকীর-মিসকীনের সঠিক অর্থ নির্ধারণে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ মনে করেন ঃ যারা দরিদ্র তবে ভিক্ষা করে না তারাই ফকীর, আর যারা দরিদ্র এবং ভিক্ষা করে তারা মিসকীন। অন্যান্য ফকীহগণ এর ঠিক উল্টা সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ যারা দরিদ্র তবে ভিক্ষা করে না তারাই মিসকীন আর যারা দরিদ্র ও ভিক্ষা করে তারাই ফকীর। (তাফসীরে তাবারী ঃ ১৪/৩০৮)

আমাদের কথা হল, মিসকীন বলতে ঐসব লোকদেরকেই বুঝায়, যাদের কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ নেই। আর ফকীর হল, ঐসব লোক যাদের সম্পদ আছে কিন্তু নিসাব পরিমাণ নেই। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেন -

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

"নৌকার ব্যাপার- এতো ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো।" (সূরা আল-কাহ্ফ:৭৯)

যাকাত আদায়কারী ঃ তারা হল, ইসলামি রাষ্ট্রের সে সব কর্মচারী যাদেরকে যাকাত বিভাগে নিয়োগ দেয়া হবে। তাদের দায়িত্ব হবে, ব্যক্তির সম্পদ হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, যাকাতের অর্থ সংগ্রহ, হিসাব রক্ষণ, বণ্টন ও সংরক্ষণ করা।

৪. নও মুসলিম ঃ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় তারা উপার্জন থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে এসব লোকের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান কল্পে তাদের যাকাতের অর্থ গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের এ আকস্মিক সমস্যা ঈমানের উপর প্রভাব ফেলতে না পারে।

৫. দাস মুক্তকরণে ঃ যাকাতের অর্থ দাসমুক্ত করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে। যে সব দাস তাদের মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা মুক্ত হতে পারবে। তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এ অর্থ ব্যায় করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া বাজার থেকে দাস কিনে তাকেও মুক্ত করা যেতে পারে।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঃ যারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ করে কিন্তু তা পরিশোধ করার সামর্থ্য তাদের নেই তাদের সে প্রয়োজন পূরণের জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। এদেরকে ফকীর-মিসকীনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, একইভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে যদি কেউ ঋণ করে আর সে ঋণ শোধ করতে না পারে তবে যাকাতের অর্থ দিয়ে সে ঋণ শোধ করা যেতে পারে।

৭. আল্লাহর রাস্তা-'এর সঠিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে একে শুধু জিহাদের মধ্যে সীমিত করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য কথা হল- ফি সাবিলিল্লাহ বলতে ঐ সব কিছুকে শামিল করে যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং যার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের অগ্রযাত্রা তরান্বিত হয়।

৮. মুসাফির ঃ যারা সফরে গিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে অর্থাভাবে আটকে পড়েছে এবং দেশে ফিরে আসতে পারছে না, যে কাজে গিয়েছে তাও সম্পন্ন হচ্ছে না সে অবস্থায় তাদেরও যাকাতের অর্থ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কোন কোন ইসলামি অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ বিধানের আওতায় যাকাতের অর্থ পথিকদের জন্য রাস্তাঘাট মেরামত, পান্থনিবাস তৈরী ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করা যায়, যদিও এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (এম. এ. হামিদ ঃ ইসলামি অর্থনীতি ঃ ২২৯)

যাকাতের অর্থ-সামাজিক প্রভাব

যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন মানব সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যাকাত ব্যয়ের খাত ব্যাখ্যা করলে এ প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। ব্যয়ের খাতের ভিত্তিতে যাকাতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রভাব সৃষ্টি সম্ভব।

১. বেকার শ্রমজীবী ও রুযিহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা ঃ এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন ঃ কুরআনের পরিভাষায় ফকীর এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়ে যে খুব মজবুত এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্তেও প্রতিকুল অবস্থার কারণে সে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। কুরআন শরীফে ঠিক এ অর্থেই এটা ব্যবহৃত হয়েছে। এ দিক দিয়ে সে সব অভাবগ্রস্ত লোককেও ফকীর বলা যেতে পারে, যারা কোন জুলম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছে। কোন সামরিক এলাকা থেকে বিতাড়িত লোকদেরও ফকীর বলা যেতে পারে। কুরাইশদের অত্যাচারে যেসব মুসলমান হিজরত করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং রুযি-রোজগারের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন, কুরআনে তাদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। যেমন-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

"এ সম্পদ অভাব গ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করে।" (সূরা আল-হাশ্‌র :৮)

২. অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা ঃ ফকীরদের মত মিসকীনদের জন্যও যাকাতের অর্থ নির্ধারিত করা হয়েছে। মিসকীনের পর্যায়ে তারাও পড়ে, দৈহিক অক্ষমতা যাদেরকে চিরতরে নিষ্কর্মা করে দিয়েছে, বার্ধক্য, রোগ, অক্ষমতা ও পংগুতা যাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করে বটে কিন্তু যা উপার্জন করে তা তার প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় যৎকিঞ্চিত। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, মিসকীনের অবস্থা ফকীরের চেয়েও বেশী বিপর্যস্ত থাকে। কারণ অর্থনৈতিক অসামর্থই তাকে দরিদ্র ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে। অতএব তাদেরকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পায়।

৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঃ যাকাত বিভাগে কর্মরত যে সব কর্মচারী ব্যক্তির সম্পদ হিসেবে শেষে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করবে, যারা যাকাত আদায় করবে, তার যথাযথ হিসাব করবে, যাকাতের মালামাল সংরক্ষণ করবে এবং যারা উক্ত সম্পদ বন্টন করবে তাদের বেতন দেওয়া এবং গোটা যাকাত বিভাগের যা কিছু ব্যয় হবে তা যাকাতের সম্পদ থেকে ব্যয় করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। এ বেতনের হার কর্মচারীদের যোগ্যতা ও মানবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

৪. দ্বীন ইসলামের সংরক্ষণ ঃ যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত হল, মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য ব্যয়। আল-কুরআনে বর্ণিত যাদের মন জয় করা আবশ্যক' শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর এক অর্থ নওমুসলিম হতে পারে। নও-মুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের পরপরই আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের সে সমস্যা সমাধান কল্পে এ অর্থ ব্যয়িত হতে পারে। আবার যাদের ইসলামের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তাদের মন আকর্ষণের ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যেতে পারে। কিংবা মুসলমানদের উপর কোথাও অত্যাচার হলে এবং তা অর্থ-সম্পদ দ্বারা বন্ধ করা সম্ভব হলে সেখানেও এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

এক কথায় দ্বীনি উম্মত হিসেবে মুসলমানদের সংরক্ষণের জন্য এ খাতে অর্থ ব্যয় করা হবে।

৫. ক্রীতদাস মুক্তকরণ ঃ দাস-প্রথার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। ইসলাম দাস প্রথা বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয় এবং সরকারী অর্থের সাহায্যে এর মুলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করে। যাকাতের অর্থ ক্রীতদাসদের মুক্তিবিধানের জন্য ব্যয়িত হতে পারে। তাছাড়া কাফিরদের সাথে সংগ্রামে বন্দী হওয়া মুসলিম মুজাহিদগণের মুক্ত করার জন্য এখাত থেকে অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. ঋণগ্রস্ততের সহযোগিতা ঃ যাকাতের অর্থ দু' ধরনের ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। যারা নিজেদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পূর্ণ করার ব্যাপারে ঋণ করে। দ্বিতীয়তঃ সে সব লোক, যারা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ নেয়। এ উভয় প্রকার ঋনগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতের প্রভাব অনস্বীকার্য।

৭. ইসলামের প্রচার ও সমাজ জীবনে তার বাস্তবায়ন ঃ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হবে। আল্লাহর রাস্তা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যেসব ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের প্রচার-প্রসার, ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভব্য সে সব খাতই এর অর্ন্তভুক্ত।

৮. নিঃস্ব পথিকদের পাথেয় সংস্থান ঃ যারা সৎ উদ্দেশ্য বা দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের সম্পদ থেকে এমন পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে তাদের আকস্মিক প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং স্বগৃহে ফিরে আসতে পারে। এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে চায় কিন্তু অর্থাভাবে যেতে পারে না এরূপ লোকদের ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমালের থেকে এ অংশের অর্থ থেকে যাতায়াত খরচ প্রদান করবে।

এম. এ. হামিদ আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে যাকাতের প্রভাব বর্ণনা করতে যেয়ে নিম্নোক্ত বিশেষ কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

১. দারিদ্র্য বিমোচন ঃ যাকাতের অর্থ আদায় এবং তার পরিকল্পিত ও যথাযথ ব্যবহার হলে দারিদ্র্য বিমোচনে তার প্রভাব পড়বেই। কয়েকটি দেশের সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, যাকাতের মাধ্যমে সেসব দেশের বার্ষিক মোট দেশীয় আয়ের ৩%-৪% পর্যন্ত ধনীদের থেকে গরীবদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

২. বণ্টন ঃ যাকাত ধনীদের থেকে দরিদ্রের নিকট হস্তান্তরিত আয়। সকল ইসলামি অর্থনীতিবিদ একমত যে, যাকাত যদি যথাযথভাবে আদায় ও বন্টিত হয় তবে তা মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর নির্বিশেষে বিরাজমান মারাত্মক আয় ও ধনবণ্টন বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

৩. ভোগ ঃ যাকাত যেহেতু ধনীদের (যাদের MPC বা প্রান্তিক ভোগ প্রবনতা কম) কাছ থেকে দরিদ্রদের (যাদের MPC বেশী) কাছে হস্তান্তর আয় সেহেতু অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়ের ফলে সামাজিক ভোগব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৪. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঃ যদি বিনিয়োগ করার জন্য উদ্যোগ না থাকে তবে ক্রমাগত যাকাত প্রদানের ফলে এক সময় সম্পদ হ্রাস পেয়ে নিসাবের নিচে চলে আসবে। যাকাতের এই শান্তিধর্মী প্রকৃতি মানুষকে তার সম্পদ অব্যবহৃত বা অলসভাবে ফেলে না রেখে উৎপাদনমূলক বা অন্য কোন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। এর নীট ফল সম্পদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, নেতিবাচক নয়।

৫. স্থিতিশীলতা ঃ যাকাতের মাধ্যমে যদি পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায় তাহলে তার অংশবিশেষ চক্র-বিরোধী কৌশল ব্যবহারের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এ জন্য ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রাস্ফীতির চাপের সময়ে যাকাতের অর্থের বৃহত্তম অংশ মূলধনী পণ্য আকারে বিতরণ এবং মুদ্রা সংকোচনের সময় ভোগদ্রব্য বা নগদ আকারেই তা বিতরণের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। অবশ্য এটা একেবারেই বিশেষ এক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাত শব্দের অর্থ হল-

ক. ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া
খ. পরিমাণে বেশি হওয়া
গ. পবিত্র করা
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

২. যাকাত আদায় যুক্ত সম্পদ কোনটি ?

ক. পানির নিচের মাছ
খ. বাগানের অপরিক্ক ফল
গ. ব্যবসায়ী পণ্য
ঘ. সবকয়টি উত্তর ভুল।

৩. উটের যাকাতের নিসাব কতো ?

ক. ৫টি
খ. ১৫টি
গ. ৭টি
ঘ. ১০টি।

৪. যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত ক'টি ?

ক. ৭টি
খ. ৪টি
গ. ৩টি
ঘ. ৫টি।

৫. যাকাত ব্যয়ের খাত ক'টি ?

ক. ৭টি
খ. ৬টি
গ. ৮টি
ঘ. ৫টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
২. যাকাত আদায়যুক্ত সম্পদ কী কী ? লিখুন।
৩. গবাদি পশুর যাকাত লিখুন।
৪. যাকাত ব্যয়ের খাত ক'টি ও কী কী ? লিখুন।
৫. যাকাতের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে এম এ মান্নানের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাতের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

ফসলের যাকাত ঃ উশর ও খারাজ

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-
- ভূমির প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারেন।
- ভূমি রাজস্বের আইনগত ভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন।
- উশর ও নিসফুল উশর সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- খারাজ ও উশরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে খন্ড খন্ড ভূমি ভোগ দখলের মালিক হলেও ইসলামি রাষ্ট্র আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে। তাই খলিফার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও অধিকার বিরাজমান। ফলে জনসাধারণকে ভূমি ভোগের বিনিময়ে এক ধরনের কর প্রদান করা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেমন ভোগকারীর উপর কর্তব্য, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও অনুরূপ কর্তব্য।

ভূমির প্রকারভেদ
ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমিকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়- উশরি জমি ও খারাজী জমি।

উশরি জমি
যে জমির মালিক মুসলমান অথবা মুসলমানই যে জমি সর্ব প্রথম আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে, অথবা যথারীতি যুদ্ধ করে যে সব জমি মুসলমানগণ দখল করেছে, এক কথায় যে জমির মালিক মুসলমান তা উশরি হিসেবে গণ্য।

খারাজী জমি
আর যে সকল জমির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমগণই যে জমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে অথবা ইসলামি রাষ্ট্র যেসব জমি অমুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে লাভ করার পর তাদের মতামত নিয়ে তাদেরকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তর করে দিয়েছে তা সবই 'খারাজী' জমি হিসেবে স্বীকৃত।

উশরি ও খারাজীর নামকরণ
'উশর' শব্দটি আরবী। এর অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ। মুসলমানদের চাষাবাদকৃত জমিতে ফসলের এক-দশমাংশ (উশর) বা এক-দশমাংশের অর্ধেক (নিসফুল উশর) পরিমাণ রাজস্ব গ্রহণ করা হয় বলে একে ওশরি জমি বলে।
আর 'খারাজ' শব্দটি আরবী শব্দ। খারাজা থেকে উৎপত্তি। খারাজা শব্দের অর্থ হল 'কর'। যেহেতু অমুসলিমদের জমির উপর 'কর' ধার্য করা হয় তাদেরকে ফসলের অংশ বিশেষ কর হিসেবে দিতে হয় না তাই তাদের ভোগকৃত জমিকে খারাজি জমি বলে। তবে অমুসলিমদের যে সব জমি মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তা যদি মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে ফসলের অংশ বিশেষের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বর্গা চাষের জন্য প্রদান করে তাহলে অমুসলিমগণ ফসলের অংশ বিশেষ ইসলামি রাষ্ট্রকে প্রদান করবে। খাইবারের দখলকৃত জমিতে মহানবী (সা) তাই করেছেন।

ভূমি রাজস্বের আইনগত ভিত্তি
ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হিসেবে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য করা হয়। আল্লাহ তাআলা ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলেন-

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ.

"তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

এ আয়াতের প্রথম অংশ হতে প্রমাণিত হয় যে, যাবতীয় নগদ ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সার উপর যাকাত ফরয হয়। শেষাংশ হতে ভূমি রাজস্ব বা উশর দেয়ার আদেশ প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের জমি থেকে রাজস্ব হিসেবে যে ফসল নেওয়া হয় তা ভূমির যাকাত হিসেবে গণ্য।
ভূমি রাজস্ব আদায় করার আদেশ নিম্নলিখিত আয়াতে অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন-

كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

"যখন তা ফলবান হয় তখন এর ফল আহার করবে আর ফল তোলার দিনে এর হক আদায় করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনয়াম : ১৪১)

এখানে 'হক' অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিনিময়। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুল মালে এটা আদায় করতে হবে।

ভূমি রাজস্বের প্রকার

ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমি থেকে তিন ধরনের রাজস্ব আদায় করা হয়। যেমন- (১) উশর, (২) নিসফুল উশর, (৩) খারাজ।

উশর

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ওশর মানে এক-দশমাংশ। মুসলমানরা যে সকল জমির মালিক এবং যা আবাদ ও চাষোপযোগী করা হয়েছে। চাষাবাদ করার সময় নিজের খরচে সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়নি বরং উক্ত জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা নদীর পানিতে সেচের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এ ধরনের জমিতে ওশর বা এক-দশমাংশ ফসল ইসলামি সরকারকে ভূমি রাজস্ব হিসেবে দিতে হয়। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন-

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى والنصح نصف العشر.

যে সকল জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা খালের পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যা স্বতই সিক্ত হয়ে থাকে সে জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ এবং যে জমি পানি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তার বিশ ভাগের একভাগ ফসল রাজস্বরূপে দিতে হবে। (আবূ দাউদ)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নবী করীম (সা) যে নিয়োগ পত্র দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন-

إن فيما سقت السماء أو تسقى غيلا العشر و فيما سقى بالعرب والدلية نصف العشر.

মুসলমানদের জমি হতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ রাজস্ববাবদ আদায় করবে। এ রাজস্ব সে জমি হতে গ্রহণ করা হবে, যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিকভাবে সিক্ত হয়, কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে বালতি ইত্যাদি দ্বারা পানি দিতে হয় তা হতে এক-দশমাংশের অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ) রাজস্ব বাবদ আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে হেমইয়ার-এর রাজার নিকট প্রেরিত ফরমানেও রাসূল (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর, নামায পড়, যাকাত দাও, গনীমতের মাল হতে এক-দশমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য আদায় কর। এতদ্ব্যতীত ভূমি রাজস্বও দিতে থাক। যে ভূমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে বিনা পরিশ্রমে ও অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত সিক্ত হয়, তার এক-দশমাংশ ফসল এবং সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সিক্ত জমির বিশ ভাগের একভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায় করতে থাক।

নবী করীম (সা) হযরত মায়ায ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামেনের ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং খেজুর, গম, যব, আংগুর বা কিশমিশ হতে এক-দশমাংশ বা তার অর্ধেক রাজস্ব বাবদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধান, গম, ভুট্টা, কিশমিশ ইত্যাদির ন্যায় শবজি ও বাগানের অন্যান্য গাছ গাছালীও এর আওতাভুক্ত। কারণ রাসূল (সা) বরেছেন-

ما أخرجته الأرض فيه العشر.

জমিতে যাই উৎপাদিত হবে তাতেই এক-দশমাংশ রাজস্ব ধার্য হবে। এমনকি জমির ফসলের ফুল থেকে উৎপাদিত মধুতেও রাজস্ব হিসেবে উশর আদায় করতে হবে। কেননা রাসূল (সা) মধু থেকেও উশর আদায় করেছেন।

নিসফুল উশর

মুসলমানদের ভোগকৃত এক ধরনের জমি আছে যাতে ফসল উৎপন্ন করতে নিজের খরচে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। এ ধরনের জমির উৎপাদিত ফসলের নিসফুল উশর বা উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ রাজস্ব আদায় করতে হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন-

و فيما سقى بالسوانى نصف العشر.

যে জমি কোন প্রকারের সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয় তার বিশভাগের একভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব হিসেবে দিতে হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জমি নিসফুল উশর জাতীয় জমি। অর্থাৎ যেহেতু আমাদের দেশের উৎপাদিত ফসলে সাধারণতঃ কৃষক নিজের তত্ত্বাবধানে পানি সেচ করে, সার ও কীটনাষক ঔষধ প্রদান করে তাই এতে বিশ ভাগের একভাগ রাজস্ব দেয়া ওয়াজিব। তবে আমন ধান ও বেশ কিছু ফলফলাদি উৎপাদনে কৃষককে ভূমিতে কোন সেচ করতে হয় না সে সব ফসলে দশভাগের এক ভাগ ভূমি রাজস্ব দিতে হবে।

বর্তমানে জমির যে ভূমি রাজস্ব আমাদের দেশে চালু আছে তা ইসলামি অর্থনীতিতে নিসফুল উশরের পরিপূরক নয়।

পার্থকের কারণ

মুসলমানদেরকে উপরে বর্ণিত দু'ধরনের জমির ওপর উশর এবং নিসফুল উশর রাজস্ব প্রদান করতে হয়। এ পার্থক্যের কারণ বর্ণনায় ইসলামি আইনবিদগণ বলেন-

لأن المؤنة تكثر فيه و تقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا.

"কারণ শেষোক্ত জমিতে অধিক শ্রম নিয়োগ করতে হয় ; কিন্তু প্রথম প্রকার জমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিকভাবেই সিক্ত হয় বলে তাতে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়।"

এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী বলেন- যে জমিতে ফসল ফলাতে শ্রম ব্যয় কম হয় এবং লাভ বেশী হয় তাতে নবী করীম (সা) গরীবদের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। আর যে জমিতে ফসল ফলাতে শ্রম ও ব্যয় বেশি হয় সে জমিতে গরীবদের পাওনার পরিমাণ কম করে দিয়েছেন। এ বিধানের মাধ্যমে জমির মালিকদের প্রতি অনুগ্রহ দেখান হয়েছে আর এটিই যুক্তিযুক্ত।

খারাজ

আমরা জানি যে ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হবে তাকে খারাজ বলে।

খারাজের পরিমাণ কি হবে সে ব্যাপারে ফিকহবিদদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। তাই খারাজের পরিমাণ ধার্য করার ভার ইসলামি রাষ্ট্রের উপরই ন্যাস্ত।

সরকার জমির গুণাগুণ বিবেচনা করে সময় ও অবস্থার চাহিদার আলোকে পার্লামেন্টের সাথে আলোচনা করে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাতে কোনভাবেই অমুসলিমদের উপর যুলম না হয়, সেদিকে রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

এজন্যে খারাজের পরিমাণ নির্ণয়ের বেলায় একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তারা অমুসলিমদের সকল জমি জরিপ করবেন, কি কি গুণাগুণ সম্পন্ন জমি আছে তার পার্থক্য করবেন, উর্বরতার পার্থক্য দেখবেন, প্রয়োজনীয় চাষের পরিমাণের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এমনকি পানি সেচের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ রাখবেন। কোন জমিতে কি পরিমাণ খারাজ (রাজস্ব) নির্ধারণ করলে প্রজাদের উপর অন্যায় করা হবে না তার একটি সুপারিশ উক্ত কমিটি সরকারকে পেশ করবেন। আর সে আলোকে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অমুসলিমদের ভূমি রাজস্ব বা খারাজ টাকার মাধ্যমে যেমন গ্রহণ করা যেতে পারে অনুরূপভাবে সরকার ইচ্ছে করলে তা ফসলের মাধ্যমেও গ্রহণ করতে পারে। তবে খারাজ আদায়ের জন্য এমন সময় নির্ধারণ করবেন যাতে প্রজাদের রাজস্ব আদায়ে কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

ওশর ও খারাজের পার্থক্য

১. খারাজ আদায় করা হয় জমির ওপর এবং উশর আদায় করা হয় জমির উৎপন্ন ফসল হতে। একাধিক সহোদর ভাইয়ের কোন 'এজমালি' জমি থাকলে এবং তাদের কেউ কেউ ইসলামে দীক্ষিত হলে- তখন ভূমি রাজস্ব অনুরূপভাবে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমানের অংশ হতে উশর এবং অমুসলিমের অংশ হতে খারাজ আদায় করা হবে।

মুসলমানদের জমি হতে 'উশর' এবং অমুসলিমদের জমি হতে 'খারাজ' আদায় করার ব্যাপারে কোনরূপ জোর-যুলম, অবিচার কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকগণই প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সে জন্য তাদেরকে অন্যান্য দায়িত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে অর্থ দানের দায়িত্ব পালন করতে হয় কাজেই জমির রাজস্বের দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য হলেও মোটামুটিভাবে মুসলমানকেই অধিক পরিমাণে অর্থ দান করতে হয়।

২. 'উশর' কখনোই কোন অবস্থায়ই রহিত হতে পারে না। তার পরিমাণ চির-নির্দিষ্ট এবং তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ নেই। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তা হতে কাউকে নিস্কৃতি দিতে পারেন না। কারণ এটি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কিন্তু প্রয়োজন হলে এবং উপযুক্ত কারণ থাকলে খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা, এমনকি অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়ার পূর্ণ অধিকারও রাষ্ট্রপ্রধানের রয়েছে।

৩. খারাজ বৎসরে একবার আদায় করা হয়, কিন্তু উশর আদায় করা হয় প্রত্যেক ফসল হতে। বৎসরের মধ্যে যত প্রকারের ফসল যতবার ফলবে, সকল প্রকার ফসলের উপর ততবারই 'উশর' ধার্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রে ভূমিকে ক'ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক. তিন ভাগে খ. দুই ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. সাত ভাগে।

২. উশর শব্দের অর্থ হচ্ছে-

ক. বিশ ভাগের এক ভাগ খ. দশ ভাগের এক ভাগ
গ. পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঘ. ছয় ভাগের এক ভাগ।

৩. উশর কার নিকট থেকে আদায় করা হয়?

ক. মুসলমান-অমুসলমান সকলের নিকট হতে খ. শুধু মুসলমানদের নিকট থেকে
গ. শুধু অমুসলমানদের নিকট হতে ঘ. শুধু যিম্মীদের নিকট থেকে।

৪. উশর বছরে ক'বার আদায় করতে হয়?

ক. একবার খ. দুই বার
গ. তিন বার ঘ. যতবার ফসল উৎপন্ন হবে ততোবার।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

ক. উশর ও খারাজ বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
২. ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমি থেকে কয় ধরনের কর আদায় করা হয়? লিখুন।
৩. উশর ও খারাজের মধ্যে পার্থক্য কী? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রে উশর ও খারাজ কা'দের উপর ধার্য করা হয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের মূলনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কোন কোন খাত থেকে সাধারণতঃ ইসলামি রাষ্ট্রের আয় হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যাকাত, ওশর, খারাজ-এর পরিচয় দিতে পারবেন
- অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাকাত, ওশর ও খারাজ-এর গুরূত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় আয়

রাষ্ট্র হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডের জনসমষ্টিকে সুশৃংখল ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বৃহৎ একটি সংগঠনের নাম। রাষ্ট্র নামক এ সংগঠনটি তার উপর অর্পিত জনসাধারণের নানা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য তার অনেক অর্থের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনসাধারণ ও অন্যান্য খাত হতে যে অর্থ আদায় করা হয় তা-ই রাষ্ট্রীয় আয়।

রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রয়োজনীয়তা

একজন ব্যক্তির নিজের জীবনযাত্রা সুষ্ঠরূপে নির্বাহ করার জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হয়। একটি পরিবার পরিচালনার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে একটি সরকারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও দায়িত্ব পালনের জন্যও অর্থ সম্পদের প্রয়োজন। ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য যেমনিভাবে নিজস্ব উপায় পন্থা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রও দেশবাসীর নিকট হতে বিভিন্ন কর আদায় করে থাকে। দেশের অন্যান্য সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে।

রাষ্ট্রীয় আয়ের মূলনীতি

কুরআন ও হাদীসে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আয়ের মূলনীতি কি হবে তা যেমন বলে দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের আয়ের ব্যাপারেও সরকারকে কি কি কাজ করতে হবে তার মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন-

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ.

"আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে এরা সালাত আদায় করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৪১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহতায়ালা রাষ্ট্র বা সরকারকে চার ধরনের কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট খাতের ব্যয় মেটানো সম্ভব।
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামি রাষ্ট্রের আয়-ব্যায় এর মূলনীতি বর্ণনা করত গিয়ে বলেন-

تؤخذ من أغنياءهم وترد فى فقراء هم.

(রাষ্ট্র কর্তৃক) তাদের (জনগণের) ধনীক শ্রেণীর লোকদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং তা গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে। (বুখারী)

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম রাষ্ট্রকে আয় করার অধিকার প্রদান করেছে।

ব্যয়কে স্থায়ী নৈতিক নিয়মে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে কারও উপর কোন প্রকার যুলম করা যাবে না। রাজস্ব আদায় করতে ন্যায়-পরায়ণতার প্রতি ইসলামি রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) -এর একটি বক্তব্যে উক্ত মূলনীতির প্রকাশ পায়। তিনি বলেন-

و إنى لا آخذ هذا المال يصله إلا لخصال ثلاث أن يؤخذ بالحق و يعطى بالحق و يمنع من الباطل

তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোন অধিকার নেই। (১) সত্য ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে তা গ্রহণ করা। (২) ন্যায়-পথে তা ব্যয় করা। (৩) তাকে সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখা (কিতাবুল হারাম-১১০)

ইসলামি রাষ্ট্র শুধু ব্যয় বহনের জন্যই আয় করে না, বরং দেশের গরীব, দুঃখী ও অভাবগ্রস্থ মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা, বেকারত্ব দ র করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঋণীগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করার জন্য আয়ের ব্যবস্থা করে।

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস দু'ধরনের হতে পারে-
প্রথমতঃ ইসলামি শরীয়াত তথা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত আয়।
দ্বিতীয়ঃ শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নয়, তবে সমর্থন যোগ্য এমন আয়।

শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত আয়ঃ

যে সব আয় ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারন করা হয়েছে তা হল-
১। যাকাত-
২। ওশর বা এক দশমাংশ
৩। ওশরের অর্ধেক বা এক বিশমাংশ
৪। খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ
৫। সাদকাতুল ফিতর
৬। মালিকানা বিহীন সম্পদ

শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নয় তবে শরীয়াত কর্তৃক সমর্থিত আয়ের মধ্যে পড়ে এমন আয়-

১। খারাজ বা অমুসলিমদের ভূমি থেকে আদায়কৃত কর
২। জিযিয়া বা অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর
৩। আমদানী শুল্ক
৪। জরুরি প্রয়োজনে নির্ধারিত কর
৫। সামরিক কর
৬। ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়।

প্রথম প্রকার আয়ের উৎসসমূহের বিশ্লেষণ

যাকাত

জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান এর ব্যবস্থা করা ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া দারিদ্র বিমোচন, জনগণের কল্যাণ সাধন তার প্রধান কাজ। এ কাজগুলো সম্পাদন করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার চাহিদা মেটাতে যাকাত হচেছ প্রধান উৎস।

কোন ব্যক্তির নিকট যদি পারিবারিক প্রয়োজন বাদ দিয়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে এবং এক বছর তার নিকট জমা থাকে তবে উক্ত অর্থের আড়াই ভাগ যাকাত হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রদান করা তার উপর ফরয।
আল্লাহ বলেন-

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করবে।" (সুরা আত্-তাওবা : ১০৩)

রাসূল (সা) আল্লাহর নির্দেশের সার্বিক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইয়ামেনের গভর্ণর মু'আয ইবনে জ্বাবাল (রা) কে বলেন, تؤخذ من أغنياءهم وتردفى فقراءهم

"তাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে আর তা তাদেরই গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করবে।" (বুখারী)

যে সকল ব্যক্তি ও সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে

যাকাত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার। আল্লাহতা'আলা শুধু ধনীদের সম্পদে যাকাত ধার্য করেছেন। ধনী বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার কাছে ব্যক্তি ও পরিবারিক খরচ বহন এবং ঋণের দায় শোধের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের বাজার মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে এবং তা ১ বছর পর্যন্ত তার হাতে বা ব্যাংকে জমা থাকে। এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য করা হবে এবং তা আদায় করা হবে।

প্রধানতঃ দু'ধরনের সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করা হবে। (১) যা প্রকাশ্যভাবে যাচাই করা যায় এমন সম্পদ যথা- গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। (২) যা প্রকাশ্যভাবে যাচাই করা যায় না এমন সম্পদ- যথা- স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ ও ব্যাবসায়িক পণ্য ইত্যাদি।

ওশর (এক দশমাংশ)

ওশর (عشر) আরবী শব্দ। শাব্দিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ বা দশভাগের এক ভগ।

ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায়, মুসলমানদের যে সকল জমি বৃষ্টি, ঝর্নাধারা, নদী ও খালের পানিতে সিক্ত হয়, কিংবা এমনিতেই সিক্ত থাকার ফলে ফসল ও ফলফলাদি উৎপন্ন হয় আর তাতে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যাবহার করে পানি সেচ করার প্রয়োজন হয় না। উক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ গরীবদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর নাম হল ওশর।

ওশর ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান একটি উৎস। ইসলামি রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের মাধ্যমে ওশর আদায়ের ব্যবস্থা করবেন।

নিসফুল ওশর (এক বিশমাংশ)

নিসফ (نصف) মানে অর্ধেক। আর ওশর মানে এক দশমাংশ। একত্রে শব্দ দুটোর অর্থ দাড়ায় এক দশমাংশের অর্ধেক বা বিশ ভাগের একভাগ।

সাধারণত যে সব জমিতে ফসল ও ফলফলাদি উৎপাদন করতে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সেচ দেয়া হয় এবং গোরব রাসায়নিক সার ও কিটনাশক ঔষধ ব্যবহার করে ফসল উৎপন্ন করা হয়। সে সব জমিতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদির বিশ ভাগের একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য আদায় করা হয়।

খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ

ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কিছু কিছু সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বা খুমুস রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য আদায় করতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ সকল সম্পদের মধ্যে গনিমতের মাল, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, মাটির নীচ থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত সম্পদ উল্লেখযোগ্য।

গনীমতের মালঃ শত্রূ পক্ষের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামি রাষ্ট্রের সৈনিকগণ যে ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র লাভ করে থাকেন, ইসলামি পরিভাষায় তাকে গনীমতের মাল (Booty) বলা হয়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন-

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل

"জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।" (সূরা আল-আনফাল-৪১)

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের যে সব ধন-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র যানবাহন ও খাদ্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হবে, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবী ও নিঃসম্বল পথিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করা হবে।

ইসলামের প্রথম দিকে সৈনিকদের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা ছিল না। গনীমতের মালের চার-পঞ্চমাংশই তাদের মধ্যে বণ্টন করা হত। বর্তমান যুগে যেখানে সৈনিকদের বেতন নির্দিষ্ট রয়েছে সেখানে গনীমতের মাল তাদের মধ্যে বণ্টন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ সম্পদ সৈনিকদের বেতন বাবদ খরচ করার জন্য সরকারী কোষাগারে জমা রাখা হবে।

খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ বলতে মাটির নিচে প্রাপ্ত ঐ সকল সম্পদ যা আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করে রেখেছেন, মানুষ নিজেরা পুতে রাখেনি। সে খনিজ সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসা, দস্তা, তেল, গ্যাস, কয়লা ইদত্যাদি যাই হোকনা কেন তার কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় আয়ের জন্য আদায় করতে হবে।
ইমাম আবু ইউসুফ (র) লিখেছেন-

كل ما أصيب فى المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص فإن فى ذلك الخمس.

"এভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে (এক-পঞ্চমাংশ) রাজস্ব আদায় করতে হবে।"

মূলত জমির মালিক নিজস্ব খরচে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করার বেলায় ইসলামি অর্থনীতিতে উল্লিখিত বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খনিজ সম্পদের রয়ালটি নির্ধারণ করা ইসলামি রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান যুগে খনিজ সম্পদের অবস্থা একইরূপ নয় এবং উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও এক রকম হয় না। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের বিভিন্নতার দরুন মূল্যের দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এমন কি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়ও সকল খনিতে সমান হয় না। কাজেই প্রত্যেকটি খনিজ 'রয়ালটি'র কোন স্থায়ী পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয়। এর পরিমাণ নির্ধারণের ভার ইসলামি রাষ্ট্রের উপরই ন্যাস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজনে সরকার খনিজ সম্পদের সংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে তার পুরোটাই রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদ

সকল প্রকার সামুদ্রিক সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। সামুদ্রিক সম্পদ বিশেষ করে মৎস্য, মুক্তা আহরনের উপর কর ধার্য হতে পারে। হযরত উমর (রা) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করেন এবং তা যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। কোন এক কর্মচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলন 'সমুদ্র হতে আহরিত সকল দ্রব্য হতেই রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে। কারণ, এটাও আল্লাহ তাআলারই একটি দান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ মতই পোষণ করতেন। নদী, ঝিল, বিল ইত্যাদি হতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে যে মৎস্য উৎপাদন করা হয় তারও এক-পঞ্চমাংশ ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রাপ্য হবে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের মতেও জলভাগ হতে যা কিছু উৎপন্ন হবে, তা হতেও রাজস্ব আদায় করতে হবে। কারণ তা স্থলভাগের খনিজ সম্পদেরই সমতুল্য।

فيما أخرج الله من البحر الخمس.

'আল্লাহ তাআলা সমুদ্রে যে সমস্থ সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তা হতে রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে।'

ভূ-গর্ভে গচ্ছিত সম্পদ

"ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদ" অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পুতে রেখে যাওয়া সম্পদ যা মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা ভাল করে জানে না। পরবর্তীতে কেউ তার সন্ধান পেল এবং তা উত্তোলন করল। এ ধরনের সম্পদও ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হবে। এ ধরনের সম্পদকে "রিকায" বলে। আল্লাহর রাসূল এর উপর ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য এক পঞ্চামাংশ কর নির্ধারণ করেছেন। রাসূল (স.) বলেন- و فى الركاز الخمس "রিকায বা ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।"

সাদাকাতুল ফিতর

রমযান শেষে ঈদের দিন ধনী ব্যক্তিগণ গরীবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা তার মূল্য বণ্টন করে থাকেন তাকে সাদকাতুল ফিতর বলে। এ সাদকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হতে আদায় করতে বাধ্য। ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটাকেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রা) লিখেছেন- 'ইসলামি খিলাফতের যুগে এ সাদকাও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হত এবং তা হতে পরিকল্পনানুযায়ী নির্দিষ্ট এলাকার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হত।'

মালিকানাহীন সম্পদ

ইসলামি রাষ্ট্র সমগ্রদেশের সকল নাগরিকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। অতএব দেশের যে সব ধন-সম্পদের কোন মালিক বা উত্তরাধিকারী নেই, তার মালিক হবে ইসলামি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা জমা হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই তা ব্যয় করা হবে। হযরত উমর ফারূক (রা) মিসরের শাসনকর্তার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 'যে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী নেই তার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি বায়তুলমালে জমা হবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন -

أنا وارث من لا وارث له أرثه و أعقل عنه.

"যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী আমি। আমি-ই তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি পাব এবং তার পক্ষ হতে দায়িত্ব পালন করব। (কিতাবুল আমওয়াল-২২১)

বস্তুত নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই এ কথা ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং এ সম্পদ রাষ্ট্রের। হযরত উমর ফারূক ও (রা) এরূপ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

من كان له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه و من لم يكن له عقب فاجعل ما له فى بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين.

"যার উত্তরাধিকারী থাকবে, মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন কর। আর যার উত্তরাধিকারীরূপে পশ্চাতে কেউ নেই, তার ধন-সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দাও। (ফুতূহু মিসর ওআখবারূহা)

যেসব পড়ে থাকা মাল কোথাও পাওয়া যাবে এবং যার মালিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাও অনুরূপভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হবে।

দ্বিতীয় প্রকার আয়ের উৎসসমূহের বিশ্লেষণ

ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য যে সকল আয়ের উৎস রয়েছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারে এমন কিছু খাত রয়েছে যার পরিমাণ আল্লাহ তাআলা কিংবা রাসূল (স) নির্ধারণ করে যান নি। তা নির্ধারণের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। সময় ও অবস্থার চাহিদার আলোকে ইসলামি সরকার তার পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কর নির্ধারণের মৌলিক নীতি অবশ্যই অনুসরণ করা হবে। উক্ত খাতগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

খারাজ বা অমুসলিমদের ভূমি রাজস্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহের অন্যতম হচ্ছে خراج (খারাজ)। খারাজ শব্দটি মূলত ফারসী থেকে এসে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। শব্দটির অর্থ হল Tax (ট্যাক্স) বা কর।

ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায়, খারাজ বলতে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল. খারাজের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। ইসলামি রাষ্ট্রই খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর নির্ধারণে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে কারো উপর অন্যায় না হয়।

বিশেষজ্ঞ একটি টিম গঠন করে তাদের মাধ্যমে খারাজ-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ, গুণাগুণ ও উর্বরতা, পানি সেচের আবশ্যকতা ও অন্যাবশ্যকতার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (বিস্তারিত ৩য় পাঠে)

জিযিয়া বা অমুসলমানদের উপর ধার্যকৃত কর

জিযিয়া কর ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের আর একটি প্রধান উৎস। ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হবে। ইসলামের অর্থনৈতিক পরিভাষায় তাকে 'জিযিয়া কর' বলে। 'জিযিয়া কর' অর্থ 'বিনিময়'; রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে, তাই-এর বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্র কর আদায় করার অধিকার রাখে। 'জিযিয়া' অনুরূপ একটি কর। কুরআন মাজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

"যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে নিযিয়া দেয়।" (সূরা আত্-তাওবাহ : ২৯)

অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দু'টি কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় আর্থিক প্রয়োজন পুরণের জন্য সাধ্যানুসারে নির্ধারিত কর প্রদান করা।

বাহ্যত মনে হতে পারে যে, জিযিয়া কর নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলমানদের প্রতি সমান আচরণ করেনি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলামি রাষ্ট্রকে হেফাজত করা, তার কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মূল দায়িত্ব মুসলমানদের উপর, তা সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রের ব্যয় মেটাতে ওশর, নিসফ (অর্ধ) ওশর ইত্যাদি কর প্রদান ছাড়াও যাকাত প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনে নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অমুসলিমদের উপর যাকাত নেই, দেশ রক্ষার কাজে তারা কোন অর্থ ব্যয় কিংবা জীবন দান করেনা অথচ দেশের সার্বিক সুবিধা তারাও ভোগ করে। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সমতা নিয়ে আসার জন্য তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে।

জিযিয়া করের পরিমাণ ইসলামি আইনে নির্ধারিত নেই। এটা রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত। অবস্থা ও চাহিদার আলোকে এ করের পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে।

জিযিয়া সাধারণত মুদ্রায় আদায় করা হবে। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশেষ কোন শিল্পপণ্যের আকারেও তা আদায় করা অসংগত হবে না। নবী করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট হতে জিযিয়া বাবদ শিল্পপণ্যও গ্রহণ করেছেন।

ব্যবসা পণ্যে ধার্যকৃত কর

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন এবং বৈদেশিক শিল্পপণ্যের আমদানীকে নিরূৎসাহিত করার চেষ্টা করে থাকে। ইসলামি রাষ্ট্রকে এজন্য সর্বপ্রথম বৈদেশিক পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার উপর শুল্ক ধার্য করতে হয়। অনুরূপভাবে অন্য রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে এবং অর্থ বিনিয়োগ করবে তাদের উপরও এ শুল্ক ধার্য করা হবে। কারণ তাদের জানমাল ও ব্যবসা বাণিজ্যের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের উপর অর্পিত এবং এ দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে তাকে অবশ্যই প্রয়োজনী শুল্ক আদায় করতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সময়ই এ শুল্ক সর্বপ্রথম ধার্য হয়েছিল। বস্তুত এ শুল্ক প্রদান করেই বিদেশী নাগরিকগণ ইসলামি রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

এ ধরনের করের পরিমান- অবস্থা, সম্পদ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামি রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। আর আদায়কৃত শুল্ক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

জরুরি প্রয়োজনে নির্ধারিত কর

ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগার বিশেষ সময় বা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে পড়ে ; কিংবা ব্যয় অপেক্ষা আয় কমে যায়। জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে যেমন কোন নতুন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অথবা সকল প্রকার আয়ের পরেও রাজ্যের সকল মানুষের মৌলিক

চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব না হয়; বা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ইসলামি রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (সা) যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করার পরও আকস্মিকভাবে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং মুসলমানদের কাছে তিনি সে জন্য অর্থ সাহায্যের দাবি পেশ করেন।

সাময়িক কর

সাধারণত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধানের জন্য এবং দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বায়তুলমালে সম্পদ জমা থাকলে জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা ঠিক নয়। তবে দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি ইসলামি রাষ্ট্রে অর্থের খুবই প্রয়োজন হয় এবং বায়তুলমালে সম্পদের ঘাটতি পড়ে তখন জনগণের সম্পদের উপর যে কর নির্ধারণ করা হয় তাকে সাময়িক কর বলে।

ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়

সাধারণভাবে রাষ্ট্রের যে আয় হয়ে থাকে, সেই অনুসারেই রাষ্ট্রের যাবতীয় খরচ বহন করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য জরুরি পরিস্থিতিতে আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরি কর ধার্য করে তা পূরণ করতে হয়। কিন্তু তাতেও যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয় তখন সরকারকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন ঃ

১। ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের মধ্যে পড়ে
ক. শুধু উশর (১০ ভাগের ১ ভাগ); খ. শুধু জিযিয়া কর;
গ. শুধু যাকাত; ঘ. সব উত্তরই সঠিক।

২. মুসলমানদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর যে রাজস্ব ধার্য করা হয় তাকে বলা হয়-
ক. উশর; খ. খুমুস;
গ. খারাজ; ঘ. জিযিয়া।

৩. যাকাত হল;
ক. একটি চাঁদা বিশেষ; খ. একটি কর বিশেষ;
গ. সম্পদ সম্পির্কত ইবাদাত; ঘ. জমির ফসলের উপর ধার্যকৃত রাজস্ব যা প্রদান করা ইবাদত।

৪. সামুদ্রিক সম্পদে করের পরিমাণ হচ্ছে-
ক. উশর বা এক দশমাংশ; খ. খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ;
গ. শতকরা আড়াই ভাগ; ঘ. অর্ধেক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি কী ? লিখুন।
৩. ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস কী কী ? বর্ণনা দিন।
৪. যাকাত কী ? যাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস-প্রমাণ করুন।
৫. উশর বলতে কী বুঝায় ? কি ধরনের ফসলের উশর দিতে হয় ?
৬. খারাজ কী ? কারা কিসের ভিত্তিতে ইসলামি রাষ্ট্রকে খারাজ প্রদান করবে ?
৭. জিযিয়া বলতে কী বুঝায় ? জিযিয়া কা'দের উপর ধার্য করা হয় এবং কেন ?
৮. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ কী বৈধ ?
৯. সাময়িক কর কখন গ্রহণ করা হয়?
১০. কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি কী?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. ইসলামি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত আয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৩. শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত আয়সমূহ সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ৬

ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যায়ন করে আপনি—

- ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিধি কি তা বলতে পারবেন;
- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনা করতে পারবেন;
- রাষ্ট্র প্রধান ও পরামর্শসভা কর্তৃক ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্র মূলত তার ব্যয়, নির্বাহ করার জন্যই আয় করে থাকে। তাই ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাত আলোচনার পূর্বে প্রথমেই জানা দরকার ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিধি কতটুকু ? অন্য কথায় বলা যায় ইসলামি রাষ্ট্রের এমন কি কি দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করতে সরকারের অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হয়।

সম্পদ বন্টনে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নিম্নে বর্ণিত ১১ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১. দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করা ও সে অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

২. দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা, সে জন্য শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم .

''তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রুদের ভীতিপ্রদর্শন করবে এবং তোমাদের শত্রুদেরও।" (সূরা আল-আনফাল : ৬০)

৩. অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সেজন্য পুলিশ ও দেশরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা, সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার পরিচালনা করা।

৪. দেশবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, অভাব-অভিযোগ ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, খরা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা।

৫. সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, উত্তরাধিকার আইন কার্যকরকরণ, সামাজিক জটিলতার মীমাংসাকরণ। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, বিনামূল্যে শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা।

৬. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যেমন-রাস্তা-ঘাট, পুল-রেললাইন, বিমানপথ, নির্মাণ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইনসহ সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম স্থাপণ করা ইত্যাদি।

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমদানী-রফতানীর জন্য সামুদ্রিক যান বাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক-স্তম্ভ ও বিমানঘাটি স্থাপন করা।

৮. কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেচের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন, বড় বড় পুকুর, খাল-নদী ও কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ করা, আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী ও সার প্রয়োগে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা।

৯. প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন, জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করতে পারে।

১০. পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল মিত্র দেশে রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন, দেশ-বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন করা, যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাত বা গাছ তলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য না হয়।

১১. ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান ; কৃষক, মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা।

ব্যয়-নীতি

দেশের সার্বিক ব্যায় নির্বাহ করার জন্য রাজকোষে জনগণের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থসম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের এ অর্থ ইচ্ছেমত ব্যয় করার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যে মূলনীতি প্রদান করেছে তা হলো-

ব্যয়নীতি হবে অত্যন্ত সুষ্ঠু, সংযত ও সুবিচারপূর্ণ। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতকর্তা, বিচক্ষণতা, সামগ্রিক সামঞ্জস্য ও মিতব্যয়িতা রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্র প্রধানসহ সরকারের মৌলিক দায়িত্ব।

ব্যয়ের খাতসমূহ

একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে জনকল্যাণের জন্য যত ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি রাষ্ট্রকে পালন করা প্রয়োজন তার সকল খাতেই ইসলামি ব্যয়নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র তার সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করতে পারবে। তবে ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের এমন কিছু আয়ের খাত রয়েছে যেগুলো সরকার নিজের ইচ্ছেমত যে কোন খাতে ব্যয় করতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব বিচারে ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আল-কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত ব্যয়ের খাত
২. অনির্ধারিত ব্যয়ের খাত।

আল-কুরআনের নির্ধারিত ব্যয়ের খাত

ইসলামি রাষ্ট্রের যত আয় হয়ে থাকে তার মাত্র তিন ধরনের আয় যেমন- গনীমতের মাল, ফাই বা বিনা যুদ্ধে লব্দ ধন-সম্পদ, যাকাত- এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যান্য খাতের আয় ইসলামি রাষ্ট্র পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ক্রমে জনকল্যাণমূলক যে কোন বৈধ খাতে ব্যয় করতে পারবে।

এখানে প্রথমে আল-কুরআনে বর্ণিত খাতগুলো উল্লেখ করা হল-

(ক) গনীমতের মাল ঃ এর ব্যয়ের খাত কুরআন মাজীদে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ.

"জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।" (সূরা আল-আনফাল-৪১)

এছাড়া বাকী চার ভাগ- সামরিক লোকদের জন্য নির্ধারিত।

এ থেকে বুঝা যাচেছ, পাঁচ ভাগের একভাগ উল্লিখিত খাতে বন্টনের জন্য বায়তুল মালে জমা করা হত। আর বাকী চারভাগ যুদ্ধাদের মধ্যে সরাসরি বনটন করে দেয়া হত। কিন্তু নবী করীম (স)-এর ইনন্তিকালের পর গনীমতের মালের একপঞ্চমাংশকে পাঁচভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ করা হত। খুলাফায়ে রাশেদূন কুরআনে উল্লিখিত রাসূল (স) এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ বাতিল করে দিয়েছিলেন। বর্তমানকালে উল্লিখিত অংশ দু'টি বাতিল করার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাখা এবং তা সামরিক বাহিনীর উন্নয়নে ব্যয় করাই উত্তম হবে বলে বিবেচনা করা হয়।

(খ) 'ফাই' ও বিনাযুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদ ঃ এর ব্যয়ের খাতও কুরআন মাজীদে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এটা প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। হযরত নবী করীম

(স) এ ধরনের যাবতীয় মাল সম্পদকে নিজের তত্ত্বাবধানে ব্যয় ও বণ্টন করতেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

مآ أفآء ٱلله على رسوله من أهل ٱلقرى فلله وللرسول ولذى ٱلقربى
و ٱليتامى والمساكين وٱبن ٱلسبيل كى لا يكون دولة بين ٱلأغنيآء منكم.

"আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর-রাসূলের, রাসূলের-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

বর্তমানে রাসূল (স.) ও তাঁর নিকট আত্মীয়রা যেহেতু জীবিত নেই।

আয়াতে উল্লিখিত 'রাসূল এবং তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাখা হবে এবং তা দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণকর কাজে এবং দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায়- ব্যয় করা হবে। ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের অংশ তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।

খারাজ, জিযিয়ার অর্থ ফাই'র অন্তর্ভুক্ত। তাই খারাজ ও জিযিয়ার সম্পদ উল্লিখিতখাতে ব্যয় করা হবে।

(গ) যাকাতের সম্পদ ঃ যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার খাতও কুরআন মাজীদ নির্ধারিত করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

إنما ٱلصدقات للفقرآء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى
ٱلرقاب والغارمين وفى سبيل ٱلله وٱبن ٱلسبيل فريضة من ٱلله والله عليم
حكيم.

"সাদকা তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে ভারাক্রান্তদের আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবা : ৬০)।

এখানে আল্লাহ তাআলা যাকাত ব্যয়ের জন্য আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিম্নে উল্লিখ করা হলঃ

বেকার শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা

যাকাত যাদের জন্য এবং যে সকল খাতে ব্যয় করা যাবে তার প্রথম খাত হল- কুরআনের পরিভাষায় 'ফকীর' আর ফকীর এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক দিক দিয়ে যে কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। এ দিক বিবেচনায় সে সব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও 'ফকীর' বলা যাবে, যারা কোন জুলম হতে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছে। কোন সামরিক এলাকা হতে বিতাড়িত লোকদেরও 'ফকীর' বলা যাবে।

আল-কুরআনে বর্ণিত ফকীর শ্রেণীর মাঝে মজুর শ্রমিকরাও শামিল। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। গরীবদের সাহায্য দান এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্ভোগ ও অভাব-অনটন হতে মুক্তিদানই এর উদ্দেশ্য, যেন সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তারা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে পারে। বস্তুত ইসলামি রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের জন্য এটা এক চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ।

মিসকীন বা অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা

'ফকীর'দের ন্যায় মিসকীনদের জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হবে। 'মিসকীন' ঐ ব্যক্তিকে বলে দৈহিক অক্ষমতা যাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন করে দিয়েছে ; বার্ধক্য, রোগ অক্ষমতা ও পংগুত্য যাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করে দিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে বটে, কিন্তু যা উপার্জন করে তা দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পংগু ইত্যাদি সকল লোককেই 'মিসকীন' বলা যায়। তাদেরকে

যাকাত ফান্ড থেকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দেয়া উচিৎ যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং দারিদ্র্যের দুঃখময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে পারে।

ইসলাম একদিকে লোকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত করেছে, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বেকার, পংগু, অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও উপার্জন ক্ষমতাহীন লোকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দানেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে।

যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত থাকে, আর অপর ভাগ তা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় বণ্টন করার কাজ সম্পন্ন করে। এই উভয় ধরনের কাজে যত কর্মচারী নিযুক্ত থাকবে, তাদের সকলের প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেয়া এবং গোটা বিভাগে যা কিছু ব্যয় হবে তা যাকাত ফান্ড থেকে সমাধা করা হবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার অনুপাতে বেতন দেয়া হবে। তার নিম্নতম হার হচ্ছে ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ।

ক্রীতদাসদের মুক্তিবিধান

যাকাতের একটা অংশ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ লোকদের মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজে ব্যয় করা যাবে। এ অর্থ লাভ করে তার বিনিময়ে নিজেকে গোলামীর বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারবে।

ইসলামি আদর্শের সূচনালগ্নে আরবদেশে দাস-প্রথার খুব বেশী প্রচলন ছিল। ইসলামি রাষ্ট্র এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারী অর্থের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রথার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে। ফলে খুলাফায়ে রাশেদূনের যুগে এই প্রথা চূড়ান্তভাবে রহিত হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে দাস প্রথা নেই বললেই চলে। তাই এ যুগে দেশ রক্ষার জন্য অথবা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলিম সৈনিকগণ যদি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দ্বারা মুক্ত করার ব্যবস্থা করা যাবে। ঘরের কাজের ছেলে ও মেয়েদেরকে কৃতদাস-দাসীদের অংশ দেয়া যেতে পারে। যাতে তারা অন্যকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা

যাকাতের একটা অংশ ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। ঋণগ্রস্ত লোক সাধারণত দু' ধরনের ঃ (১) যারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাদেরকে যাকাতের এ অংশ হতে সাহায্য করা যাবে। (২) দ্বিতীয় সেসব লোক, যারা মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ সাধন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। তারা ধনী হোক বা নির্ধন হোক- ঋণ শোধ করার পরিমাণ অর্থ যাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে দেয়া যাবে।

নবী করীম (স) ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবেই ঘোষণা করেছেন-

من ترك مالا فلورثته و من ترك كلا فإلينا

যে লোক ধন-সম্পত্তি রেখে মরে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর যে লোক কোন ঋণের বোঝা অনাদায় রেখে মারা যাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে যদি তা আদায় করা না যায়, তবে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। (মুসলিম)

নবী করীম (স.)-এর এ ঘোষণায় নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করার এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা-ব্যবস্থার ভার সরাসরিভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করা হয়েছে।

বিনাসুদে ঋণ দান

ইসলামি রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে কেবল ঋণ-ভার হতে মুক্ত করবে তাই নয়, বরং জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা সুদের ভিত্তিতে হবে না। উপরন্তু যাকাতের যে অংশ ঋণ শোধ করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে তা হতে বিনা সুদে ঋণ দেয়া যেতে পারে। ইসলামি অর্থনীতিতে সুদী কারবার ও সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

খুলাফায়ে রাশেদূনের যুগে এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বায়তুলমলসমূহ এ জন্য তৎপর থাকত। ফলে সে সময় সুদী কারবারের অস্তিত্ব ছিল না।

ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে বিনাসুদে ঋণ দেয়ার জন্য মুসলিম জনগণকে উৎসাহিত করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের উপরও উক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৪৫)

ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

যাকাতের একটা অংশ ব্যয় হবে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জন কল্যাণকর কাজে- দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই এই অর্থ ব্যয় করা যাবে।

নিঃস্ব পথিকদের প্রয়োজন মেটানো

যাকাতের একটা অংশ 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্য ব্যয় করা যাবে। যেসব লোক কোন পাপ-উদ্দেশ্যে নয় বরং কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশ ভ্রমণে বের হয় এবং পথিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিঃসম্বল হয়ে পড়ে, তাদেরকে যাকাতের এ অংশের টাকা হতে এমন পরিমাণ দান করা যাবে, যেন তা দ্বারা তাদের তাৎক্ষণিক অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং নিজ ঠিকানায় ফিরে যেতে পারে। এমন কি, যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে চায় ; কিন্তু তাদের পথ খরচের সংস্থান হয় না বলে যেতে পারে না, এরূপ লোকদের যাকাতের এ অংশের অর্থ হতে যাতায়াতের খরচ দান করা যাবে। কোন গ্রামবাসী শ্রমিক শহরে এসে উপার্জন করতে থাকা অবস্থায় অনিবার্য কোন কারণে যদি তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়, এবং তার পথ খরচের কোন অর্থ না থাকে, তাকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত দরাজ করতে বাধ্য না করে ইসলামি রাষ্ট্র যাকাতের এ অংশ থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবে। এসব আকস্মিক প্রয়োজনশীল লোকের নিজ নিজ ঘরে যদি বিপুল পরিমাণের অর্থ-সম্পদও থেকে থাকে, তবুও তাকে এ সময় যাকাতের অর্থ হতে সাহায্য দান করা শরীঅত সম্মত কাজ হবে। এ ব্যাপারে ইসলামি শরীআত অনুমতি প্রদান করেছে।

যাকাতের এ অংশের অর্থ হতে কেবল যে নগদ টাকা দিয়ে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে তাই নয়। পথিকদের জন্য মুসাফিরখানা, ওয়েটিং রুম, গণ-গোসলখানা ও সৌচাগার ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে। যেসব রাস্তাঘাট ও পুল ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ সাধারণ লোকদের পথ চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে তাও এ অংশের অর্থ দ্বারা মেরামত বা পূণনির্মাণ করা যেতে পারে।

অনির্ধারিত ব্যয়ের খাত

পূর্বের আলোচনায় ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয়ের যে সকল খাত কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত খাতগুলোর বাইরেও এমন অনেক খাত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করা ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।

ইসলামি অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করার সীমাবদ্ধ অনুমতি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীকে প্রদান করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত নির্ধারিত খাতের ব্যয় ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্যান্য খাতের ব্যয় তিনি পার্লামেন্টে বা মজলিসে শুরার সাথে পরামর্শ করে করতে পারবেন। নিম্নে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতের উল্লেখ করা হল-

রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন ভাতা

ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতন বায়তুলমাল হতেই আদায় করা হবে। নবী করীম (স) মুসলমানদের সামগ্রিক আয় হতে যে অংশ গ্রহণ করতেন, তা হতেই তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ হত।

তাঁর ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত উমর ফারূক (রা) মুসলমানদের পক্ষ হতে বললেন ঃ "আপনি ব্যবসায়কার্যে লিপ্ত হলে মুসলমানদের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য অনেকখানি ব্যাহত হবে। অতএব আপনি ব্যাবসায় ত্যাগ করুন।"

হযরত আবু বকর (রা) নিজের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বললেন ঃ "জনগণের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যও চালিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কাজে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ও ঐকান্তিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ওদিকে আমার ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রয়োজনও রয়েছে।"

তখন মুসলমানদের মজলিসে শূ'রায় খলীফাকে বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

রাষ্ট্র-প্রধানকে কী পরিমাণ বেতন দেয়া হবে, এ সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর একটি নীতিকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন-

أنا و مالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أخذت بالكفاف أو أكلت بالمعروف.

"আমি ও তোমাদের সামগ্রিক ধন-সম্পদের উদাহরণ হল- ইয়াতীমের ওপর অভিভাবকের ধন-সম্পদের সমতুল্য অর্থাৎ আমি যেন ইয়াতীমের মালেরই রক্ষনাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই তবে আমি বায়তুলমাল হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করব। অথবা ন্যায়সংঙ্গতভাবে তা থেকে আহার করব। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ:১১৭)

এ থেকে বোঝা যায় ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতনের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্য-মূল্য বিবেচনায় রাখা হবে। সময় ও অবস্থার আলোকে বেতন কম-বেশী হবে।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন

ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের ন্যায় অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনও বায়তুলমাল হতে প্রদান করা হবে। কারণ তারা সকলেই জনগণের সামগ্রিক ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপরে আত্মনিয়োগ করে থাকে। অতএব জনগণের সামষ্টিক ধনভান্ডার-বায়তুলমাল- হতে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেয়াটাই স্বাভাবিক। নবী করীম (স.) নিজে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও অনুরূপ করা হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতি সাধারণভাবে সকল প্রকার শ্রমিকের বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের-বেতনের হার নির্ধারণের মূলনীতি উপস্থাপন করেছে।

ইসলামি অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের স্বরূপ এবং প্রয়োজন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করে থাকে। নবী করীম (স.)-এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত একটি নীতি ঘোষণা করেছেন ঃ

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكسب خادما و إن لم يكن له مسكنا فليكسب مسكنا. من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.

"যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, (সে যদি বিবাহ না করে থাকে, তবে] সে যেন বিবাহ করে। তার কোন একজন চাকর না থাকলে সে একজন চাকর নেবে। তার ঘর না থাকলে সে একটি ঘর নেবে। এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় বাড়াবাড়িকারী, না হয় চোর হিসেবে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ কিতাবুল খারাজ)

লাওয়ারিস শিশুদের লালন-পালন

লা-ওয়ারিস শিশু সন্তানদের প্রতিপালন করাও ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে সন্তান নিজে উপার্জনে সক্ষম নয়, যার নিজের কোন অর্থ-সম্পদ নেই, কিংবা যার কোন অভিভাবক বা কোন নিকটাত্মীয়ও এমন নেই যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে ; ইসলামি রাষ্ট্রই তার লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব নিবে। তবে ইসলামি রাষ্ট্র এ ধরনের সন্তানদের নিষ্কর্ম বসে খেতে দেবে না বরং তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করবে। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিস সন্তানদের সম্পর্কেও এ নীতি প্রযোজ্য হবে।

কয়েদী ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ

যেসব অপরাধীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে, যেসব অপরাধীর বারবার অপরাধের দরুন তাদেরকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত হবে, তাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবেশন করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর তা বায়তুলমাল হতে প্রদান করা হবে। যেসব লা-ওয়ারিস কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও ইসলামি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হবে।

ক্ষতিপূরণ দান

ইসলামি রাষ্ট্রের কোন উন্নয়ণমূলক কাজের জন্য কিংবা যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ, সৈনিকদের চলাচল অথবা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নাগরিকদের বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত হলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। হযরত উমর ফারূক (রা).-এর নিকট একজন কৃষক এসে অভিযোগ করল যে, সিরিয়ার একদল সৈন্য পথ অতিক্রম করার সময় তার শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বায়তুলমাল হতে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা

ইসলামি অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা শুধু মুসলিম নাগরিকদের দান করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল দেশবাসীই এ নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। ইসলামি অর্থনীতিতে যেসব স্থানে 'মিসকীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদে তাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে নিঃস্ব-দরিদ্র নাগরিকদের বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) এর সময় ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা.) 'হীরা' বাসীদের সাথে যে সন্ধি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন-

"এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে, অথবা কোন ব্যক্তি যদি সহসা এত বেশী দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে, তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে ব্যবস্থা করা হবে যতদিন সে ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বসবাস করবে।'

হযরত উমর (রা.) এক বৃদ্ধ ইয়াহূদী ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল, আমাকে জিযিয়া আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা আদায় করার আমার কোন সামর্থ্য নেই। হযরত উমর (রা.) এটা শুনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, বায়তুলমাল খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন এর অবস্থার প্রতি লক্ষ কর, এর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দাও, এবং এর নিকট হতে জিযিয়া নেয়া বন্ধ কর।' অতঃপর বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, এর যৌবনকালকে আমরা কাজে ব্যবহার করব, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় তাকে অসহায় করে ছেড়ে দেব, তা কোন মতেই ইনসাফ হতে পারে না।"

সারকথা

ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাত অনেক। নাগরিকের কল্যাণে সকল কাজ আঞ্জাম দেয়া ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের কথা উল্লেখ করা হল।

আধুনিক যুগে জনগণের কল্যাণে যে সকল মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়, সকল কাজের ব্যয়ভার ইসলামি রাষ্ট্র বহন করবে। শুধু যাকাত, গনীমাত ও ফাই এর সম্পদ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে।

তবে ইসলামি রাষ্ট্র তার কোন সম্পদ শরীয়ত সম্মত নয় এমন কোন কাজে ব্যয় করতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাত কয় ধরনের ?

ক. তিন ধরনের; খ. দু' ধরনের;
গ. চার ধরনের; ঘ. বিভিন্ন ধরনের।

২. যাকাত ব্যয়ের নির্ধারিত খাত কয়টি ?

ক. ৮টি; খ. ৬টি;
গ. ৯টি; ঘ. ১০টি।

৩. বর্তমান যুগে গনীমতের মালে রাসূল (সা) ও তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ কীভাবে ব্যয় করা হবে ?

ক. ফকীর-মিসকীনকে দান করা হবে; খ. সৈন্যদের বেতন দেয়া হবে;
গ. যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ -সরঞ্জাম কেনা হবে; ঘ. রাষ্ট্রপ্রধানকে অধিক বেতন দেয়া হবে।

৪. রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন কোন খাতে থেকে প্রদান করা হবে ?

ক. যাকাতের খাত থেকে; খ. গনীমতের খাত থেকে;
গ. ফাই এর খাত থেকে; ঘ. উপরোক্ত তিনটি খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত থেকে।

৫. অমুসলিম নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের উপর

ক. অবশ্য কর্তব্য; খ. সাধারণ কর্তব্য;
গ. মোটেও উচিৎ নয়; ঘ. যতটুকু সম্ভব করা উচিৎ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়নীতি কী ? আলোচন করুন।
২. কোন কোন সম্পদের ব্যয়ের খাত কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ? লিখুন।
৩. যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত কী কী ? কুরআনের আলোকে লিখুন।
৪. ইসলামি রাষ্ট্র কীভাবে অমুসলিমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করবে ? লিখুন।
৫. যাকাত থেকে কীভাবে ঋণদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায় ? আলোচন করুন।

বিশদ-উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ? বর্ণনা করুন।
২. ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যয়ের খাতগুলো বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠ ঃ ৭

ওয়াকফ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ওয়াকফের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়াকফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- ওয়াকফের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন কোন সম্পদ ওয়াকফ করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত বলতে পারবেন।

সংজ্ঞা

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াকফ শব্দের অর্থঃ আটকানো বা বন্দী করা। ওয়াকফ করা অর্থ কোন কিছু আটক করে কারো জন্য নির্ধারণ করা।

পরিভাষায় ওয়াকফ বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছুর মূলস্বত্ত ও তার ভোগাধিকার প্রদান করা।

প্রকারভেদ

ইসলামি আইনশাস্ত্রের পরিভাষায় ওয়াকফ দু' প্রকার ঃ

১. পারিবারিক ওয়াকফ ঃ নাতী-নাতীন বা নিকটতম কোন দরিদ্রকে ওয়াকফ করা।

২. কল্যাণমূলক ওয়াকফ ঃ মানবকল্যাণের জন্য ওয়াকফ করা।

ওয়াকফ-এর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ ওয়াকফ-এর বিধান প্রদান করেছেন এবং এ বিধানকে তার নিকটতম হওয়ার মাধ্যম সমূহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতের মানুষরা ওয়াকফ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল না। রাসূল (সা)-ই এ বিধান প্রণয়ন করেন, তা পালনের আহবান জানান এবং এর মাধ্যমে ফকির অসহায় ও দুর্বলের প্রতি সহনশীল হতে উৎসাহ প্রদান করেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওয়াকফ-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এর দ্বারা দুনিয়াতে দারিদ্রদের পূনর্বাসন আর পরকালে ওয়াকফকারীর সওয়াব হাসিল।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন-

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية , او علم ينتفع به , او ولد صالح يدعو له.

মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যতীত আর তা হচেছ সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

এখানে সাদকায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান সাদকাহ বলতে ওয়াকফ বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন-

ان مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته : علما نشره او ولد صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فى صحته و حياته تلحقه من بعد موته.

"মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব আমল ও ভাল কাজের ফলাফল সে পেতে থাকে তা হল ঃ তার বিতরণ করা ইলম, রেখে যাওয়া সৎ সন্তান, ওয়ারিস হিসেবে পরিত্যক্ত কুরআনের পান্ডুলিপি, তার তৈরী করা মসজিদ বা মুসাফির খানা, তার খনন করা কুপ অথবা এ জাতীয় এমন সব সাদকাহ যা সে জীবিতাবস্থায় করেছিল তা মৃত্যুর পর তার সাথী হবে।"

ওয়াকফ-এর উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ

রাসূল (সা) নিজে ওয়াকফ করেছেন। সাহাবীগণ মসজিদ, জমি, কুপ, বাগান ইত্যাদি ওয়াকফ করেছেন। রাসূল (সা)-এর আমলে কৃত কিছু ওয়াকফ-এর দৃষ্টান্ত:

১. আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) মদীনায় আগমন করে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, হে বনী নাজ্জার গোত্রের লোকেরা ! তোমরা কি তোমাদের এ বাগানের জায়গাটুকু বিনিময়ের মাধ্যমে আমাকে প্রদান করবে ? তখন তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমরা সেটাকে দান করব। তখন রাসূল (সা) সেটাকে (ওয়াকফ সম্পত্তি) হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তাতে মসজিদ তৈরি করলেন। (তিন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ)

২. হযরত উসমান (রা) বলেন, রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি রুমা কুপ খনন করবে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত। অতঃপর আমি সে কুপ খনন করলাম। (বুখারী, তিরমিজী ও নাসায়ী)

৩. সায়াদ বিন ওবাদা রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) ! উম্মে সায়াদ ইন্তেকাল করেছে। সর্বোত্তম সাদকাহ কি ? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, সর্বোত্তম সাদকাহ হল পানি দান করা। তখন তিনি একটি পানির কুয়া খনন করলেন অতঃপর বললেন, এ কুয়াটি উম্মে সায়াদের জন্য ওয়াকফ করা হল।

ওয়াকফ সাধারণত ঃ দু' উপায়ে হয়।

১. মানুষের ক্রিয়া কর্ম দ্বারা। যেমন- কেউ মসজিদ তৈরি করে তাতে মানুষকে নামাজের হুকুম দেয়। এ ব্যাপারে ওয়াকফ চালু হওয়ার জন্য কোন সরকারী নির্দেশের প্রয়োজন হবে না।

২. কথা দ্বারা। তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা আকার ইঙ্গিতে হোক। প্রকাশ্যের মানে হচ্ছে, ওয়াকফকারী বলবে আমি আমার এ মাল আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আকার ইঙ্গিতে ওয়াকফের মানে হচ্ছে, ওয়াকফকারী বলবে আমার এ মালটি সাদকাহ করলাম এবং সে মনে মনে ওয়াকফের নিয়াত করবে। তাহলে সেটা ওয়াকফ হিসেবে পরিগণিত হবে।

ওয়াকফ যেমনভাবে মানুষের জীবদ্দশায় সম্পন্ন হতে পারে তেমনিভাবে মৃত্যুর পর শর্ত সাপেক্ষেও ওয়াকফ হতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তি বলল, এঘরটি বা ঘোড়াটি আমার মৃত্যুর পর আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। এ জাতীয় ওয়াকফ ইমাম আহমদের নিকট বৈধ। কেননা তা অন্তিম ওসিয়তের শামিল।

উপরোক্ত দু' উপায়েই ওয়াকফ প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সে জন্য ওয়াকফকারীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্ত পাওয়া যেতে হবে। ১. বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন হওয়া, ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া ও ৪. নিজ ইচ্ছায় ওয়াকফ হওয়া।

ওয়াকফ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ওয়াকফকৃত সম্পদ বিক্রি করা অথবা অন্যকে দান করা যাবে না। এমন কি তাতে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যাতে ওয়াকফের উদ্দেশ্য লংঘিত হয়। ওয়াকফকারী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার মালিকানা ভোগ করতে পারবে না। কারণ মহানবী (সা) বলেন-

لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

"ওয়াকফকৃত মাল বেচাও যাবে না, পূনরায় দানও করা যাবে না এবং কেউ তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।" (ফিকহুসসুন্নাহ ঃ ৩/৩৮১)

ইমাম আবু হানীফার মতে, ওয়াকফকৃত মাল বিক্রয় জায়িয। আবার ইমাম মালেক ও আহমদ বলেনঃ ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিকানা মৃতব্যক্তির উত্তাধিকারের মালিকানায় প্রবর্তিত হবে।

আমাদের কথা হল, কোন মাল ওয়াকফ করা হলে তার মালিকানা আল্লাহর হাতে চলে যায়। তার মালিক ওয়াকফকারীও থাকে না এবং ওয়াকফকৃত ব্যক্তির উপর তার মালিকানা পতিত হয় না।

ওয়াকফ পদ্ধতি

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফ দু' প্রকার ঃ ১. নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ওয়াকফ, ২. সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে ওয়াকফ।

উল্লিখিত দু' প্রকার ওয়াকফের মধ্যে প্রথম প্রকার ওয়াকফ অর্থাৎ- নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ওয়াকফ করাই উত্তম। কারণ এতে প্রথমতঃ ওয়াকফের সওয়াব মিলবে, দ্বিতীয়তঃ সিলা-রেহমী বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা পাবে।

ক) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মদীনায় সাহাবীগণের মধ্যে আবু তালহা আনসারী (রা) সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। বায়রুহা নামে তার একটি কুপ ছিল। তা মসজিদের নিকটবর্তী ছিল। রাসূল (সা) তা হতে পানি পান করতেন। যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

"তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুন্য লাভ করতে পারবেনা" (সূরা আলে-ইমরান : ৯২)

তখন আবু তালহা রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বায়রুহা কুপটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু। তা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। তা আপনি যে কোন খাতে খাটাতে পারেন। আল্লাহর রাসূল (সা) অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন, এটা অত্যন্ত লাভজনক (পরকালের জন্য) সম্পদ। এটাকে তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ওয়াকফ করে দাও। তখন আবু তালহা ঐ কুপটি তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ওয়াকফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

খ) ইবনু উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, উমর (রা) খায়বারে একখন্ড সুন্দর জমিন পান। তখন উমর রাসূল (সা)-এর নিকট আসেন তা ওয়াকফ করার অনুমতির জন্য। তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি খায়বারে এমন একখন্ড জমি লাভ করেছি, যা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ জমিটি সম্পর্কে আপনি আমাকে কি আদেশ দেন ? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তা নিজের হাতে রেখে তার ফসল সাদকাহ করতে পার। অর্থাৎ তার মালিকানা নিজ হাতে রেখে তার লব্দ ফসল ওয়াকফ করতে পার। তখন উমর (রা) তার জমিটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলেন, এ শর্তে যে, (১) তা কখনো বেঁচা যাবে না। (২) কাউকে হেবা করা যাবে না। (৩) কেউ তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। (৪) তা দরিদ্র ও নিকটাত্মীয় অথবা দাস আজাদ করার ক্ষেত্রে, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির এবং মেহমান খাওয়াতে সাদকা করা যাবে। আর যে ব্যক্তি তার ধারক-বাহক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে, সে ঐ মাল থেকে প্রয়োজনীয় অংশ খেতে পারবে এবং অন্য দরিদ্রকেও খাওয়াতে পারবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, মহানবী (সা)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই হাদীসটির উপর আমল চলে আসছে। পূর্বপরের আলিমগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ আমার জানা নেই।

আর এটাই ইসলামে প্রথম ওয়াকফ।

গ) ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন-

من احتبس فرسا فى سبيل الله فان شبعه وروثه و بوله فى ميزانه يوم القيامة حسنات.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য কোন ঘোড়া লালন-পালন করবে, ঐ ঘোড়ার খাদ্য-খাদক, পেশাব-পায়খানা কিয়ামত দিবসে তার আমলনামায় যোগ হবে।"

কোন কোন সম্পদ ওয়াকফ করা যায়

সাজ-সরঞ্জাম, বই-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা যায়। একইভাবে যে সব জিনিস ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং তার অবয়ব অপরিবর্তনীয় এবং তা থেকে সর্বদা উপকার পাওয়া যায় সে সব সম্পদ ওয়াকফ করা বৈধ।

পক্ষান্তরে যে সব সম্পদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় মেযন- টাকা-পয়সা, মোম, খাদ্য-দ্রব্য, পানীয়, সুগন্ধি ইত্যাদি ওয়াকফ করা বৈধ নয়। যেসব সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়, যেমন- বন্ধক রাখা বস্তু, বা কুকুর, শুকর, অন্যান্য হিংস্র জন্তু ও শিকারী পাখী (যা নখর দিয়ে শিকার করে) অর্থাৎ যেসব জানোয়ার ও পাখী হিংস্র এবং যা শিকার করে খাওয়া বৈধ নয়, তাও ওয়াকফ করা যাবে না।

ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ওয়াকফ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হতে হবে। যেমন- নিজ সন্তান অথবা আত্মীয় অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। এছাড়া কোন সৎকাজ যেমন- মসজিদ নির্মাণ করা ও পুল নির্মাণ করা অথবা কুরআন, ফিকহ বা দ্বীনী ইলম-এর জন্য ওয়াকফ করা।

পক্ষান্তরে ওয়াকফ অনির্দিষ্ট পুরুষ বা নারীর জন্য করা হলে, অথবা গুনাহর কাজে ওয়াকফ করা হলে, যেমন- ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের গীর্জা নির্মাণের জন্য ওয়াকফ করা হলে তা শুদ্ধ হবে না।

অবশ্য আহলুযযিম্মা তথা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয। যেমনভাবে তাদের উপর সাদকাহ করা জায়িয। কেননা রাসূল (সা)-এর স্ত্রী সফিয়াহ তার ইয়াহূদী ভ্রাতার উপর ওয়াকফ করেছিলেন। যদি তওয়াফকারী সাধারণভাবে কিছু ওয়াকফ করে এবং ঐ ওয়াকফ কি খাতে ব্যয় হবে তা নির্ধারণ না করে, যেমন- বলে, এই ঘরটি ওয়াকফ, তবে এ ওয়াকফ ইমাম মালেকের নিকট শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমাম

শাফেয়ীর নিকট তা শুদ্ধ হবে না। কারণ এতে ওয়াকফের মাছরাফ উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কোন খাতে এ ওয়াকফকৃত মাল ব্যয় হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। যদি কেউ নিজ নফসের উপর ওয়াকফ করে তবে কোন কোন আলেমের মতে সে ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না। কারণ এতে ওয়াকফের মাছরাফ উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কোন খাতে এ ওয়াকফকৃত মাল ব্যয় হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। যদি কেউ নিজ নফসের উপর ওয়াকফ করে তবে কোন কোন আলেমের মতে সে ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। তাদের দলীল হল, রাসূল (সা)-এর বাণী যা ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বলেছিল, আমার নিকট একটি মাত্র দীনার আছে, তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন-

تصدق به على نفسك.

"তা তুমি নিজ নফসের উপর সাদকাহ কর।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

এছাড়া ওয়াকফ-এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর নৈকট্য লাভ। নিজ নফসের উপর সাদকাহ করাও আল্লাহর নৈকট্য লাভ বিষয়ক কাজ। এ মত পোষণ করেন ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও আহমদ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও তাদের অনুসারীদের নিকট নিজ নফসের উপর ওয়াকফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ নিজ নফসের উপর ওয়াকফ করার মানে হল, নিজেকে মালিক বানানো। প্রকৃতপক্ষে ওয়াকফ করলে তওয়াফকারীর মালিকানা লোপ পায়।

ওয়াকফ বা ওসিয়তের সীমারেখা

ওয়াকফকারী বা ওসিয়তকারী তার অন্তিম শয্যায় যদি অনাত্মীয় কাউকে ওয়াকফ বা ওসিয়ত করতে চায়, তবে তা এক-তৃতীয়াংশের বেশী হতে পারবে না। যদি ওসিয়ত বা ওয়াকফ এক-তৃতীয়াংশের কম হয়, তবে তাতে উত্তরাধিকারীদের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। আর যদি এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় তবে উত্তরাধিকারীদের অনুমুতির প্রয়োজন হবে।

ওয়াকফ যদি সকল উত্তরাধিকারীকে সমান ভাবে না দেয়া হয়

কেউ তার অন্তিম শয্যায় যদি তার সকল উত্তরাধিকারীকে সমভাবে ওয়াকফ বা ওসিয়ত না করে বরং কাউকে দেয় আবার কাউকে বঞ্চিত করে, তবে তার বৈধতার ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বিন হাম্বলের মতে এ জাতীয় ওয়াকফ বৈধ নয়। অবশ্য অন্যদের নিকট এ জাতীয় ওয়াকফ বৈধ।

আমাদের কথা হল, এক্ষেত্রে শাফেয়ী ও আহমদের কথাই গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ এজাতীয় ওয়াকফ বৈধ নয়।

ধনীদের উপর ওয়াকফ করা বৈধ কি-না ?

ওয়াকফ-এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর নৈকট্য লাভ। সে জন্য ওয়াকফ-এর শর্তগুলো মানতে হবে। কিন্তু যদি কেউ শর্ত করে যে, ওয়াকফ শুধু ধনীদের উপরই করবে, তবে সে ওয়াকফ বৈধ হবে কি-না ? এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

ক) কেউ কেউ বলেন, ধনীদের মধ্যে ওয়াকফ করা জায়িয। কেননা তাদের জন্য কোন ওয়াকফ করা গুনাহর কাজ নয়।

খ) আবার কেউ কেউ বলেন এ ওয়াকফ শুদ্ধ নয়। কারণ ধনীদের উপর ওয়াকফ-এর শর্ত করা বাতিল বা অগ্রাহ্য। এছাড়া ধনীদের উপর ওয়াকফ করলে দুনিয়াতেও লাভ নেই আর পরকালেও লাভ নেই। কারণ শুধু দরিদ্র বা অসহায়ের প্রতি দান করেই আল্লাহর নৈকট্য পওয়া যায়। (সাইয়্যেদ সাবেক ঃ ফিহুসসুন্নাহ ঃ ৩৮৩-৩৮৪)

ওয়াকফকারী বা ওসিয়তকারী এমন কোন শর্তারোপ করে, যা শরীয়তে ওয়াজিবও নয় এবং মুস্তাহাবও নয় অথবা শরীয়ত বহির্ভুত, তবে সে সব শর্ত বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

*ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষক বা কর্মচারী তা হতে ভক্ষণ করতে পারবে কি-না ?

ওয়াকফ-এর মুতাওয়াল্লী ওয়াকফ সম্পত্তি হতে প্রয়োজনবোধে খেতে পারবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ)-এর হাদীস রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উমর বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন ঃ

لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف.

"যে ব্যক্তি ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হবে, সে তা হতে সৎভাবে খেতে পারবে।" অর্থাৎ প্রয়োজন মতো গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করতে পারবে না।
ইমাম কুরতুবী বলেন, ওয়াকফ-এর মুতাওয়াল্লী বা কর্মচারী প্রয়োজনবোধে ওয়াকফের মাল থেকে খেতে পারবে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এ ক্ষেত্রে যদি ওয়াকফকারী এর উল্টা শর্তও করে তবুও খেতে পারবে। (ফিকহুসসুন্নাহ ঃ ৩/৩৮৫)

ওয়াকফকে বদল করা

ওয়াকফকৃত মাল অন্যমালের সাথে বদল করা জায়িয। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হল, বদলকৃত মাল প্রথমবারের মালের চেয়ে অধিকতর ভাল হবে।

এ সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়া বলেন ঃ মান্নতকৃত বা ওয়াকফকৃত মাল অন্য অধিকতর ভাল মাল দ্বারা বদলানো জায়িয। এটা দু' প্রকারের হতে পারে ঃ

(১) প্রয়োজনের খাতিরে বদল করা, যেমন- কোন ওয়াকফকৃত মাল অকেজো হয়ে গেলে তা বিক্রয় করে লব্দ অর্থ দ্বারা কোন কিছু খরিদ করা। যা প্রথম ওয়াকফের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন- জিহাদের জন্য রক্ষিত ঘোড়া। যদি ঐ ঘোড়া দ্বারা যুদ্ধে কোন উপকার না হয়, তবে তা বিক্রয় করে ওয়াকফের মাল হিসেবে অন্য কিছু ক্রয় করবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মসজিদের পার্শ্ববর্তী স্থান খারাপ হয়ে যায়, তবে তা অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে। অথবা তা বিক্রয় করে তার লব্দ অর্থ দ্বারা তার পরিবর্তে অন্য কিছু খরিদ করা যাবে, যা ঐ মসজিদের বিকল্প হবে। অনুরূপভাবে যদি ওয়াকফকৃত বস্তু দ্বারা ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তবে, তা বিক্রয় করে ঐ অর্থ দ্বারা ওয়াকফের নামে অন্য কিছু খরিদ করা যাবে। এ সবই জায়িয। কেননা আসল ওয়াকফকৃত বস্তু দ্বারা যদি ওয়াকফের উদ্দেশ্য হাসিল না হয় তবে তা বিক্রয় করে তার অর্থ দ্বারা এমন কিছু কিনতে পারবে, যা দ্বারা ওয়াকফের উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

(২) ওয়াকফকৃত বস্তু অধিকতর কল্যাণার্থে বদল করা, যেমন- একটি নির্মিত মসজিদের বদলে অন্য একটি এমন মসজিদ নির্মাণ করা যা শহরবাসীদের জন্য অধিকতর উপকারে আসে। এ ক্ষেত্রে পূর্বের মসজিদটি বিক্রয় করে দেবে। এটা আহমদ বিন হাম্বল ও তার অনুসারীদের অভিমত। তাদের দলীল হল, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কুবার পূরাতন মসজিদের বদলে অন্যত্র একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আর পুরাতন মসজিদটির স্থান পরবর্তীতে খেজুরের ভবন পরিবর্তন করে অন্য ভবন গ্রহণ করা অথবা মসজিদের ভবন বিক্রয় করে এটা দ্বারা অন্য মসজিদভবন ক্রয় করা সাহাবীগণের মধ্যেও ছিল। সূতরাং এটাকে সহজেই জায়িয বলা চলে।

এছাড়া ওয়াকফের ফসলের বদলে অন্য ফসল গ্রহণ করাও বৈধ, যা ওয়াকফের ফসলের চেয়ে অধিকতর ভাল। যেমন- কেউ দোকান ঘর অথবা একটি দোকান অথবা একটি বাগান অথবা একটি পানির মশক দান করল যদি তার বদলে পরবর্তীতে ওয়াকফের জন্য অধিকতর লাভজনক ঘর অথবা দোকান অথবা পানির মশক পাওয়া যায়, তাহলে পুরাতনগুলো বাদ দিয়ে নতুনগুলো সংগ্রহ করতে হবে। চাই তা বদলের মাধ্যমে হোক বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হোক।

অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে, মসজিদের বদল করা জায়িয নেই। তদ্রূপ ওয়াকফকৃত জমির বদলে অন্য জমি গ্রহণ জায়িয নেই। তাদের দলীল হল, রাসূল (সা)-এর হাদীস-

لا يباع اصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث.

"ওয়াকফের মূলস্বত্ব বিক্রয় করা যাবে না, তার বদলে কিছু ক্রয় করা যাবে না এবং কেউ তার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।"

কিন্তু এখানে ইমাম আহমদ-এর অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা এ ব্যাপারে সরাসরি হাদীস থেকে দলীল রয়েছে। আর এটাই অধিক যুক্তি সংগত।

ওয়কফ দ্বারা উত্তরাধিকারীদের কারো ক্ষতি সাধন করা যাবে না।
ওয়াকফ দ্বারা কোন উত্তরাধিকারীর স্বার্থহানী করা নিষিদ্ধ। যেমন- কোন ওয়াকফকারী কয়েকজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে কোন কিছু ওয়াকফ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা রাসূল (সা) বলেন-

لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام.

"ইসলামের নীতি অনুসারে কেউ নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আবার কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও যাবে না।"

মূল কথা হল, মহান আল্লাহ সিলাহরেহমী বা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দিলে তাতে আত্মীয়তার ছেদন করা হয়। সূতরাং এ ধরনের ওয়াকফ বাতিল বলে ঘোষিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন লোক তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মেয়েদের বাদ দিয়ে শুধু ছেলেদের জন্য ওয়াকফ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে ওয়াকফ বাতিল বলে ঘোষিত হবে। অনুরূপভাবে ছেলেদের কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ওয়াকফ করলেও তা বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। কেননা এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি আমার এক ছেলেকে একটি বাগান ওয়াকফ করেছি। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সকলকে সমভাবে ওয়াকফ করেছ ? উত্তরে লোকটি বলল, না আমি সকলকে সমভাবে দেইনি। তখন রাসূল (সা) বললেন-

لا اشهد على جور.

"আমি জুলম বা অত্যাচারের সাক্ষী হতে পারি না।"

কেননা এ জাতীয় ওয়াকফ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা হয়নি ; বরং এর দ্বারা আল্লাহর বিরোধিতা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শরীয়তের বিদ্রোহিতা করা হয়েছে। আর এ ওয়াকফ দ্বারা শয়তানের সন্তুষ্টি চাওয়া হয়েছে।

অথচ আজ-কাল বেশীরভাগ ওয়াকফ এ ধরনেরই হয়ে থাকে। এ ছাড়া কতিপয় লোক এমনও পাওয়া যায় যারা জনস্বার্থে ওয়াকফ না করে নিজেদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ওয়াকফ করে, যাতে সম্পদ তাদের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ জাতীয় ওয়াকফের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করা। অবশ্য সন্তানসন্ততি নেক্কার হলে অথবা ইলমে দ্বীন হাসিলকারী হলে, তাদের উপর ওয়াকফ করলে তা সঠিক ওয়াকফ বলে বিবেচিত হতে পারে এবং তা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হতে পারে। পক্ষান্তরে নিজ উত্তরাধিকারীরা সৎকর্মপরায়ণ না হলে তাদের উপর ওয়াকফ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার মানে হচ্ছে, তাদেরকে একচ্ছত্রভাবে সম্পদ ভোগের অধিকার দেয়া।

উত্তরাধিকারীদের কাউকে বিশেষভাবে কিছু ওয়াকফ না করে সমস্ত সম্পত্তি এমনিতেই ছেড়ে দেয়া ভাল। মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা কুরআনের বণ্টন নীতি অনুযায়ী সম্পদের মালিক হবে। আর ওয়াকফ বা ওসিয়ত করতে হলে, তা সাধারণভাবে মঙ্গলময় ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য করতে হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে অহরহ এর বিপরীত ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ওয়াকফ শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. আটকানো
খ. বন্দী করা
গ. গৃহবন্দী করা
ঘ. ক ও খ নং উত্তর সঠিক।

২. ওয়াকফ কত প্রকার?

ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. ছয় প্রকার।

৩. ওয়াকফ এর কার্যক্রম কখন শুরু হয়?

ক. মহানবী (সা)-এর যুগে
খ. হযরত উমর (রা)-এর যুগে
গ. হযরত আনাস (রা)-এর যুগে
ঘ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুগে।

৪. ওয়াকফ কয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. চারভাবে
খ. তিনভাবে
গ. দু'ভাবে
ঘ. পাঁচভাবে।

৫. ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত-

ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. পাঁচটি
ঘ. চারটি।

৬. ওয়াকফকৃত সম্পদ বদল করা যায় কি?

ক. সাধারণভাবে বদল করা যায়
খ. শর্ত সাপেক্ষে বদল করা যায়
গ. ক্ষেত্র বিশেষে বদল করা যায়
ঘ. কোনভাবেই বদল করা যায় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ওয়াকফ বলতে কী বুঝায়? ওয়াকফের প্রকারভেদ লিখুন।
২. ওয়াকফ এর উৎপত্তি ও এর প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. ক'টি পদ্ধতিতে ওয়াকফ করা যায়? লিখুন।
৪. ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী আলোচনা করুন।
৫. ওয়াকফ বা ওসিয়তের সীমারেখা উল্লেখ করুন।
৬. ওয়াকফ বদল করা যায় কি? ইমামগণের মতভেদসহ লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ওয়াকফ কী? ওয়াকফ-এর উৎপত্তি, ক্রমবিকশ, গুরুত্ব এবং বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

ইউনিট ৫

ইসলামে ব্যবসায় ও বাজারনীতি

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির সনদ। এটি ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবন বিধান। জীবন চলতে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুর দিক নির্দেশ রয়েছে এ ধর্ম ও বিধানে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্যবসায় ছাড়া পার্থিব জীবন অচল। সমাজের একজন মানুষের নিকট অন্যজনের প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাওয়া যায়। যার নিকট অপ্রয়োজনীয় বস্তুটি রয়েছে সেটি যদি বিক্রি না করত তবে অন্য ব্যক্তিটি তার চাহিদা পূরণ করতে পারত না। আবার ক্রেতা বস্তুটি ক্রয় করার মধ্য দিয়ে স্বীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। জীবনকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখার তাগিদে আদিকাল থেকে এ ব্যবসায় পদ্ধতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ধরন পরিবর্তনশীল।

এক সময় পণ্যে-পণ্যে কেনা-বেচা হত আর এখন পণ্যে-মুদ্রায় কেনা-বেচা হয়। এক সময় ব্যবসায় হত শুধু হাটে-বাজারে। বর্তমানে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসায় করা যায়।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বিক্রেতার মুনাফা লাভ আর ক্রেতার সুবিধা ভোগ। অনেক অসৎ ব্যবসায়ী তাই চতুরতা ও ঠকবাজির আশ্রয় নিয়ে থাকে। বেশী মুনাফার আশায় ক্রেতাকে ঠকায়। ইসলাম এসব বন্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইসলামে ব্যবসায় ও বাজারনীতি একটি স্বীকৃত বিষয়। এমনকি এক্ষেত্রে ইসলাম প্রেরণা যোগায়। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায় একটি জনহিতকর কাজ। ঠকবাজির স্থান নেই এ কাজে। সৎ উপায়ে ব্যবসায় একটি ইবাদত।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সততামূলক জনহিতকর ব্যবসায়ের প্রচলন করেন। আরব জাহান থেকে তিনি সেসব ব্যবসায় নিষিদ্ধ করেন যা উৎপীড়ন ও ঠকবাজির নামান্তর। তিনি মাপে কম দেওয়া হারাম ঘোষণা করেন, ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ করেন, বিক্রিত সম্পদে ভেজাল থাকলে ফেরৎ দেওয়ার বিধান পেশ করেন। এসব বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরব ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশক।

বর্তমান ইউনিটে আমরা ইসলামের আলোকে ব্যবসায় ও বাজারনীতি বিষয়ক মৌলিক কিছু নীতিমালা আলোচনা আলোচনা করছি। আলোচনার সুবিধার জন্য এ ইউনিটকে ১০টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়
- ❖ পাঠ-২ : ব্যবসায়ের শ্রেণী বিভাগ
- ❖ পাঠ-৩ : ইসলামের বাজারনীতি
- ❖ পাঠ-৪ : মুদ্রা বিনিময়
- ❖ পাঠ-৫ : লেনদেন ও ক্রেতা বিক্রেতার অধিকার
- ❖ পাঠ-৬ : পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নীতি
- ❖ পাঠ-৭ : বাগান ও ফল ক্রয়-বিক্রয় নীতি
- ❖ পাঠ-৮ : মজুতদারী
- ❖ পাঠ-৯ : পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়
- ❖ পাঠ-১০ : বৈদেশিক বাণিজ্য

পাঠ ঃ ১

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায় এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায় বৈধ হওয়ার প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারবেন।
- ব্যবসায় হালাল হওয়ার উপকারিতা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায় এর পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ব্যবসায়-এর সংজ্ঞা

আরবী البيع শব্দের প্রতিশব্দ হল ব্যবসায়। بيع শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে শুধু বেচা-কেনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান অর্থনীতিতে ব্যবসায় বলতে যা বুঝায় সে অর্থেই بيع শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় تجارة শব্দটিও ব্যবসায় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় ব্যবসায় বলতে বুঝায় مبادلة شئ مرغوب فيه ثمنيه على وجه مفيد مخصوص بالتراضى

মুনাফা ও উপকারিতা লাভের আশায় সন্তুষ্টচিত্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাথে অনুরূপ মূল্যমানের লেন-দেনের যাবতীয় কার্যাবলীকে বুঝায়।

আধুনিক অর্থনীতিবিগণ ব্যবসায়ের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তার সাথে ইসলামি সংজ্ঞার কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। তাদের মতে ধন-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীকে ব্যবসায় বলা হয়।

পার্থক্য হচ্ছে, যে সব ব্যবসায়ে সামান্য অকল্যাণ বা প্রতারণার আশ্রয় আছে ইসলাম তা সমর্থন করে না। যেমন মদ ও হিরোইনের ব্যবসায়। অপরপক্ষে সাধারণ ব্যবসায়নীতি এ ধরনের ব্যবসায়কে উপেক্ষা করে না।

শরীআতের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ের গুরূত্ব

ইসলামে ব্যবসায় করা মুবাহ ও বৈধ। কুরআন ও সুন্নাহ ব্যবসায়কে সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন-

وأحل الله البيع وحرم الربا.

"আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন আল-সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৫)

তিনি আরো বলেন-

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

"তবে হ্যাঁ, তোমাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসায় হলে অসুবিধা নেই।" (সূরা আন-নিসা : ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বিশ্বস্ত ব্যবসায় এর সমর্থনে এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন-

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (الترمذى)

"সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবী সত্যবাদী ও শহীদদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

তাছাড়া ইসলাম অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও বিজ্ঞান সম্মত একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। ব্যবস্যায় বৈধ না হলে জিনিসপত্রের লেনদেন সম্ভব হতো না, আর লেন-দেন না থাকলে পার্থিব কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ত। যা কাম্য হতে পারে না। বাস্তবতার ইসলামে ব্যবসায় বৈধ।

ব্যবসায় হালাল হওয়ার কারণ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য-পানীয় ও বস্ত্রের প্রয়োজন। যতদিন জীবন আছে ততদিন কেউ খাদ্য-বস্ত্র থেকে বিমুখ হতে পারে না। এসব জিনিসের সবকিছু ব্যক্তির নিজের পক্ষে সমাধা করা সম্ভব হয় না। এজন্য তাকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। পারস্পরিক লেন-দেনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তার জন্য যা প্রয়োজন তা অন্য থেকে গ্রহণ করবে আর যার প্রয়োজন নেই অথচ নিজের কাছে আছে তা অন্যের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করবে। লেন-দেনের এ পন্থায় বিধি-নিষেধ নেই। সকলের চাহিদা পূরণ হওয়ার এ পদ্ধতির নামই ব্যবসায়।

ব্যবসায় বৈধ করা না হলে মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।
কাগজের মুদ্রায় জিনিস লেন-দেন করা আধুনিক পদ্ধতি মাত্র। এর ফলে মাল-সামান লেন-দেন সহজ হয়।

ব্যবসায়-এর পরিধি

ব্যবসায় এর পরিধি ব্যাপক। মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সব জিনিসের ব্যবসায় করা বৈধ। তবে আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তু হারাম করেছেন তার ব্যবসায় বৈধ নয়। এজন্য মদ, রক্ত, শুকর ইত্যাদির ব্যবসায় বৈধ নয়। এব্যাপারে ইসলামি শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে

اصل الأشياء الإ باحة إلا ما حرم الشرع

"শরীয়তে যা হারাম করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য সব জিনিস মুবাহ।"

ব্যবসায়-এর প্রভাব

ইসলামি শরীয়ত সম্মত বস্তু শরয়ী পদ্ধতিতে বেচা-কেনা হলে বিক্রিত বস্তুতে ক্রেতার মালিকানা অর্পিত হয় এবং যে অর্থ বিক্রেতা ক্রেতা থেকে যে অর্থ গ্রহণ করেছে তাতে পূর্ব মালিকানা অর্জিত হয় এবং হালাল সম্পদ হিসেবে তা নিজের প্রয়োজন মত খরচ করা বৈধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যবসায়-এর প্রতিশব্দ হচেছ

ক. البيع খ. الشراء
গ. القراءة ঘ. العلم

২. ইসলামি শরীয়তে ব্যবসায়
ক. মুবাহ খ. মাকরূহ
গ. হারাম ঘ. ফরয

৩. ইসলামে হারামকৃত দ্রব্যের ব্যবহার করার হুকুম হচেছ-
ক. মাকরূহ খ. হারাম
গ. মুবাহ ঘ. মাকরূহ তাহরিমী

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যবসায় বলতে কী বুঝায় ? লিখুন।
২. ব্যবসায়-এর শরঈ মর্যাদা কী বর্ণনা করুন।
৩. ব্যবসায় হালাল হওয়ার কারণ আলোচনা করুন।
৪. ব্যবসায়ের প্রভাব লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায় কী? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুকুমের দিক থেকে ব্যবসায়-এর শ্রেণীবিভাগের পরিচয় বলতে পারবেন।
- পণ্যসামগ্রীর আদান প্রদানের ভিন্নতা হওয়ার দৃষ্টিতে ব্যবসায় এর প্রকারগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যক্তি মালিকানা ও যৌথ মালিকানা সংক্রান্ত ব্যবসায় এর ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবসায় এর অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট। তাই ইসলামে ব্যবসায়কে হালাল করা হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনীতি একটি সীমারেখা বর্ণনা করেছে। যা অনুসরণ করলে ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ইসলামে এমন শ্রেণীর ব্যবসায় এর সমর্থন করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সংরক্ষণ করতে পারে।
এখানে ব্যবসায় এর কতগুলো শ্রেণীর উল্লেখ করছি যা ইসলামি অর্থনীতি সমর্থন করে।

ব্যবসায়-এর শ্রেণী বিভাগ
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায়কে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন-
বিনিময়কৃত বস্তুর দৃষ্টিতে
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিনিময় অপরিহার্য। বিনিময় হয়তো দ্রব্যের সাথে মুদ্রার কিংবা দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিতে ব্যবসায়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

১. بيع مقابضة অর্থাৎ দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসায় করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ক্রেতা একটি চাল কুমরার বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট থেকে একটি মিষ্টি কুমরা ক্রয় করল। এ ধরনের ব্যবসায় হল বাই মুকাবাদা।
এ ধরনের ব্যবসায় আজকল খুব একটা প্রচলিত নেই। তবে কোথাও চালু থাকলে তা ইসলামি অর্থনীতিতে বৈধ।

২. بيع مطلق অর্থাৎ সাধারণ পদ্ধতির ব্যবসায়। দ্রব্যকে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বেচা-কেনা করা। বর্তমান যুগে সাধারণত ব্যাবসায়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গোটা পৃথিবীতে চালু আছে।

৩. بيع صـد ف মুদ্রাকে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসায়। আধুনিক পৃথিবীতে মানি চেঞ্জারের ব্যবসায়কে بيع صـد ف এর মধ্যে গণ্য করা যায়। এ জাতীয় ব্যবসায়কেও ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
লাভ কিংবা লোকসানের দৃষ্টিতে ব্যবসায় তিনভাগে বিভক্ত
১. بيع مرابحة বা লাভজনক ব্যবসায়- যে ব্যবসায়ে বিক্রিত দ্রব্য ক্রয়মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে তাকে بيع مرابحة বলে। যেমনি এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস ১০ টাকায় কিনে ১২ টাকায় বিক্রি করল।

২. بيع تولية (বাই তাওলিয়া) ঃ এমন ব্যবসায় যাতে ক্রয়কৃত মূল্যেই কোন কারণবশতঃ দ্রব্যটি বিক্রয় করা হয়। এতে কোন লাভ করা হয় না।

৩. بيع وضية (বাই ওয়াদইয়্যাহ) ঃ ক্রয়কৃত দ্রব্যকে ক্রয়মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে বিক্রি করাকে বা লোকসান দিয়ে বিক্রি করাকে بيع وضية বা লোকসানী ব্যবসায় বলে।

মালিকানার সংখ্যার দৃষ্টিতে ব্যবসায় এর প্রকার
মালিকানা একক হওয়া কিংবা যৌথ হবার দৃষ্টিতে ব্যবসায় দুই প্রকার ঃ

১. **بيع فرد** অর্থাৎ একক মালিকানা সংক্রান্ত ব্যবসায়। যখন কোন ব্যবসায় এর মালিকানা একজন ব্যক্তির থাকে তখন তাকে **بيع فرد** বলে। আমাদের দেশে ছোট-ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ একক মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

২. **بيع مشـاركة** (বাই মুশারাকা) যৌথ কারবার বা কোন ব্যবসায় এর মালিক যখন একাধিক থাকে তখন তাকে **بيع مشاركة** বলে। আমাদের দেশের লিমিটেড কোম্পানীগুলো সাধারণত এই শ্রেণীর ব্যবসায়।

আর এক শ্রেণীর ব্যবসায় আছে যার নাম **بيع مضاربة**-এতে একজন ব্যক্তির মূলধন আর অন্য ব্যক্তির শ্রমের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় করা। যেমন আবদুল্লাহ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আবদুর রহীমকে একটি দোকান করে দিল। আবদুর রহীম শ্রম দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবে। লভ্যাংশ দুজনে চুক্তি অনুসারে ভাগ করে নেবে।

নগদ বা বাকীর দৃষ্টিতে ব্যবসায় এর শ্রেণী বিভাগ

নগদ অর্থে, বাকীতে কিংবা অগ্রিম টাকা দিয়ে অর্ডারের মাধ্যমে ব্যবসায় করার দৃষ্টিতে ব্যবসায়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **بيع معجل** (বাই মুআজজাল) বা নগদ ব্যবসায় ঃ নগদ অর্থ লেন দেনের মাধ্যমে ব্যবসায় করা হল বাই মুআজাল।

২. **بيع مؤجل** (বাই মুআযজাল) বাকীতে ব্যবসায় ঃ কোন দ্রব্যকে ব্যবসায়ী নগদ অর্থে বিক্রয় না করে পরবর্তীতে আদায়যোগ্য শর্তে বাকীতে বিক্রয় করাকে বাই-মুয়াজ্জল বলে।

৩. **بيع سـلم** (বাই সালাম) বা অর্ডারের ব্যবসায়। তুলনামূলক কম দামে চাহিদাকৃত দ্রব্য সরবরাহের অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে চাহিদা মোতাবেক মাল সরবরাহ করার ব্যবসায়কে **بيع سلم** বলে।

বৈধ কিংবা অবৈধ হওয়ার দৃষ্টিতে ব্যবসায় এর শ্রেণী বিভাগ

ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে সকল প্রকার ব্যবসায় বৈধ নয়। কোন কোন ব্যবসায় বৈধ আবার কোনটা সম্পূর্ণ অবৈধ। কোনটা ত্রুটিযুক্ত হবে সংশোধনযোগ্য আবার কোনটা অপছন্দনীয়। এসব বিবেচনায় ব্যবসায়কে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. **بيع صحيح** (বাই সহীহ) বা বৈধ ও বিশুদ্ধ ব্যবসায়ঃ এমন ব্যবসায় যাতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যবসায় নীতির মূল ও গুণগত দিকের প্রতিফলন ঘটে। যেমন ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২. **بيع باطل** (বাই বাতিল) বা অবৈধ ব্যবসায় যে ব্যবসায় মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ তা হল বাতিল ব্যবসায়। যেমন- শুকর, মৃত মানুষের, মাংস ক্রয়-বিক্রয় করা।

৩. **بيع فاسـد** (বাই ফাসেদ) বা ত্রুটিযুক্ত ব্যবসায় ঃ যে ব্যবসায় মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ তবে গুণগত দিক থেকে অশুদ্ধ তা ফাসেদ (ত্রুটিযুক্ত) ব্যবসায়।

৪. **بيع مكروه** (বাই মাকরূহ) ঃ যে ব্যবসায় মূলগত ও গুণগত দিক থেকে শুদ্ধ তবে আনুষঙ্গিক কারণে ঠিক নয়, তাকে বাই-মাকরূহ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. বিনিময়কৃত বস্তুর দৃষ্টিতে ব্যবসায়-

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. بيع مرابحة বলতে বুঝায়-

ক. ক্রয়কৃত মূল্যে বিক্রয় করা খ. লাভে বিক্রয় করা

গ. লোকসানে বিক্রয় করা ঘ. কোনটাই ঠিক নয়।

৩. মালিকানার দৃষ্টিতে ব্যবসায়-

ক. তিন প্রকার খ. দুই প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৪. بيع مؤجل অর্থ-

ক. বাকীতে ব্যবসায় খ. নগদ দামে ব্যবসায়

গ. অগ্রিম অর্থ প্রদান করে ক্রয় করা ঘ. সবগুলো উত্তরই ঠিক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. بيع مطلق বলতে কি বুঝায় ? লিখুন।

২. লাভ কিংবা লোকসানের দৃষ্টিকোণে ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী ? বর্ণনা দিন।

৩. بيع سلم বলতে কী বুঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।

৪. بيع مضاربة কী ? আলোচনা কর।

৫. بيع صحيح ও بيع باطل এর বর্ণনা দিন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৩

ইসলামের রাজারনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামের রাজারনীতি কতটা জনহিতকর তা বলতে পারবেন।
- বাজার স্থিতিশীল রাখতে কি কি কাজ ইসলামে নিষেধ তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন সময় বাজারের কার্যক্রম চলা অবৈধ তা বলতে পারবেন।

মহান আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির যাবতীয় প্রয়োজন এবং তা যোগাড় করা তার একার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। অন্যের নিকট থাকা জিনিস অনেক সময় ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন হয়। আবার নিজের কাছে এমনসব অতিরিক্ত জিনিস আছে যা অন্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই এ ধরনের পারস্পরিক চাহিদা নিবারণ করা সম্ভব। এজন্যে আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন। তিনি বলেন-

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“আল্লাহ ব্যবসায়কে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম’। (সূরা আল-বাকারা : ২৭৫)

রাজারনীতি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হতে পারেঃ পণ্য-সামগ্রীর সুবিধার জন্য সাধারণত নির্ধারিত কোন স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আমরা তাকেই বাজার বলি।

বাজার পরিচালনার ব্যাপারে একটা নিয়ম-কানুন থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় সেখানে ক্রেতার কিংবা বিক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ইসলামি অর্থনীতি বাজারকেন্দ্রিক কিছু নীতি উপস্থাপন করেছে। সেগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি জনহিতকর বাজারনীতি বাস্তবায়িত হতে পারে। নিম্নে জনহিতকর বাজারনীতির কতিপয় দিক উল্লেখ করা হল-

বাজার হবে স্বাধীন

ইসলামি অর্থনীতি বাজারের ব্যাপারে প্রথম যে মূলনীতি পেশ করে তা হল বাজার হবে স্বাধীন। বাজারে স্বাধীনভাবে বিক্রেতা মালামাল নিয়ে আসবে এবং বিক্রি করবে আর ক্রেতা স্বাধীনভাবে ক্রয় করবে। এ ব্যাপারে কোন ধরনের কৃত্রিম হস্তক্ষেপ চলবে না। তাই নিম্নে বর্ণিত কতগুলো কাজ ইসলামি বাজারনীতিতে হারাম।

ক. গ্রামবাসী বিক্রেতার পক্ষে শহরবাসী বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করা ইসলামি বাজারনীতিতে অবৈধ। অর্থাৎ গ্রাম থেকে কোন লোক পণ্যসামগ্রী নিয়ে এল শহরে তা চলতি দামে বিক্রে করার জন্য। কিন্তু শহরের ব্যবসায়ী লোক তাকে বলল এ মাল আমার কাছে রেখে যাও, পরে আমি বেশীদামে বিক্রি করে তোমাকে মূল্য পরিশোধ করে দেব অর্থাৎ পণ্য-সামগ্রী আটকে রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা। এ ধরনের কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করা ইসলামি অর্থনীতিতে নিষেধ। জাহেলী যুগে এ ধরনের কেনা-বেচা হত। রাসূল (সা) তা নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন-

نهينا ان يبيع حاضر لباد ولو كان اخاه لا بيه و امه.

কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে- এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদিও সে লোক তার নিজের ভাই পিতা বা মাতাই হোক না কেন।

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. مسلم.

কোন শহুরে লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারোর দ্বারা কাউকে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এ ধরনের বেচা-কেনার ফলে একদিকে মূল বিক্রেতা ন্যায্য মূল্য ও নগদ অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে মূল বিক্রেতার কাছ থেকে শহরের ক্রেতারা কিনতে পারলে পণ্যটি তুলনামূলক কমদামে পেত যা এ নিয়মে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্ণিত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, বাজারে পণ্য ও স্বাভাবিক পন্থায় বিনিময় প্রণালীকে নিজস্ব গতিতে চলার সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা হলে স্বাভাবিক পন্থায়ই লোকজন প্রত্যেকে নিজের রিযিক লাভ করতে সক্ষম হবে।

উপদেশ বা পরামর্শ দিতে বাধা নেই

অবশ্য গ্রাম থেকে বিক্রয়ের জন্য আসা কোন লোককে যদি কোন শহরবাসী একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপকারের উদ্দেশ্য ঠকবাজী থেকে মুক্তির জন্য জিনিসটির সঠিক মূল্য অবহিত করে, তাকে ভাল উপদেশ দেয়। বাজারের পরিবেশের কাছে তাকে পরিচিত করিয়ে দেয় তবে তা বৈধ এবং উত্তম কাজ হিসেবে পরিণত হবে। রাসূল (সা) বলেন- الدين النصيحة কল্যাণকামিতাই হচ্ছে দ্বীন। এ ধরনের উপদেশ দান দ্বীনের অংশ। তিনি আরো বলেন-

اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له (احمد)

"তোমাদের কেউ উপদেশ চাইলে তার ভাইকে উপদেশ দেওয়া তার কর্তব্য।" (আহমাদ)

দালালী জায়েয

ব্যবসায়ী কাজে দালালী করা হলে, তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, তা একপ্রকার পথ প্রদর্শন, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং মাধ্যম হওয়ার ব্যাপার। তার দরুন উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। উভয় পক্ষেরই নিজ নিজ কাজে অনেক সুবিধা হয়। বর্তমানকালে আমদানী রফতানী ব্যবসায়ে এবং খুচরা বা পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতার বড় প্রয়োজন দেখা দেয়। অতীতের যে কোন কালের বা যুগের তুলনায় একালেও এ যুগে এ প্রয়োজন তীব্রতর। আর তাতে দালালের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাই দালাল যদি তার নির্দিষ্ট মজুরী নগদ গ্রহণ করে কিংবা মুনাফা থেকে হার মত কমিশন অথবা অন্য কোনভাবে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। ইমাম বুখারী লিখেছেন- ইবনে সিরীন, আতা ইবরাহীম, হাসান প্রমুখ ফিকহবিদগণ মনে করেন, দালালির মজুরী গ্রহণে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমদ বলেন, যদি কোন লোক অন্য একজনকে বলে যে, এ কাপড়টা বিক্রি করে দাও। অতিরিক্ত যা পাওয়া যাবে তা তোমার তবে তা সম্পূর্ণ জায়িয। এ ধরনের দালালী ব্যবসায় বা কমিশন এজেন্সী ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বৈধ। রাসূল (সা) বলেন-

المسلمون عند شروطهم. (بخارى)

"মুসলমান নিজেদের পারস্পরিক শর্ত মেনে চলতে বাধ্য।" (বুখারী)

ধোঁকাবাজী ও মুনাফাখোরী নিষিদ্ধ

বাজারে দ্রব্যমূল্যের স্বাভাবিক গতি স্থির রাখার জন্য ইসলামে ধোঁকাবাজিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মুনাফাখোরীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাজারের স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে পণ্যকে বেশীদামে বিক্রি করার জন্য অনেকে ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়। বিক্রেতারা একদল দালাল তেরী করেন- যারা সামান্য কিছু পয়সা পাবার লোভে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যের বুলি আওড়ায়। তাদের কিন্তু পণ্য কেনার উদ্দেশ্য থাকে না। তাদের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণ ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করা। তারা যাতে মূল্য শুনে চিন্তা করে যে যেহেতু দ্রব্যটির মূল্য এত টাকা বলা হয়েছে অথচ বিক্রেতা বিক্রয় করছে না তাতে বুঝা গেল দ্রব্যটির মূল্য আরো বেশী। তাই তারা আরো বেশী মূল্যে ক্রয় করে। এ ধরনের কাজ ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়। ইসলামি বাজারনীতিতে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

বাজারে পণ্য পৌঁছতে বাধা প্রদান করা

বেচা-কেনাকে মুনাফাখোরী থেকে এবং দ্রব্যমূল্যকে ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) বাজারে পণ্য-সামগ্রী আসার পূর্বেই বাজারের বাইরে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন নতুবা মূল বাজারেই পণ্যদ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে সঠিক মূল্যও নির্ধারিত হতে পারবে না। কেননা সঠিক মূল্য নির্ধারণ বাজারে পণ্যের আমদানী ও তার চাহিদা (demand) অনুপাতে সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরিউক্ত অবস্থায়

বিক্রেতা বাজারের দর-দাম কিছু জানতে পারে না। এ কারণেই নবী করীম (সা) বাজারে পণ্য পৌঁছার পর পূর্ববর্তী ওয়াদা ভঙ্গ করার অধিকার বিক্রেতার আছে বলে ঘোষণা করেছেন।

নির্ভেজাল পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করা

ইসলামি বাজারনীতির আরেকটি মূলনীতি হলো বাজারে নির্ভেজাল পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করতে হবে। ভেজাল বা ত্রুটিযুক্ত মাল বিক্রি করলে তা ক্রেতার নিকট প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এটা মস্তবড় অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন-

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صـدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما , و ان كذبا
و كتما محقت بركة بيعهما.

"ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না, ততক্ষণে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দুজনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দুজনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দুজন মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মূল্যহীন হয়ে যাবে।"

তিনি আরও বলেছেন-

لايحل لاحد يبيع بيعا الا بين ما فيه و لا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه. (حاكم , بيهقى)

"কোন পণ্য বিক্রয়ে পণ্যের দোষত্রুটি বলে দেওয়া না হলে হালাল হবে না কারো জন্যেই। আর যে তা জানে, কিন্তু জানা সত্ত্বেও যদি না বলে তবু তা তার জন্যে হালাল নয়।" (হাকিম ও বায়হাকী)

রাসূলে করীম (সা) বাজারে গিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করছে। তা তাঁর খুব পছন্দ হল। পরে তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন হাত ভিজে গেল। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে শস্য ব্যবসায়ী, এসব কি ? সে বলল ঃ বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا. (مسلم)

"তাহলে তুমি এ ভেজা শস্যগুলো স্তুপের উপরিভাগে রাখলে না কেন, তাহলে ক্রেতরা তা দেখতে পেত ? --- এ তো ধোঁকা। আর যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী করীম (সা) অপর এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খুব নিকৃষ্ট মানের খাদ্য নীচে রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ

بع هذا على حدة و هذا على حدة. من غشنا فليس منا. احمد.

"এ খারাপ আলাদা বিক্রয় কর আর এটা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি কর। জেনে রেখ। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমার দলের কেউ নয়।"

উত্তমযুগের মুসলমানরা এ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। তারা পণ্য বিক্রির সময় দোষত্রুটি স্পষ্ট করে বলে দিতেন। ক্রয়-বিক্রয়ে সদা সত্য কথা বলতেন। মানুষের কল্যাণ চাইতেন, ধোঁকাবাজি করতেন না।
প্রখ্যাত ফিকহবিদ ইবনে সিরীন একটি ছাগী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে তিনি বললেন, ছাগীটির দোষ আছে তা তোমাকে বলে আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে চাই। ওটি ঘাস পা দিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেয়।

পণ্য মজুদ করা হারাম

বাজারের গতি স্বাভাবিক রাখতে এবং দ্রব্যমূল্য জনগণের পক্ষে রাখতে ইসলাম অতিরিক্ত লাভের আশায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে গুদামজাত করে রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
রাসূল (সা) বলেন-

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برى من الله و برئ الله منه.

"যে লোক চল্লিশ রাত্রি কাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও তার থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন।"

৪. একজনের ক্রেতাকে অন্য বিক্রেতা প্ররোচিত করা হারাম। অর্থাৎ একজন বিক্রেতা যখন কোন ক্রেতার নিকট বিক্রি সম্পর্কে আলোচনা করে তখন দেখা যায় অন্য কোন বিক্রেতা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে উক্ত ক্রেতাকে বাগিয়ে নেয়। ইসলামি বাজারনীতিতে এটা হারাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূল (সা) এমনটি করতে নিষেধ করে বলেন-

لا يبيع احدكم على بيع اخيه.

"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের উপর বিক্রি না করে।"

৫. ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষ্য রাখা বা লিখে রাখা একটি সুন্নাত নীতি। বাজারে কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রিয় হলে তার জন্য সাক্ষ্য রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমানে প্রচলিত ক্যাশম্যামোয় স্বাক্ষর প্রতিনিধি হিসেবে বলা যায়। এ নীতিটি সুন্নাত। এর ফলে অনেক ঝগড়া-বিবাধ ও ধোঁকাবাজি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد.

"তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা কর তখন সাক্ষ রাখবে। লেখক এবং সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮২)

দ্রব্যমূল্য সাধারণ গতিতে চলা

ইসলামি বাজারনীতির অন্যতম হচ্ছে স্বাভাবিক গতিতে বাজারে পণ্যের যোগান হবে আবার স্বাভাবিক গতিতে বিক্রি হবে। চাহিদা কম বেশী হবার উপর দ্রব্যমূল্যের গতি ওঠানামা করবে। সাধারণত মূল্য নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের জন্য উচিৎ নয়। একদা রাসূল (সা)-এর সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে জনতা এসে রাসূল (সা)-এর কাছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে আবেদন জানাল। তখন রাসূল (সা) বললেন-

ان الله هو المسـعر القابض الباسـط الرازق و انى لا رجو ان القى الله و ليس احد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال. احمد , ابوداؤد , ترمذى , ابن ماجه.

প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন। রিযিকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ জুলম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার উপর দাবিদার কেউ থাকবে না।

নবী করীম (স)এ হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ জুলম এবং সেই জুলম থেকে মুক্ত ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চান।

অবশ্য, কোন কৃত্রিম পরিস্থিতির কারণে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুদ করণের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী যদি মুনাফা অর্জন করার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর সাধারণ মানুষ এর ফলে দুর্ভোগের শিকার হয় এমতাবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর হস্তক্ষেপ করবে এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেবে। এর ফলে অধিক মূল্য গ্রহণকারীর শোষণ থেকে জনগণকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

সকল অবস্থায়ই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ নয়। ইসলামি অর্থনীতিবিদগণের মতে মূল্য নির্ধারণ দু' রকমের হয়। এক প্রকারের মূল্য নির্ধারণে লোকদের উপর জুলম হয় এবং তা হারাম। আর এক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার দাবি তা অবশ্যই জায়িয এবং জরুরী।

অতএব অন্যায়ভাবে লোকদের উপর যদি এমন মূল্য চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা রাযী নয় এবং মুবাহ জিনিস থেকে জনগণকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তা হবে হারাম। পক্ষান্তরে লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়- প্রচলিত দামে (Standard price) বিক্রয় করতে বাধ্য করা

হয় কিংবা প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ থেকে তাদের বিরত রাখা হয়, তাহলে তা করা শুধু জায়িযই নয়, ওয়াজিবও বটে।

প্রথম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত। কাজেই লোকেরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোনরূপ জুলম ও বাড়াবাড়ি ব্যতীতই দ্রব্য বিক্রয় করে ও পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতার বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহর উপর সোপর্দ করা কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা অকারণ বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়।

আর দ্বিতীয় অবস্থায়-লোকদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা যদি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে অথবা চলতি মূল্যের অধিক দাবি করে, এরূপ অবস্থায় প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করাও ওয়াজিব। এ সময় দ্রব্য মূল্য নির্ধারিত করে দেয়ার অর্থ, প্রচলিত দাম লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অর্থ, আল্লাহ তাআলা যে ন্যায়বিচারকে জরুরী ও বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, তা মেনে চলতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা।

জুমুআর সময় কেনা-বেচা হারাম

ইসলামি বাজারনীতিতে সপ্তাহের যে কোন দিন যেকোন সময় ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে তবে জুমুআর সালাত চলাকালীন সময় অর্থাৎ জুমুআর খুৎবা শুরুর প্রথমে প্রদত্ত আযানের পর থেকে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত বাজার কার্যক্রম বন্ধ রাখা অবশ্য কর্তব্য। খোলা রাখা হারাম। মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ-

يايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع.

“হে মুমিনগণ ! যখন জুমুআর দিন যখন সালাতের জন্য আযান আহবান করা হয় তখনই তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বিক্রয় ত্যাগ করো।” (সূরা আল-জুমু‘আ : ৯)

এভাবে ইসলামি অর্থনীতি জনহিতকর ও ভারসাম্যপূর্ণ বাজারনীতি গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য পেশ করেছে, যা আমাদের সুন্দর জীবন গড়তে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন

১. গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রি করা বৈধ নয় কেন ?

ক. বিক্রেতা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় খ. মূল বিক্রেতা ও সাধারণ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

গ. শহরবাসী বিক্রেতা লাভবান হয় ঘ. সাধারণ ক্রেতারা উপকৃত হয়।

২. পণ্যের দোষ-ত্রুটি থাকলে বিক্রেতার কর্তব্য কী ?

ক. দোষ গোপন করা খ. দোষ ক্রেতার নিকট প্রকাশ করা

গ. অন্য লোকের মাধ্যমে দোষ বলে দেওয়া ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. অতিরিক্ত মুনাফার লোভে পণ্য মজুদ করা।

ক. হারাম খ. জায়িয

গ. মোবাহ ঘ. মাকরূহ।

৪. কোন সময় কেনা-বেচা জায়েয নয়-

ক. আযানের সময় খ. সালাতের সময়

গ. জুমুআর সালাতের সময় ঘ. ঈদের দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলাম স্বাধীন বাজারনীতি পেশ করেছে- আলোচনা করুন।

২. কোন ধরনের দালালী জায়েয আর কোন ধরনের দালালী জায়েয নয়? লিখুন।

৩. ভেজালদ্রব্য বিক্রয়ের পরিণতি কী ? লিখুন।

৪. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার বিধান কী ? বর্ণনা করুন।

৫. কোন সময় কেনা-বেচা বৈধ নয় ? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কুরআন-হাদীসের আলোকে বাজারনীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

মুদ্রা বিনিময়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মুদ্রার পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- মুদ্রা বিনিময়ে ইসলামি অর্থনীতির বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্রেডিট নোটের শরঈ বিধান আলোচনা করতে পারবেন।
- হাওয়ালা (Novation) ও চেকের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রার পরিচয়, গুরুত্ব ও লাভ-ক্ষতি বলতে পারবেন।

মুদ্রা প্রচলনের গোড়ার কথা

আমরা সবাই কম-বেশী জানি যে, এক সময় পৃথিবীর সব দেশে পৃথিবীর পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেন-দেন হত। মানুষ ধীরে ধীরে আরো বেশী সভ্য হতে লাগল। তারা উন্নতর পর্যায়ে পদার্পন করল। তারা অনুভব করতে লাগল যে, এমন এক ধরনের মাধ্যমের ব্যবহার করা প্রয়োজন যার বিনিময়ে পণ্য ক্রয় কিংবা বিক্রয় করা যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগও অনেকটা পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসায় চলত। পরবর্তীতে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মুদ্রার সাধারণ ব্যবহার শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তাম্র, দস্তা ও কাগজের মুদ্রার প্রচলন ঘটে। কাগজের মুদ্রা বহন করতে সহজ বিধায় এর চাহিদা ও জনপ্রিয়তা গোটা পৃথিবী জুড়ে বিদ্যমান।

মুদ্রার পরিচয়

মুদ্রার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে অধ্যাপক জিভেন্স বলেন- "মুদ্রা হচ্ছে ধাতু নির্মিত এমন কতগুলো টুকরা যার ওজন এবং অকৃত্তিমতা তার উপর অঙ্কিত নকশা দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

এ সংজ্ঞাটি যখন দেয়া হয় তখন হয়তোবা ধাতু নির্মিত মুদ্রা ব্যতীত কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রার সাথে সংগতি রেখে বলা যায়-

মুদ্রা হচ্ছে ধাতু বা কাগজ নির্মিত এমন কতগুলো টুকরা যার ওজন ও অকৃত্তিমতা তার উপর অঙ্কিত নকশা দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় মুদ্রা বিনিময় বলতে বুঝায়-

بيع النقد بالنقد جنسا بالجنس او بغير جنس اى بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة مصوغا او نقدا.

একই জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে কিংবা কোন মুদ্রাকে ভিন্ন কোন মুদ্রার বিনিময়ে নগদ ও সমপরিমাণ মুদ্রায় বিক্রয় করাকে মুদ্রা বিনিময় বুঝায়। যেমন স্বর্ণের সাথে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের সাথে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের সাথে রৌপ্যের বিনিময় করা।

পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হলে অনেক ঝামেলাপূর্ণ কাজ। মুদ্রা বিনিময়ের ফলে এ কাজ অনেক সহজ হয়। মানুষের জীবন যাত্রা সহজ করার উদ্দেশ্যে মুদ্রা বিনিময় শুরু হয়।

ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব

নবী করীম (সা)-এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের পরিবর্তে মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় কার্য সম্পাদনের প্রথা চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইসলামি অর্থনীতি এবং শরীয়াতী বিধানে যাকাত, দেন-মহর প্রভৃতি যা কিছুর আদেশ করা হয়েছে, তা পণ্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারা আদায় করা হয়। খারাজ, জিজিয়া ও শুল্ক ইত্যাদিও মুদ্রায় আদায় করা ছাড়া ভিন্ন উপায় নেই। এতদ্ব্যতীত মজুরী, পারস্পরিক ব্যবসায় কিংবা একজনের মূলধনে অপরের ব্যবসায় পরিচালনাও এরই সাহায্যে সম্ভব। ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব এ থেকে অনুধাবন করা যায়। উল্লেখ্য, এই মুদ্রা প্রস্তুত করা, এর মূল্য নির্ধারণ এবং

প্রয়োজন অনুযায়ী এর প্রবর্তন করার অধিকার একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রেরই রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সনদ ব্যতীত কোন মুদ্রাই জনগণের মধ্যে চালু এবং পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

উপরন্তু প্রয়োজন অনুভূত হলে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোটও ব্যবহার করা যেতে পারে। হযরত উমর ফারূক (রা) প্রয়োজন দৃষ্টে চর্মনির্মিত নোট ব্যবহার করেছিলেন।

ইসলামের প্রথম অধ্যায়ে নোটের পরিবর্তে আর একটি জিনিস ব্যবহার করা হত। কোন ব্যক্তি বহুদূর পথে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সে স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায় ভারী মুদ্রা সঙ্গে না নিয়ে তা হতে অত্যধিক মূল্যে হীরা-জহরত ক্রয় করে নিয়ে যেত এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তা বিক্রয় করে সে দেশে প্রচলিত নগদ মুদ্রা লাভ করত। বর্তমান কালে মানুষ ব্যাংকের নোট বা চেক নিয়ে অনুরূপ সুবিধা লাভ করে থাকে।

মুদ্রা বিনিময় নীতি

মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ৪টি শর্ত কার্যকর করতে হয়।

১. মুদ্রা লেন-দেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে তা উভয়ের গ্রহণ করতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতির পর যদি লেন-দেন না করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা কার্যকর করা যাবে না। রাসূল (সা) বলেছেন-

الذهب بالذهب بمتل بمتد يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد.

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ লেন-দেনের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হবে এবং নগদ হতে হবে এমনিভাবে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য আদান-প্রদানের বেলায় সমপরিমাণ হতে হবে এবং নগদ হতে হবে।

২. মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে এক জাতীয় মুদ্রা হলে তা অবশ্যই সমপরিমাণ হতে হবে। কম-বেশ করা যাবে না। তাই একভরি স্বর্ণের বিনিময়ে একভরি স্বর্ণের বিনিময় হতে হবে। বেশী বা কম হতে পারবে না।

এক্ষেত্রে পরিমাণটাই মূল্য হিসেবে ধর্তব্য গুণ বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই নতুন ১০০ টাকার নোটের বিনিময় পুরাতন ১০০ টাকা লেন-দেন বৈধ। অতিরিক্ত কোন টাকা দেয়া যাবে না।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন মার্কেটে সচল ছেড়া টাকা কিংবা পুরাতন টাকার বিনিময়ে নতুন টাকার লেন-দেন করার প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন টাকার মূল্যমানের চেয়ে পুরাতন টাকা বেশী দিয়ে লেন-দেন হয়। যেমন ছেড়া ১০৫ টাকার বিনিময়ে নতুন ১০০ টাকার লেন-দেন করা।

বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী এ ধরনের মুদ্রা বিনিময় বৈধ নয়। তবে অতিরিক্ত টাকা যদি বিনিময়কারীর আনুষঙ্গিক খরচ ও পারিশ্রমিক বাবদ হয় তবে তা বৈধ হবে। তাই বলা যায়, ব্যাংকের জন্য এ ধরনের লেন-দেন বৈধ হবে না কিন্তু সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তি / কোম্পানীর জন্য বৈধ হবে।

সমপরিমাণ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে রাসূল (সা)-এর বাণী- الذهب بالذهب مثلا بمثل স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের লেন-দেন সমপরিমাণ হতে হবে।

পুরাতন ও নতুন মুদ্রার মান সমান হবার ব্যাপারে ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি হচ্ছে-

جيدها و رديئها سواء মুদ্রার ভাল ও মন্দ উভয়ের মান সমান।

৩. মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা কিংবা ফেরৎদানের বা ফেরৎ নেয়ার এখতিয়ার থাকবে না। কারণ শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা বা ফেরৎ দানের ইখতিয়ার থাকাকালে ক্রয়কৃত দ্রব্যে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

অবশ্য ত্রুটিজনিত কারণে ফেরৎ দেয়ার ইখতিয়ার থাকতে পারে। মুদ্রা দেখেগ্রহণ করা না করার ইখতিয়ার থাকতে দোষ নেই। কারণ এ ধরনের ইখতিয়ারের মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

৪. বাকীতে মুদ্রা বিনিময় করা যাবে না। কারণ বিক্রিত মুদ্রাও ক্রয়কৃত মুদ্রা বিক্রয় করার সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার পূর্বেই গ্রহণ করা জরুরী। অন্যথায় এতে সুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে যদি বাকীতে মুদ্রা বিনিময়ের চুক্তি পাকাপোক্ত হয় এবং ব্যবসায় সম্পন্ন হবার সময়ই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নগদ আদান-প্রদান করে তবে তা বৈধ হবে।

অর্থনীতিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যই হচ্ছে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার মাপকাঠি। যে অর্থ যে কোন দেশের মুদ্রার সাথেই স্বর্ণ বা রৌপ্যের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তবু কাগজের মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় বৈধ, যদিও কোন কোন ইসলামি আইনবিদ একে না জায়িয বলেছেন।

কাগুজে মুদ্রার সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় জায়িয হওয়ার ব্যপারে প্রমাণ হচ্ছে রাসূল (সা)-এর বাণী-

اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.

যখন ভিন্ন জাতীয় মুদ্রার মাঝে লেন-দেন হয় তখন যেমন ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এতে সুদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়নীতি

বর্তমানে ব্যবসায়ী পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় চলছে। যখন বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তখন তারা মুদ্রা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে মুদ্রা গ্রহণ করে এবং সে জন্য তাদেরকে বাট্টা প্রদান করে।

কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি এ ধরনের বিনিময় প্রথাকে অসংগত ঘোষণা করেছে এবং এরূপ বিনিময়ের মাধ্যমে বাট্টা বাবদ যা কিছু নেওয়া হয়, তাকে সুদ বলে অভিহিত করেছে। কেবল ক্রেডিট এক্সচেঞ্জ-ই সুদ হয় না, নগদ আদান-প্রদানের সময়ও যা কিছু বাট্টা দেয়া-নেয়া হয় তাও সুদ।

নবী করীম (সা)-এর বাণী হতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এক দেশের মুদ্রা মূল্য যদি অন্যান্য দেশের মুদ্রা-মূল্যের সমান হয়, তবে এ উভয় দেশের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় সমান পরিমাণে নগদ আদান-প্রদানেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (সা) বলেছেন-

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين.

"একটি স্বর্ণ মুদ্রাকে দু'টি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে এবং একটি ধাতব মুদ্রাকে দু'টি ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করবে না।"

অন্য একটি হাদীসে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময়-হার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে এ ভাবে ঃ

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

স্বর্ণ-মুদ্রা স্বর্ণ-মুদ্রার সাথে এবং ধাতব মুদ্রা ধাতব মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যেতে পারে ; কিন্তু তাতে কোনরূপ কম-বেশী করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী অর্থনীতিবিদগণই উল্লিখিত হাদীস দু'টির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। মুদ্রা বর্তমানে এক দেশের মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশের মুদ্রা গ্রহণ করার জন্য বাট্টা দিতে হয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা বাট্টা দেওয়ার বৈধ মনে করে না। ইসলামি অর্থনীতি সমগ্র দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রার প্রচলন করার পক্ষপাতী। বস্তুত বর্তমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামি বিধান অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন উত্তম পন্থা নেই। বিনিময় সমস্যা ও বিনিময়-গোলক ধাঁধার দরুন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য বর্তমান সময় অত্যন্ত জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বনবীর এই চির সত্য বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মান ওজন সমান করে নিত এবং বাট্টা দেয়া-নেয়ার প্রথা চিরতরে বন্ধ করে দিত, তবে বিশ্বের মানবসমাজ নানাবিধ অসুবিধা হতে রক্ষা পেত, ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধ হত ; প্রাচুর্য ও দারিদ্রের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হত। অনুরূপভাবে একটি বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও অনেকখানি উন্মুক্ত ও সুগম হত।

প্রতিশ্রুতি-পত্র (Letter of credit)

নগদ টাকার পরিবর্তে ক্রেডিট নোটের (প্রতিশ্রুতি পত্রের) মাধ্যমেও অনেক সময় পণ্য দ্রব্যের বিনিময় কিংবা শ্রমের মজুরীর আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে যখন ক্রেতা এক স্থানে এবং বিক্রেতা বহু দূরবর্তী অন্য এক দেশে থেকেও পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয় করছে এবং ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাচ্ছে তখন এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ক্রেডিটের সংজ্ঞা প্রদান করে অধ্যাপক লক বলেন- এক সীমাবদ্ধ সময়ে অর্থ আদায় করার আশাই হচ্ছে ক্রেডিটের মূল কথা। ভবিষ্যতে টাকা আদায় করার প্রতিশ্রুতিতে হুন্ডি, চেক, সরকারী প্রমিসরী নোট, ব্যাংকের জারী করা নোট এবং পোষ্টাল অর্ডার ও মানি অর্ডার ইত্যাদিই ক্রেডিটের বিভিন্ন রূপ। ডঃ থামস-এর কথায় ক্রেডিট নোট মূলত নগদ টাকারই বিকল্প মাত্র। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সাহায্যে ব্যাপকভাবে বিনিময়কার্য সম্পন্ন করা সহজ এবং ঋণ-আদায় করায়ও প্রভূত সুবিধা হয়ে থাকে।

প্রমিসরি নোট ইস্যু করার প্রথা ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) মক্কা নগরে ইরাকগামী লোকদের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করতেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতা ইরাকের গভর্ণর মুদআর বিন জুবাইর (রা)-কে লিখিত পাঠাতেন, লোকেরা তাঁর নিকট হতে এ টাকা আদায় করে নিত।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)-এক শহরে ব্যবসায়ীদেরকে পণ্য দিতেন এবং অন্য এক শহরে তার মূল্য গ্রহণ করতেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) হিজাজে লোকদের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করতেন এবং ইরাকে তা আদায় করতেন; কিংবা ইরাকে টাকা গ্রহণ করতেন এবং হিজাজে তা ফেরত দিতেন।

মোটকথা, হুন্ডীর মারফত উল্লিখিতরূপে টাকার আদান-প্রদান করা ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে বৈধ ; তবে শর্ত হচ্ছে এটা একই প্রশাসন স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে হতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হুন্ডি ব্যবসায় হলে দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে, তখন তা চোরা চালানীর পর্যায় গণ্য করা হয় আর ইসলামে তা নিষিদ্ধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে হুন্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই। হযরত আলী (রা)-এর মতও এটাই ছিল।

ফকীহ ইবনে সিরীন সম্পর্কে বলা হয়েছে -

انه كان لا يرى بالسفجات بأسا اذا كان على الوجه المعروف.

হুন্ডি-ব্যবহারে তিনি কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। অবশ্য যদি তা প্রচলিত নির্দোষ নিয়মে ব্যবহার করা হয়। হযরত আলী (রা) বলেছেন-

لا بأس ان يعطى المال بالمدينة و ياخذ بافريقة. مصنف ابن ابى شيبة.

মদীনায় পণ্য দিয়ে আফ্রিকায় তা (বা এর মূল) গ্রহণ করায় কোনরূপ দোষ নেই।
বস্তুত এ কাজে কোনরূপ সুদ না নিয়ে কমিশন বা খরচ বাবদ কিছু গ্রহণ করলে তা না জায়িয হওয়ার কোন কারণ নেই। ব্যাংক, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সরকারী সিকিউরিটি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফতে এক শহর হতে অন্য শহরে পণ্য-দ্রব্য কিংবা নগদ টাকা স্থানান্তর করা এবং প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক মজুরী (Establishment Expenditure) বাবদ নির্দিষ্ট হারে কমিশন নেয়া কোনরূপেই অসঙ্গত হবে না। অবশ্য তাতে সুদের প্রথা থাকলে কিংবা এক দেশ হতে অন্য দেশে প্রেরণ করার জন্য বাট্টা গ্রহণ করলে তা কোন মতেই জায়িয হবে না।

হাওয়ালা (Novation)

হাওয়ালার বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন ধরুন-'ক' টাকা পাওনা আছে 'খ'এর নিকট কিন্তু 'ক' নিজে 'গ'এর নিকট ঋণী। এখন এই তিনজনই পরস্পর মিলে সিদ্ধান্ত করল যে, 'গ' 'ক'এর নিকট এবং 'ক' খ'খ'এর নিকট হতে টাকা আদায় না করে 'গ' 'খ'এর নিকট হতে টাকা আদায় করে নিবে। অর্থনীতির পরিভাষায় হাওয়ালাহ বলা হয়।

একাধিক লোকের মধ্যে একই প্রকার বা একই পরিমাণের ঋণ-আদায় করার এটা অতি সহজ পন্থা, সে ন্দেহ নেই। এটা হুন্ডির একটি স্বতন্ত্ররূপ। জার্মান প্রাচ্যবিদ ফনক্রেমার বলেন- হাওয়ালা সম্পর্কে ইসলামি শাস্ত্রবিদগণ যে গভীর আলোচনা করেছেন, তা মুসলমানদের উন্নত ব্যবসায়ী কার্যক্রমের পরিচয় দেয়। ইসলামি অর্থনীতিতে ঋণ-আদায় করার ব্যাপারে এরূপ হাওয়ালা সম্পূর্ণরূপে সংগত।

বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-সংক্রান্ত ঋণ-আদায় করার ব্যাপারে হাওয়ালার (Novation) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটা ফরেন বিল অব একচেঞ্জের স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প হতে পারে এবং শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই নয়, বহির্বাণিজ্যেও এটা দ্বারা অনেক সুবিধা ও পারস্পরিক ঋণ আদায় অনেকখানি সহজ হয়।

চেক

প্রমিসরী নোট হিসেবে বর্তমান সময় চেক-এর যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। চেক মূলত ব্যাংক-মালিকদের নামে একটি নির্দেশনামা মাত্র, তাতে লিখিত পরিমাণ টাকা চাহিবা-মাত্রই চেক-বাহককে আদায় করে দেয়ার নির্দেশ থাকে।
কাজেই নগদ আদায় করার পরিবর্তে টাকা আদায়ের নির্দেশনামা বা চেকের সাহায্যে লেন-দেন করা বৈধ নয়। ইসলামি অর্থনীতির প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেই চেক-এর ব্যবহার শুরু হয়েছিল । বস্তুত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময়ই এর ব্যাপক প্রচলন হয়। মোটকথা চেক ব্যবহারে ইসলামি অর্থনীতিতে কোনরূপ আপত্তি নেই। এর সাহায্যে ধন-বিনিময় কার্য বিপুল পরিমাণে সম্পন্ন হওয়া খুবই সহজ হয়।

মুদ্রা জাল প্রতিরোধ

ইসলামে মুদ্রা জাল করা কঠিন অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এটা সমাজ-শৃঙ্খলা ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিনাশ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টার সমপর্যায়ভুক্ত অপরাধ। এ কারণে যে কোন প্রকার মুদ্রা চূর্ণ বা নষ্ট করা ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين.

মুসলমানের জাতীয় মুদ্রা জাল (বা নষ্ট) করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ কীভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতো ?
ক. স্বর্ণের মাধ্যমে
খ. রৌপ্যের মাধ্যমে
গ. দিরহামের মাধ্যমে
ঘ. পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে।

২. কোন সংস্থা মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী?
ক. রাষ্ট্র
খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. ব্যাংক
ঘ. জীবনবীমা।

৩.মুদ্রা বিনিময় নীতির মধ্যে পড়ে
ক. বাড়াবাড়ি না করা
খ. বাকীতে হস্তান্তর করা
গ. কম-বেশী না করা
ঘ. টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা।

৪. ইসলামের ইতিহাসে কোন খলীফার আমলে প্রমিসরি নোট প্রথা চালু করেন?
ক. হযরত উমর (রা)
খ. হযরত উসমান (রা)
গ. আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা)
ঘ. হযরত যিয়াদ ইবন আব্দুল্লাহ (রা)।

৫. একই রাষ্ট্রের অধীন হুন্ডি ব্যবসায়-এর বিধান কী ?
ক. বৈধ
খ. হারাম
গ. চোরাকারবারীর অনুরূপ
ঘ. মাকরূহ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মুদ্রা কাকে বলে ?
২. ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. মুদ্রা বিনিময় নীতিগুলো আলোচনা করুন।
৪. আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের নীতি কী ? লিখুন।
৫. প্রতিশ্রুতি পত্র কাকে বলে ? এর ভিত্তি কতটুকু বৈধ লিখুন।
৬. ইসলামি অর্থনীতিতে চেক প্রথার বিধান কী ? বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মুদ্রা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

লেনদেনে ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় থেকে সরে দাঁড়ানোর অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার সময়ে যে সকল অধিকার লাভ করবেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ক্রেতা কখন পণ্য ফেরত দিতে পারবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মাধ্যমে স্বীয় চাহিদা পূরণ করা বা উপকার লাভ করা। তাই কোন জিনিস ক্রয় করার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করা, ভালভাবে দেখে নেয়া, ত্রুটিমুক্ত কিনা তা যাচাই করা, প্রয়োজনে পণ্যটি ফেরৎ দেওয়া ইত্যাদির অধিকার থাকা উচিৎ।

অপরপক্ষে বিক্রেতা অনেক সময় ভুলক্রমে বিক্রি করতে পারে, যা সে শুধরে নেয়ার অধিকার কামনা করে। এমনি বাস্তব কিছু সুবিধা-অসুবিধাকে সামনে রেখে ইসলামের বাণিজ্যনীতি ক্রেতা-বিক্রেতাকে এমন কিছু অধিকার প্রদান করেছে যাতে উভয়ে সম্ভব্য ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারে। নিম্নে সে সব অধিকারের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল।

ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে সরে দাঁড়ানোর অধিকার

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনার পর উভয়ে সম্মতি প্রদান করলেই কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।

কখনও এমন হতে পারে যে, ক্রেতা পণ্যকে ভালভাবে যাচাই না করেই ক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করল আবার এমনও হতে পারে যে, বিক্রেতা পণ্যের সঠিক ক্রয়মূল্যের প্রতি খেয়াল না করেই ক্রয়মূল্যের চেয়েও কম দামে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে একমত হল।

উভয়ে একমত হওয়ার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের কিংবা যে কোন একজনের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সম্মতি প্রত্যাহার করার অধিকার।

কারণ, অনেক সময় মানুষ তাড়াহুড়া করে কোন বিষয়ে সম্মতি দিয়ে ভুল করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সে ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ না থাকলে তার জন্য বিপদ হতে পারে। ইসলামি বাজারনীতি এ বাস্তব দিকটি উপলব্ধি করে সম্মতি প্রত্যাহারের অধিকার প্রদান করেছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেছেন-

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صـدقا بينابورك فى بيهما و ان كتما و كذبا محقت بركة بيعهما . (بخارى و مسلم).

"ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে (সম্মতির পর) পরপস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সম্মতি প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। যদি তারা সত্য বলে এবং পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে তবে তাতে বরকত প্রদান করা হবে আর যদি তারা দোষত্রুটি গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তবে তাঁদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনষ্ট হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্য সম্মতি দানের পর উভয়ে যদি আলোচনা বা চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে সম্মতি প্রত্যাহার করার সুযোগ সাধারণত থাকবে না।

ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাস্থল এর ধরন ও সময় সমাজে প্রচলিত নিয়মের আলোকে নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়তের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

বর্তমানে অনেক ক্রয়-বিক্রয় ইন্টারনেট, ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিকে আমলে আনতে হবে।

এধরনের অধিকারকে ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় جيار المجلس বলে।

পণ্য ভালভাবে দেখে নেয়ার অধিকার

ক্রয়-বিক্রয়ে যেসব পণ্যের আদান-প্রদান হয়, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সেসব পণ্য ভালভাবে দেখে নেয়ার অধিকার রাখে।

বর্তমানে যেহেতু মুদ্রার বিনিময়ে লেন-দেন হয়ে থাকে সেহেতু ক্রেতা ভালভাবে পণ্য দেখে নেবেন। কোন দোষত্রুটি থাকলে ক্রয় করবেন না। আবার বিক্রেতা মুদ্রা গ্রহণ করার সময় তা ত্রুটিমুক্ত কিনা, জাল নোট কিনা ইত্যাদি বিষয় দেখে নেবেন। ইসলাম মানুষকে ঠকতে ও নিষেধ করেছে আবার কাউকে ঠকাতেও নিষেধ করেছে। রাসূল (সা) বলেন-

لا ضـرر ولا ضـرار ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না। আবার অন্যের ক্ষতি করাও যাবে না। এ ধরনের অধিকারকে ইসলামি অর্থনীতিতে خيار الرؤية বলে।

পণ্যের দোষত্রুটি জানার অধিকার (خيار العيب)

প্রত্যেকে ক্রেতা সাধারণত পণ্যের বাহ্যিক দোষত্রুটি দেখে ক্রয় করেন। এমন অনেক পণ্য আছে যার বাহ্যিক দিকের চেয়ে তার গুণাগুণই ক্রেতার নিকট মুখ্য। যেমন হালের বলদ দেখতে মোটাতাজা হলেও বলা যাবে না যে সেটা হালেও খুব ভাল। হতে পারে বলদটি দ্বারা হাল চাষ করা সম্ভব নয়। অথচ একজন চাষী ক্রেতার জন্য বলদটির চাষে ভালভাবে হাটার গুণ থাকাই মুখ্য।

এ ধরনের অবস্থায় বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতার পণ্যের দোষত্রুটি জানার অধিকার রয়েছে। বিক্রেতার কর্তব্য হচ্ছে পণ্যের সঠিক তথ্য ও দোষত্রুটি থাকলে তা ক্রেতার নিকট পেশ করা।

হযরত ওকরা বিন আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি-

المسـلم اخو المسـلم لا يحل لمسـلم باع من اخيه بيعا و فيه عيب الابينه (احمد و ابن ماجه).

একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিম থেকে কোন দ্রব্য ক্রয় করলে তিনি তার দোষত্রুটি থাকলে তা বর্ণনা করে না দেয়াটা হালাল হতে পারে না।

ত্রুটিযুক্ত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতা পণ্যের দোষত্রুটি জেনে যদি ক্রয় করে তবে উক্ত পণ্য তার গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

আর যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্যের অন্তর্নিহিত দোষত্রুটি গোপন রাখে এবং পণ্য ক্রয়ের পর ক্রেতার নিকট তা ধরা পরে এমতাবস্থা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ইচ্ছে করলে উক্ত পণ্য বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দানের অধিকার রাখবেন কিংবা পণ্যটি গ্রহণ করে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। বাজারে প্রচলিত ব্যবস্থার আলোকে এক্ষতি পূরণ নির্ধারিত হবে।

মতবিরোধ দেখা দিলে

ত্রুটিযুক্ত পণ্যের কেনা-বেচা সম্পন্ন হয়ে যাবার পর যদি পণ্যের ত্রুটি ক্রেতার নিকট ধরা পরার পর তার ত্রুটিযুক্ত হবার সময় নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় যেমন- ক্রেতা বলল, তোমার নিকট থেকে পণ্য গ্রহণের পরই এ ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে, বিক্রেতা বলল- না, আমার কাছে থাকা অবস্থায় ভাল ছিল। আপনার হাতে পৌঁছার পরই এ ত্রুটির সুত্রপাত হয়েছে। অথচ তাদের কারো নিকট কোন প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। অবশ্য কেউ কেউ শপথসহ বিক্রেতার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

আমরা মনে করি, ক্রেতার মত শপথসহ গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ। কারণ, এক্ষেত্রে ক্রেতা ১০০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত। বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করে তা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবে কিন্তু ক্রেতা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন। তাই প্রথম মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ত্রুটিযুক্ত পণ্য ফেরৎযোগ্য না হলে

এমন অনেক পণ্য আছে যা বিক্রয়ের পর ত্রুটি ধরা পড়লে তা ফেরৎ দেয়া সম্ভব হয় না। যেমন- ডিম একজন ক্রেতা একটি ডিম কিনল। বাড়ী নিয়ে ডিমটি রান্না করার জন্য ভেংগেই দেখল ডিমটি পঁচা। অথচ এটি বিক্রেতার নিকট হুবহু ফেরৎ দেয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায়, সত্যতা সাপেক্ষে বিক্রেতা পণ্যের সম্পূর্ণ দাম ফেরৎ দেবেন। এজন্যে ক্রেতাকে ডিম ফেরৎ দিতে হবে না। কারণ পঁচা ডিম কোন পণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

ফেরৎদানের পূর্বের উপকারিতা লাভ করা ক্রেতার জন্য বৈধ

ক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর যদি দোষত্রুটি ধরা পরে তবে তা ফেরৎদানের অধিকার ক্রেতার থাকবে। যা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু ক্রয়ের সময় থেকে ফেরৎ দেয়া পর্যন্ত সময়ে ক্রেতা যদি পণ্য দ্বারা কোন উপকার লাভ করে, যেমন- হালের বলদ কেনার পর তা দ্বারা সে তিন দিন হাল-চাষ করে দেখল যে, বলদটি হালের জন্য ভাল নয়। তিনদিন পর সে বলদ ফেরৎ দিল। এদিনগুলো ক্রেতা পণ্যটি দ্বারা যে উপকার লাভ করেছেন এজন্যে তাকে কোন বিনিময় দেয়ার প্রয়োজন হবে না। তার জন্য এতটুকু উপকার গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় পর্যবেক্ষণ করার অধিকার (خيار الشرط)

কোন ব্যক্তি যদি একটি দ্রব্য ক্রয় করার পর শর্ত করে যে, আমি তিন দিন/পাঁচ দিন অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পণ্যটি পর্যবেক্ষণ করে দেখব। যদি পছন্দ হয়, ক্রয় করার বিষয়টি চূড়ান্ত হবে নাহলে ফেরৎ দেব।

এমনিভাবে বিক্রেতাও পণ্যটি বিক্রয় করা বা না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে সময় নেয়ার অধিকার লাভ করতে পারে। আমরা জানি, সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বৈঠক শেষ হয়ে গেলে ক্রয় বা বিক্রয় বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়। কোন কারণ ছাড়া ফেরৎ দেয়ার অধিকার থাকবে না। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করার অধিকার থাকে।
রাসূল (সা) বলেন-

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ বাকী থাকে না তবে (পর্যবেক্ষণের) শর্তসাপেক্ষে সে অধিকার থাকবে।
এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য যে সময় চেয়ে নেয়া হয়েছে তার মেয়াদ শেষ হলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে।

ধোকাপূর্ণ পণ্য ফেরৎদানের অধিকার (خيار الشرط)

বিক্রেতা যদি পণ্যের দাম বৃদ্ধির জন্য ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে, যেমন- দুই তিন দিন দুগ্ধ দোহন না করে গাভীর স্তন বড় দেখানো, বস্তার উপরে ভাল চাউল রেখে এবং ভেতরে মন্দ চাল রেখে তা বেশী দামে বিক্রি করা ইত্যাদি তার জন্য হারাম।
ক্রেতার নিকট এ ধরনের ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয় ধরা পড়লে তিনি পণ্য ফেরৎদানের অধিকারী হবেন। রাসূল (সা) ক্রেতার জন্য এ ধরনের অধিকার সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন-

لا تصروا الابل والغنم , فمن اتباعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسك و ان شاء ردها و صاعا من تمر. (بخارى و مسلم).

"তোমরা উট ও ছাগলের তাসরিয়া কর না। (ক্রেতাকে আকৃষ্ট করতে কয়েকদিন যাবৎ দুগ্ধ দোহন না করার নাম তাছরিয়া) যদি কেউ এমন পশু ক্রয় করে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার পর বিষয়টি ধরা পড়ে তবে তার এ অধিকার থাকবে যে সে হয়তো পশুটি গ্রহণ করবে কিংবা সাড়ে তিন সের খেজুরসহ পশুটি ফেরৎ দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

অবশ্য এ ধোঁকাবাজির কাজই যদি বিক্রেতা ইচ্ছে করে না করেন তবে তা হারাম হবে না। কিন্তু ক্রেতা ফেরৎ দিতে চাইলে তিনি পণ্য ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকবেন।

অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা থেকে পরিত্রাণের অধিকার

ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন পক্ষ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন- বাজারে যে পণ্যটি সাধারণত ১০ টাকায় বিক্রি হয় সেটিকে তিনি ১৫ টাকায় ক্রয় করেন। আবার এমন হতে পারে যে, সাধারণত যে পণ্যটি বাজারে ১০ টাকায় বিক্রি হয় বিক্রেতা ভুলক্রমে সেটিকে ৫ টাকায় বিক্রি করেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা চাইলে পণ্য ফেরৎদানের অধিকারী হবেন। কিংবা বাজার মূল্য পরিশোধ করবেন এবং প্রদত্ত অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ নেবেন।

আবার বিক্রেতা বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পণ্যটি ফেরৎ নিতে পারবেন কিংবা বাজারদর অনুযায়ী পাওনাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে পণ্যটি বিক্রয় করবেন।

কিন্তু কোন কোন ইসলামি অর্থনীতিবিদ মনে করেন, কেবল খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলেই এ নিয়ম কার্যকর হবে। সামান্য ক্ষতিগ্রস্থের বেলায় কার্যকর হবে না। কারণ এতে বাজারে একটি হট্টগোল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। দামের ক্ষেত্রে কতটা ব্যবধান হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হবে তা প্রচলিত নিয়ম দ্বারা ঠিক করতে হবে।

ইকালার অধিকার (اقالة)

অনেক সময় এমন হতে পারে যে, কোন ক্রেতা একটা পণ্য ক্রয় করল তারপর হঠাৎ মনে হল যে, এ পণ্যটি তার মূলত প্রয়োজন নেই।

আবার এমনও হতে পারে যে, বিক্রেতা একটি পণ্য বিক্রয় করার পর তিনি মনে করে দেখলেন বিক্রিত পণ্যটি তার খুবই প্রয়োজন। এধরনের অবস্থায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা ক্রেতা বা বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম ভংগ করার অধিকার দিয়েছে। বিক্রেতার প্রয়োজনে পণ্যটি না বিক্রি করে পারবেন আর ক্রেতাও না কিনে পারবেন। ক্রেতা মূল্য গ্রহণ করে আর বিক্রেতা পণ্য গ্রহণ করে পরস্পরে আলাদা হয়ে যাবেন।

সারকথা

ইসলাম মানুষকে ঠকাতে নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে নিজকে ঠকতে। তাই রাসূল (সা) বলেছেন-

لا ضرر و لا ضرار ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না ও ক্ষতি করা যাবে না। এজন্যে ইসলামি অর্থনীতিতে ক্রেতা-বিক্রেতাকে এমন কতগুলো অধিকার দেয়া হয়েছে যার ফলে কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আমাদের সমাজে ধোঁকাপূর্ণ ও ঠকবাজির ব্যবসায় ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। ইসলামি রাজনীতি বাস্তবায়নের ফলে গোটা জাতি হয়তোবা এ অবস্থা থেকে মুক্তির সুযোগ পেত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক. স্বীয় চাহিদা পূরণ করা
খ. উপকার লাভ করা
গ. বাজারে পণ্যের অভাব সৃষ্টি করা
ঘ. ক ও খ নং উত্তর সঠিক।

২. তাড়াহুড়া করে ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান কী?
ক. সম্মতি প্রত্যাহার করা যাবে
খ. সম্মতি প্রত্যাহার করা যাবে না
গ. ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ বিবেচিত হবে
ঘ. শুধু ক্রেতার সম্মতি প্রত্যাহার করা যাবে।

৩. পণ্য ভালভাবে দেখে নেওয়ার অধিকারকে বলা হয়-
ক. খিয়ারুল মাজলিস
খ. খিয়ারুল আইব
গ. খিয়ারুর রূইয়া
ঘ. বাইয়ে গারার

৪. খিয়ারুশ শর্ত বলতে বুঝায়-
ক. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্রয় করা জিনিসটি পর্যবেক্ষণ করা
খ. দুই-তিন দিন পর জিনিসটি ফেরৎ দেওয়া
গ. কোন জিনিস পছন্দ করা
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খিয়ারুল মাজলিস (خيار المجلس) বলতে কী বুঝায় ? কখন খিয়ারুল মাজলিস বৈধ? আলোচনা করুন।

২. ক্রেতার জন্য পণ্যের দোষত্রুটি জানার অধিকার রয়েছে- আলোচনা করুন।

৩. পণ্যের দোষ কার নিকট থাকা অবস্থায় হয়েছে- সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে সমাধান কী? বর্ণনা করুন।

৪. খিয়ারুল শার্ত (خيار الشرط) বলতে কী বুঝেন ? বর্ণনা করুন।

৫. ইকালার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাব ৫টি অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন ।

পাঠ ঃ ৬

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কি ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ তা বলতে পারবেন।
- কোন মানের পণ্য বিক্রয় বা ক্রয় করা বৈধ নয় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে মাপে কম বা বেশী করার বিধান বলতে পারবেন।

বর্তমান জীবনে মানুষের পারস্পরিক বিভিন্ন পণ্যের আদান-প্রদান অত্যন্ত জরুরী। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সহজেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রেতা অর্থ উপার্জন করে নিজের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে আর ক্রেতা নিজের প্রয়োজনের তাকিদে পণ্য ক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই উপকার লাভ করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম। ইসলামি অর্থনীতি পণ্য লেন-দেনের ক্ষেত্রে কিছু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে কোন ক্রেতা পণ্য ক্রয় করে ঠকবাজের শিকার না হন। আবার বিক্রেতাও যাতে যথেচ্ছ আচরণ করে আল্লাহর সীমারেখার বাইরে চলে না যান।

ইসলাম প্রদর্শিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়নীতি দেশে বাস্তবায়ন করতে পারলে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়নীতির কয়েকটি দিক আমরা এখানে আলোচনা করছি।

১. হারাম জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা হারামঃ যে পণ্যই ক্রয় করা হবে কিংবা বিক্রয় করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত হবে হবে। সাধারণত আল্লাহ তাআলা যেসব পণ্যকে বৈধ বা হালাল করেছেন সেগুলোই পবিত্র অন্য সবকিছু অপবিত্র। হারাম ঘোষিত হবার পর পণ্য ক্রয় করা যেমন হারাম তেমনি বিক্রয় করাও হারাম। এসব পণ্যের মধ্যে শুকর, মদ্য, রক্ত, পুজ, মূর্তি, ক্রুস, প্রতিকৃতি, হারাম খাদ্য পানীয় ইত্যাদি।

এসব পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবার ব্যাপরে রাসূল (সা) বলেন-

ان الله حرم بيع الحرم الميتة والخنزير والاصنام (بخاره ومسلم)

"আল্লাহ মদ্য, মৃত জীব, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র তিনি বলেন-

ان الله حرم شيئا حرم تمنه (ابوداود و احمد)

"আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন"। (আবু দাউদ ও আহমাদ) তা ছাড়া এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায় যদি জায়িয করে দেওয়া হত, তাহলে গুনাহের এসব কাজ ব্যাপক প্রসারতা লাভ করত। জনগণকে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করা হত, তা করার জন্যে সহজতার সৃষ্টি করা হত, লোকদের তার কাছে নিয়ে যাওয়া হত। সেজন্যে লোকদের উৎসাহিত করা হত। কিন্তু যেহেতু এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও তা অর্জন হারাম করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ এসব থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষণে এসব জিনিসের দিকে লোকদের না দৃষ্টি পড়তে পারে, না তা স্মরণ করার কোন কারণ ঘটতে পারে। এসব জিনিসের সংস্পর্শ থেকেই মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছে।

২. বিক্রয়কৃত পণ্যটি উপকারযোগ্য হতে হবেঃ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে বিষয়টি দেখতে হবে তা হলো পণ্যটি উপকারযোগ্য কি-না। কেবল উপকারযোগ্য দ্রব্য ক্রয়-কিংবা বিক্রয় করা যাবে। যেসব পণ্য উপকারে আসে না তা ক্রয় কিংবা বিক্রয় করা যাবে না।

এ নীতির ভিত্তিতে পোকা-মাকড়, সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি সাধারণত বিক্রয় করা যাবে না। তবে কোন উপকার গ্রহণের জন্য যেমন ঔষধ তৈরী করা হলে ক্রয় বা বিক্রয় করলে বৈধ। এমনিভাবে বিড়াল, মৌমাছি, বাঘ, সিংহ, হাতি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ, কারণ এর দ্বারা বিভিন্ন কাজ করানো কিংবা চামড়া ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। এছাড়া ময়ূর জাতীয় দৃষ্টিনন্দন পাখিও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। কেননা, এগুলো খাদ্য হিসেবে কিংবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপকারে না এলেও তার কণ্ঠ বা দৃশ্য আনন্দ প্রদানে মানসিক উপকারিতা নিয়ে আসে।

কুকুর যদি শিকারী হয় তবে তাতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। শিকারীর কাজে বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজে বা বাড়ি, ক্ষেত ইত্যাদির পাহাড়ার কাজে ব্যবহারের মত কোন কর্মে যে কুকুর প্রয়োজন পড়ে না; তা ক্রয় বা বিক্রয় করা যাবে না। কেননা রাসূল (সা) কুকুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৩. বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মালিক কিংবা তার প্রতিনিধিই পণ্য বিক্রয়ের অধিকার রাখেঃ পণ্যের মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করা কিংবা কারো জন্য ক্রয় করা সাধারণত শুদ্ধ নয়। যেমন- স্ত্রীর মালিকানাধীন কোন পণ্যকে স্বামী তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করল, অথবা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীতই স্বামী তার স্ত্রীর পণ্য দ্রব্য ক্রয় করল। এ ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কে ইসলামি অর্থনীতির ভাষায় একে بيع القولى বলে।

এ ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সাধারণত শুদ্ধ নয়। তবে পণ্যের মালিক জানার পর যদি সম্মতি দেয় কিংবা যার জন্য ক্রয় করা হয়েছে তিনি সম্মতি দেন তবে তা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

বিশুদ্ধ হবার ব্যাপারে দলীল হল-

عن عروة البارقى انه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدينار لا شترى له به شاة , فاشتريت له به شاتين – بعغت احداهما بدينار و شاة فقال لى بارك الله فى صفقة يمينك –(بخارى)

"হযরত উরওয়া আলবারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) আমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা একটি ছাগল ক্রয় করতে পাঠালেন। আমি তার জন্য ২টি ছাগল ক্রয় করলাম। দুটি ছাগলের একটি আবার একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। অতঃপর তার নিকট আমি একটি ছাগল ও একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ চলে এলাম। তিনি (সবকিছু জেনে) বললেন- আল্লাহ তোমার দক্ষিণ হস্তের পণ্যে বরকত দান করুন। অর্থাৎ তোমার ক্রয়কৃত পণ্যে।" (বুখারী)

হাদিসটি মূলক্রেতার অনুমতি ব্যতীত ১টির পরিবর্তে দুটি ছাগল ক্রয় করা এবং পুনরায় একটি বিক্রিয় করার বৈধতা প্রমাণ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে পরবর্তীতে তার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

৪. ক্রয় বা বিক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তান্তরযোগ্য ও ধোঁকামুক্ত হতে হবে। যে ধরনের ক্রয় বিক্রয়ে পণ্য অজ্ঞাত বা ধোঁকা দেওয়ার ও খাওয়ার কিংবা এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থাকার কারণে পারস্পরিক ঝগড়া হওয়ার আশংকা থাকে, তা নীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যেমন পুরুষ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের যে জিনিস বা উষ্ট্রীর গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে, তা বিক্রয় করা কিংবা উড়ন্ত পাখী বা পানির মধ্যে অবস্থিত মাছ অথবা এ ধরনের অজানা পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা।

নবী করীম (সা)-এর সময়ে ক্ষেতের ফসল বা বাগানের ফল পাকার পূর্বেই বিক্রয় করে দেওয়া হত। বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পর অনেক সময় নৈসর্গিক কারণে ফল ধ্বংস হয়ে যতে, ফসল বিনষ্ট হত। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হত। বিক্রেতা বলত, আমি তো বিক্রয় করে দিয়েছি। ক্রেতা বলত, যে ফল বিক্রয় করেছ, সেই ফল-ই নেই। এ কারণে নবী করীম (সা) ফল-ফসল পাঁকার পূর্বে বিক্রয় করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ফল কাটা সাব্যস্ত হলে তা জায়েয হতে পারে। শস্যের মঞ্জরী বা শিষ সাদা হওয়া ও বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

"তোমরা কি চিন্তা করেছ, আল্লাহই যদি ফল বন্ধ করে দেন, তখন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মাল (টাকা) কিসের বিনিময়ে গ্রহণ করবে ?" (বুখারী)

অজ্ঞাত পণ্য মাত্রই যে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এমন কথা নয়। কোন কোন পণ্য অনেকাংশে অজানা থেকে যায়। যেমন কেউ যদি কোন পাকা বাড়ী ক্রয় করে, তাহলে তার ভিত্তি ও প্রাচীরসমূহের ভিতরকার অবস্থা ক্রেতার অগোচরেই থেকে যায়। সে বিষয়ে কিছু জানা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তার অন্যান্য সবদিকই ক্রেতা ভাল করে দেখতে পারে। তাই যে জিনিস সম্পূর্ণভাবে অজানা, যার কারণে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে কিংবা যার মধ্যে বাতিল পন্থায় লোকদের মাল ভক্ষণ করার অবকাশ থাকে তা নিষিদ্ধ।

অবশ্য যদি কোন জিনিস সামান্যভাবে অজানা হয়, আর এ আংশিক অজানা জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ থাকে তবে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। যেমন মূলা, গাজর, পিয়াজ, কাঁকই, ফুট ও তরমুজের ক্ষেত বিক্রয় করা।

৫. পণ্য বিক্রয়ে মাপে কম দেওয়া যাবে নাঃ পণ্য ক্রিয়ে পাত্র দ্বারা মাপায় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করে কম দেওয়াও এক প্রকারের ধোঁকাবাজি। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সূরা আল-আনয়াম-এর শেষে দশটি উপদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

"পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে।"। (সূরা আল-আ'নাম : ১৫২)
তিনি আরো বলেন-

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

"যারা মাপে ওজনে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়র সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং আর যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়"। (সূরা আল-মুতাফ্ফিফিন : ১-৩)

মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য এ ক্ষেত্রে সাধ্যমত পূর্ণ সুবিচার নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা। কেননা পুরামাত্রার ও প্রকৃত সুবিচার ন্যায়পরায়ণতা হয়ত কল্পনা করা কঠিন। এ কারণেই পূর্ণমাত্রায় পরিমাপ করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছে ঃ "আমরা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের দায়িত্ব কারো উপর অপর্ণ করি না"।

যে সব জাতি তাদের পারস্পরিক কার্যাদি ও লেন-দেনে জুলুম করেছে, বিশেষভাবে পরিমাপে ও ওজনে সুবিচারনীতি লংঘন করেছে এবং লোকদের পণ্য বিক্রয়ে তাদের ঠকিয়েছে, তাদের করুন ইতিহাস কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এসব জাতির কাছে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, তারা তাদেরকে সংশোধন করতে ও সুবিচার নীতির দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। যেমনটি তাদেরকে তাওহীদের বিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করেছেন।

মুসলিম সমাজের জন্যে এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাদের জীবনে লোকদের সাথে সম্পর্কে ও সমস্ত পারস্পরিক কাজকর্মে এ নীতিই তাদের পালন করতে হবে। অতএব দুই রকমের পরিমাপ ও দুই ধরনের পাল্লায় ওজন করে বেচা-কেনা করা তাদের জন্যে বৈধ নয়। একটা নিজের জন্যে মানদন্ড আর একটা অন্যান্য লোকদের জন্যে সাধারণ মানদন্ড, তার নিজের জন্যে ও তার প্রিয়জনদের জন্যে এক রকমের আচরণ এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্যে ভিন্ন রকমের মানদন্ড ইসলামে সম্পূর্ণ অচল। কেননা এরূপ হলে সে নিজের ও নিজের অনুসারীদের প্রাপ্য পুরামাত্রায় আদায় করবে, বেশীও নিয়ে বসবে। আর অপর লোকদের জন্যে কম দেবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু এর মত অবিচার আর কিছু হতে পারে না।

৬. চোরাইমাল ক্রয় করা হারাম। ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তা জেনে শুনে ক্রয় করা মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়, কেননা তা করা হলে অপরহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (সা) বলেছেন-

من اشترى سرقة و هو يعلم انها سرقة فقد اشترك فى اثمها و عارها. بيهقى

"যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল"।
চুরি করার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তার গুনাহ দূর হয়ে যায় না। ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে না প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না।

৭. পণ্য বিক্রয়ে বারবার কসম করা যাবে না। ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যামিথ্যি শপথ-কসম করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সা) ব্যবসায়ীদের শপথ-কসম করতে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা শপথ-কসম করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেন-

الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة – (بخارى.)

"শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা যায় ; কিন্তু বরকত পাওয়া যায় না"। (বুখারী)

বিক্রয়ে বেশী বেশী শপথ-কসম করা নবী করীমের আদৌ পছন্দনীয় নয়। কেননা তাতে প্রথমত চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত তাতে আল্লাহর পবিত্র নামের ইয্যত নষ্ট হওয়ারও ভয় আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থনীতিতে হারাম পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ কেন ? বর্ণনা করুন।
২. বিক্রয়যোগ্য পণ্য উপকারযোগ্য হতে হবে- কথাটির ব্যাখ্যা করুন।
৩. ধোঁকাপূর্ণ পণ্য বিক্রির বিধান কী ? লিখুন।
৪. মাপে কম দেওয়ার পরিণাম কী ? আলোচনা করুন।
৫. চোরাই মাল ক্রয় করা হারাম কেন ? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন
১. ইসলামের দৃষ্টিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নীতিমালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৭

বাগান ও ফল ক্রয়-বিক্রয় নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বাগান বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা বলতে পারবেন।
- ফল কত ধরনের তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাগানের ফল কখন কোন শর্তে বিক্রি করা যাবে, তা বলতে পারবেন।
- বাগানের ফল বিক্রির বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

বাগানঃ

বাগান বলতে সাধারণত আমরা এমন জায়গাকে বুঝি যেখানে গাছ গাছালি রয়েছে। আমাদের আলোচনা মূলত ফলের বাগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাগান ও ফল ক্রয় বিক্রয় বলতে বাগানে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি সংক্রান্ত নীতিমালা বুঝায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

প্রথমতঃ পাকা ফল বিক্রি করা

পরিপক্ক ফল বা পাকা ফল যদি বাগান থেকে তুলে এনে বাজারে বিক্রি করা হয় তা সকল আলেমের মতে বৈধ। অবশ্য সেক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনীতির স্বাভাবিক বাজারনীতি অনুসরণ করতে হবে। যেমন ফল নষ্ট হলে বিক্রি করা যাবে না। মাপে কম দেওয়া যাবে না ইত্যাদি। শষ্য বিক্রির ক্ষেত্রেও একই বিধান।

দ্বিতীয়তঃ গাছে ফল ধরার পূর্বে অগ্রিম বিক্রি করা

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের বাগান যেমন আম বাগান, লিচু বাগান কাঁঠাল বাগান ইত্যাদি গাছে ফল ধরার পূর্বেই মালিক অগ্রিম এক বছরের জন্য বাগানের ফল বিক্রি করে দেয়।

ইসলামি বাজারনীতিতে এ ধরনের বাগান বিক্রি বা বাগানের ফল বিক্রি করা বৈধ নয়। সকল ইসলামি অর্থনীতিবিদ এব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

কারণ, এ ধারনের ফল বিক্রি একটি চুক্তির মাধ্যমে বেশ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি নিয়েমের আওতায় পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين والمعاومة. بخارى و مسلم.

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গাছের ফলকে একাধিক বছরের জন্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

তাছাড়া এ ধরনের বিক্রয়ের মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। যে বাগানে ফল এখনও ধরেনি সে বাগানে পরবর্তী মৌসুমে ফল হতেও পরে আবার নাও হতে পারে। যদি ফল ধরে তবে কি পরিমাণ ধরবে তাও জানা নেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে এ ধরনের বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এ ধরনের ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বেশী। ইসলাম এধরনের ক্ষতিকে সমর্থন করে না। তাই গাছে ফল ধরার পূর্বেই অগ্রিম বিক্রি করা বৈধ নয়। একই নিয়মের অধীনে শষ্যক্ষেতে শষ্য হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না।

তৃতীয়ত ঃ গাছে ফল ধরার পর তা বিক্রি করার নীতি

বাগানে ফল ধরার পর তা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত নীতি অবলম্বিত হবে-

১. গাছে ফল ধরেছে তবে এখনও পরিপক্ক হয়নি। এ ধরনের বাগানের ফল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

ক. বাগানের মালিক অপরিপক্ক ফল বিক্রয় করার সময় এমর্মে শর্ত আরোপ করল যে, ক্রেতাকে বিক্রয়ের পর পরই ফল কেটে নিতে হবে। পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখা যাবে না। তবে এ ধরনের বাগান বেচা-কেনা বৈধ।

খ. বাগানের ফল অপরিপক্ক। বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির সময় ফল তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতা কেটে নিবেন নাকি পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত বাগানে রেখে দিবেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচনা হয়নি। এমন অবস্থায় হানাফী মাযহাবের আলোমগণ বিক্রয় শুদ্ধ মনে করেন। তবে শর্ত না থাকলেও ফল তাৎক্ষণিক কেটে নিতে হবে। অবশ্য বিক্রেতার সম্মতি থাকলে তাৎক্ষণিক কেটে নেওয়া জরুরী নয়।

এ অবস্থায় বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার কারণ হল ফল পরিপক্ক না হলেও উপকারী। মানুষের খাবার যোগ্য না হলেও পশু পাখির খাদ্য হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।

গ. বাগানের অপরিপক্ক ফল যদি এ শর্তে বিক্রি করা হয় যে ফলগুলো পাকা পর্যন্ত বিক্রেতার গাছে থাকবে। এ ধরনের কেনা বেচা বৈধ নয়। কারণ, এতে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানেন না, ফল পাকার সময় পর্যন্ত সবগুলো ফল গাছে থাকবে কি না।

বাগানের পরিপক্ক ফল বিক্রি করা

বাগানের পরিপক্ক ফল বিক্রয়ের সময় কেটে নেওয়ার শর্ত করা হোক কিংবা না করা হোক, কেনা-বেচা বৈধ। কারণ, এ অবস্থায় ক্রেতা স্বাভাবিক কারণে সঠিক সময়ের মধ্যেই লাভবান হতে তার ক্রয়কৃত ফল কেটে নেবেন। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতারও তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে ব্যাপকভাবে এ ধরনের বেচা-কেনা প্রচলিত। শস্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রজোয্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এমন অনেক ফল আছে যা পরিপক্ক হবার পর সম্পূর্ণরূপে পাকতে বেশ কদিন সময় লাগে। এ জাতীয় ফলের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা ফল পাকা পর্যন্ত রেখে দেওয়ার শর্ত না থাকা সত্ত্বেও বাগানে রেখে দেন তবে মালিককে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে কি না ?

ইসলামি ব্যবসায়নীতি এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য করে না। কারণ, এমতাবস্থায় ফলের কোন বৃদ্ধি ঘটেনি।

বিক্রয় এবং ফল কাটার মাঝখানে নতুন ফলের জন্ম হলে তার বিধান

যদি কোন বাগানের মালিক ফল পরিপক্ক হবার পর তা বিক্রি করে দেয় অতঃপর তিনি ফল পাকা পর্যন্ত কেটে না নেন আর এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন ফলের আবির্ভাব ঘটে তবে তার দুটো অবস্থা হতে পারে।

ক. নতুন ফলকে পূর্বের ফল থেকে পার্থক্য করা সম্ভব হওয়া। এমতাবস্থায় বিক্রেতা উক্ত ফলের মালিক হবে কারণ গাছের মালিক হল বিক্রেতা। তিনি পূর্বের ফল বিক্রি করেছেন নতুন গজে ওঠা ফল নয়।

খ. নতুন আবির্ভূত ফল এমনভাবে হয়েছে যে, বিক্রিত ফল থেকে তা আলাদা করা কঠিন। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে ফল বুঝিয়ে দেবার পূর্বে ফল বৃদ্ধি পায় তবে কেনা-বেচার চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। কারণ মিশ্রণের ফলে বিক্রিত ফল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আর যদি ফল বুঝিয়ে দেওয়ার পর এমনটি ঘটে তবে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে অতিরিক্ত ফলের অংশীদার হবে কারণ, মিশ্রণের ফলে দুজনের মালিকানা একত্রিত হয়ে গেছে।

কি পরিমাণ ফলকে অতিরিক্ত ধরা হবে তা নির্ভর করবে ক্রেতার বক্তব্যের উপর। ক্রেতা যে পরিমাণ ফলকে নতুন হিসেবে দাবি করবে সেগুলোকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে সমান ভাবে ভাগ করে নিবে।

বাগান বিক্রির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফল পরিপক্ক হওয়া প্রয়োজন

আমরা জানি যে, কোন বাগানের সকল ফল একই সাথে পরিপক্ক হয় না। একাংশ আগে পরিপক্ক হয় অপর অংশ পরে পরিপক্ক হয়। বাগান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফলের একটি অংশ পরিপক্ক হলেই সম্পূর্ণ বাগানকে পরিপক্ক মনে করে বাগানের সকল ফল বিক্রি করা বৈধ।

এমনকি বাগানের মধ্যে যদি একটি অংশে পরিপক্কতা আসে আর অন্য দু/একটি অংশে পরিকক্কতা না আসে। মালিকের ইচ্ছে থাকে পরবর্তীতে সে অংশও বিক্রি করবে তবে মালিকের জন্য একক পরিপক্ক অংশের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বাগান বিক্রি করা বৈধ।

ফল ও শয্যের পরিপক্কতা বুঝার উপায়

ফল বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোন কোন ফলের পরিপক্কতা তার রং পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝা যায়। কোনটি সবুজ বা হলুদ বর্ণ কিংবা লাল বর্ণ ধারণ করে। যেমন আম, পেপে, লিচু, কলা ইত্যাদি।

কোনটি আবার স্বাদ পরিবর্তনের মাধ্যমে আবার কোনটি নরম হওয়ার মাধ্যমে পরিপক্ক বুঝায়।

আর শস্য সাধারণত শক্ত হতে শুরু করলে পরিপক্কতা আসছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

গাছের উপর থাকা ফল অনুমাণ করে বিক্রয় করা

গাছের ফল তোলার পর পরিমাণ করে কিংবা পরিমাপ করে বা হালি/ডজন/শ/ হাজার হিসেবে বিক্রি করা বৈধ। কোন আলেমই এ ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হন নি।

কিন্তু ফল গাছ থেকে আহরণ করার পূর্বে অনুমাণ করে বিক্রি করা বৈধ কি না সে ব্যাপারে নানা জন নানা মত পেশ করেছেন ।

সকল বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে, যদি পরিপক্কতা লাভ করার পর দক্ষ ও অভিক্ষ ব্যক্তির দ্বারা অনুমাণ করিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে সমজাতীয় ফল ছাড়া অন্য কোন ফলের বিনিময়ে কিংবা মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তবে তা বৈধ।

সমজাতীয় ফল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কারণ তাতে সুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য রাসূল (সা) খেজুরের বেলায় ৫ ওয়াস্‌ক এর কম হলে সমজাতীয় হলেও অনুমতি দিয়েছেন। তাই ফলের ক্ষেত্রেও পরিমাণে স্বল্প হলে গাছের ফলের বিনিময়ে ঘরে থাকা ফল বিক্রি বৈধ হবে ইনশাআল্লাহ। পরিমাণে বেশী হলে বৈধ নয়।

বিক্রিত বাগানের ফল কোন কারণে বিনষ্ট হলে তার বিধান

পরিপক্কতা লাভের পর বাগানের মালিক যদি শুধু ফল (গাছ ছাড়া) কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে এবং ফল কেটে নেওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারণে বাগানে তা নষ্ট হয়, তবে এর দুটো অবস্থা হতে পারে-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- খড়া, শীত, ঝড় ইত্যাতির কারণে সাধারণত ফল তোলার সময় হওয়ার পূর্বেই তা বিনষ্ট হওয়া। এমতাবস্থায় দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তাবে। ক্রেতার পক্ষ থেকে বিনষ্ট ফলের দাম শোধ করতে হবে না। রাসূল (সা) বলেছেন-

ان بعث من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من نمنه شيئا بما تاخذ من مال اخيك بغير حق.

"যদি তুমি তোমার কোন ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর আর তা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায় তবে তার থেকে মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল নয়। আর বিনা অধিকারে কি করে তুমি তোমার ভাইয়ের সম্পদ গ্রহণ করবে ?"

২. ক্রেতা ফল কাটতে প্রচলিত সময়ের চেয়ে বেশী দেরী করেছে। আর এই দেরী করা সময়ে দুর্যোগের কারণে ফসল নষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রেতা এর দায়িত্ব বহন করবেন। তিনি ফল নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবেন।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় ; বরং কোন মানুষের কারণে যদি ফসল বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতা ইচ্ছে করলে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বলবৎ রাখতে পারবেন কিংবা তিনি চুক্তি বাতিল করে দিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. পরিপক্ক ফল/পাকা ফল বাগান থেকে তুলে এনে বাজারে বিক্রি করা
ক. বৈধ খ. হারাম
গ. মাকরূহ ঘ. উচিৎ নয়।

২. বাগানের পাকা ফল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক'টি পদ্ধতি আছে ?
ক. দ'টি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি।

৩. গাছের উপর থাকা ফল কী শর্তে অনুমান করে বিক্রি করা বৈধ?
ক. পরিমাণে কম হওয়া খ. অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অনুমান করানো
গ. সমজাতীয় ফল না হওয়া ঘ. সবগুলো উত্তর সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. গাছে ফল ধরার পূর্বে তা বিক্রি করার বিধান কী ? আলোচনা করুন।
২. অপরিপক্ক ফল বিক্রির ক্ষেত্রে ক'টি ধরন হতে পারে? বর্ণনা করুন।
৩. বাগানের পরিপক্ক ফল বিক্রি করার বিধান কী লিখুন।
৪. বাগানের ফল বিক্রয়ের জন্য কী পরিমাণ ফল পরিপক্ষ হওয়া দরকার? আলোচনা করুন।
৫. বিক্রিত বাগানের ফল কোন কারণে বিনষ্ট হলে তার বিধান বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. বাগানের ফল ক্রয়-বিক্রয় নীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৮

মজুতদারী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- মজুতদারী বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- কী ধরনের অবস্থায় মজুতদারী অবৈধ তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মজুতদারীর বিপক্ষে রাসূল (সা) বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- মজুতদারীর অর্থনৈতিক কুপ্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক থেকেই ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তবে সে স্বাধীনতা ভোগ করার পর্যায়টি যখন লাগামহীন অবস্থায় পৌছে যায়, কিংবা জনসাধারণের ক্ষতির কারণ হয়, তখন তাতে হস্তক্ষেপ করেছে ইসলাম।

হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণে ইসলামি অর্থনীতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। রাসূল (সা) বলেছেন-

ان احب الاعمال عند الله كسب الحلال

"হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় কাজ।"

তাই সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সম্পদ সঞ্চয় করার ক্ষেত্রেও ইসলাম মনুষকে স্বাধীনতা দান করেছে। তবে সম্পদ সঞ্চয় বা জমা করার ক্ষেত্রে লাগামহীন হতে পারবে না। বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে।

যদি কারো নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বেশী পরিমাণ সঞ্চয় করার দ্বারা জনসাধারণের কষ্ট হয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয় তবে তা এমন মজুতদারী যা ইসলামি অর্থনীতি সমর্থন করে না। ইসলাম মজুতদারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মজুতদারীর স্বরূপ

আরবী ভাষায় মজুতদারীকে বলে الاحتكار ইহ্তিফার। احتكار (ইহ্তিফার) শব্দের অর্থ আটকে রাখা, গুদামজাত করে রাখা, মজুদ বা জমা করে রাখা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় যেমন সামান্য কিছু সম্পদ জমা করে রাখলেই মজুতদারী বলা হয় না তেমনি ইসলামি শরীয়তেও কিছু সম্পদ গুদামজাত করার নাম احتكار নয়। ইসলামি শরীয়ত মনে করে, কোন ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাজারে কম থাকা অবস্থায় বেশী পরিমাণ ক্রয় করে গুদামজাত করে রাখা। উদ্দেশ্য এ হয় যে, বাজারে উক্ত পণ্যের যোগান কম হলে ঐ জাতীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। তখন বেশী দামে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সহজ হবে।

মজুতদারীর শরয়ী বিধান

ইসলামি অর্থনীতিতে মজুতদারী করা হারাম, অবৈধ। ইসলামি অর্থনীতির প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন-

من احتكر فهو خاطئ (ابو داود و الترمزى)

"যে ব্যক্তি মজুতদারী করল সে অপরাধী।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন-

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله و برئ الله منه. (رواه احمد والحاكم)

"যে ব্যক্তি ৪০ রাত যাবৎ খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করল সে যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করল আর আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন।" (আহমদ ও হাকিম)

এ ধরনের আরো বেশ কটি হাদীসে রাসূল (সা) মজুতদারীর অবৈধতা ঘোষণা করেছেন।

কখন এবং কি ধরনের মজুতদারী হারাম

ইসলামি অর্থনীতির প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকেই আমরা জানতে পাই, নিম্ন বর্ণিত তিনটি শর্ত পূর্ণ হলেই মজুতদারী হারাম হবে। অন্যথায় গুদামজাত করণ বৈধ।

১. কোন ব্যক্তির নিজের বা তার পরিবারের জন্য এক বছরের প্রয়োজনীয় পণ্যের বেশী সম্পদ গুদামজাত করে রাখা।
২. বাজারে সংকট সৃষ্টি হলে দাম বৃদ্ধি করার আশায় গুদামজাত করা এবং উর্ধ্বমূল্যের সময় অধিক মুনাফায় তা বিক্রি করার পরিকল্পনা করা।
৩. মজুতকৃত পণ্য মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় হওয়া।

এসব শর্তাবলী পর্যালোচনা করে বলা যায়-

নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ১ বছরের প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী গুদামজাত করা বৈধ। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)ই এক বছরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত রেখেছেন।

কেউ যদি বাজারে সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া কিংবা মানুষকে দুঃখে-কষ্টে ফেলে অধিক মুনাফা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পণ্য ক্রয় করে গুদামজাত করে রাখে তা অবৈধ নয়।

এবং মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন- চাল, ডাল, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি ছাড়া অন্যসব পণ্য মজুত করে রাখলে যদি জনসাধারণের ক্ষতি না হয় তবে তা অবৈধ নয়।

মজুতদারী হারাম হবার কারণ

মজুতদারীর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে গরীব-দুঃখী এবং মেহনতি মানুষের কষ্ট বেড়ে যায়। জিনিস-পত্র তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এতে ব্যক্তির দুশ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব কারণে মজুতদারীকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

রাষ্ট্রীয় গুদামজাত করণ

বর্তমানে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি রাষ্ট্র খাদ্য, ঔষধ, কাপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লক্ষ লক্ষ টন মজুত করে রাখে। এগুলো কি মজুতদারীর আওতায় পড়ে না?

কারণ সরকার বাজারে সংকট সৃষ্টির জন্য কিংবা বেশীদামে বিক্রির জন্য এ পণ্য ক্রয় বা মজুত করে না ; বরং সংকট সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলা করার জন্য জনগণের নিকট সংকটের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দিতে এ পণ্য গুদামজাত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১. মজুতদারীকে আরবীতে বলা হয়-

ক. الاحتكار　　খ. الاجتناب

গ. الادخر　　ঘ. الاكرام

২. কি ধরনের সম্পদে মজুতদারী অবৈধ-

ক. শুধু শষ্য　　খ. খনিজ সম্পদ

গ. ফলমূল　　ঘ. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

৩. মজুতদারীর শরয়ী হুকুম কী ?

ক. মাকরূহ　　খ. হারাম

গ. মুস্তাহাব　　গ. মুবাহ।

৪. কত দিনের জন্য খাদ্য-দ্রব্য মজুত করে রাখা বৈধ-

ক. দুই বছর　　খ. ছয় মাস

গ. এক বছর　　ঘ. চল্লিশ দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মজুতদারী বা ইহ্তিকারের শরঈ সংজ্ঞা কী ? লিখুন।

২. মজুতদারী হারাম হওয়ার পক্ষে দুটি হাদীস বর্ণনা করুন।

৩. কোন অবস্থায় কী ধরনের মজুতদারী হারাম, আলোচনা করুন।

৪. ইসলামি অর্থনীতিতে মজুতদারী হারাম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. মজুতদারী কী ? মজুতদারী সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী ? দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ৯

পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- কোন প্রকারের পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ তা বলতে পারবেন
- পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পশু–পাখি মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের অন্যতম অংশ। পশু-পাখি মানুষের জন্য অনেক বড় দুটি নিয়ামত। জীবন ধারনের জন্য মানুষ যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তন্মধ্যে পশু ও পাখির গোশত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরকে সুস্থ, সুন্দর ও কর্মক্ষম রাখতে যেসব খাদ্য ভূমিকা পালন করে তার মাঝে গোশত অনন্য।
তাই চলমান জীবনকে গতিশীল করতে পশু-পাখির ক্রয়-বিক্রয় চলে আসছে। ইসলামি অর্থনীতি পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান সম্মত এবং যুগোপযোগী নীতিমালা পেশ করেছে। সেগুলো পালনের মধ্য দিয়ে সুস্থ সমাজ গঠন সহজ হতে পারে।

পশু-পাখি দ্বারা উদ্দেশ্য

আমরা আমাদের চারপাশে হরেক রকম পশু-পাখি দেখি। সকল প্রকার পশু-পাখির বেচা-কেনার নীতি বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ইসলামি শরীয়তে শুধু হালাল পশুর ও পাখির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। হারাম পশু-পাখির ক্রয়-বিক্রয় হারাম।

পশু ও পাখির মধ্যে সেসব পশু-পাখি হারাম যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন-

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে- মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়- মৃত পশু ভক্ষণ করা হারাম। সুতরাং মৃত পশু ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম।
রাসূল (সা) বলেন-

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذبنات من السماع و كل ذى مخلب من الطير

"রাসূল (সা) হিংস্র প্রাণী এবং নখরযুক্ত পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।"
এ হাদীসের আলোকে বাঘ, সিংহ, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, বিড়াল ইত্যাদি পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম। এমনিভাবে কাক, চিল, শকুন প্রভৃতি পাখির মাংস খাওয়া হারাম। এগুলো বেচা-কেনা করাও হারাম।
অতএব, যেসব পশু-পাখির গোশত ভক্ষণ করা হারাম সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। তবে এমন কিছু পশু বা পাখি রয়েছে যেগুলোর মাংস ভক্ষণ করা হারাম তবে সেগুলোকে বশ করে বা প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কাজে উপকার লাভ করে আসছে।

উপকার গ্রহণ করা বৈধ হবার কারণে সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও বৈধ। যেমন শিকারী কুকুর, শিকারী পাখি ইত্যাদি।

আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বে এক শ্রেণীর পোষা কুকুর বড় বড় অপরাধ চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা বিভাগকে বড় ধরনের সহযোগিতা করতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন দেশের পুলিশ বিভাগ ডগ স্কোয়াড নামে সুনির্দিষ্ট সেল গঠন করে। জনকল্যাণের স্বার্থে এ ধরনের কুকুর / পশু কিংবা পাখি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

ক্রয়-বিক্রয় নীতি

পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা অনুসরণ করা দরকার তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল-

ক. পশু বা পাখিটি এমন হওয়া যার মাংস ভক্ষণ করা হালাল। যেসব পশুর মাংস ভক্ষণ করা হারাম তা ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম। অবশ্য মানব কল্যাণে পোষ মানানো উপকারী পশু-পাখির মাংস ভক্ষণ হারাম হলেও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

খ. মৃত পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ হালাল পশু ইসলামি শরীয়ত স্বীকৃত কারণ ব্যতীত মারা গেলে তা হারাম। এজন্যে এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

মৃত পশু হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير.

"তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের মাংস হারাম করা হয়েছে।" (সূরা আল-মায়িদা : ২)

গ. পশু কিংবা পাখি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ নিজের পোষা কিংবা ক্রয়ের মাধ্যমে স্বীয় আয়ত্বাধীন থাকতে হবে, যাতে বিক্রয় করলে তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যায়।

এ নীতির উপর ভিত্তি করে বন্য পশু বিক্রয় করা কিংবা ক্রয় করা বৈধ নয়। এমনিভাবে আকাশে উড়ন্ত কোন পাখি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। এ ছাড়াও পশুর গর্ভের বাচ্চা বিক্রয় করা বা ক্রয় করা বৈধ নয়, কেননা সেটি তাৎক্ষণিক হস্তান্তরযোগ্য নয়।

ঘ. এ ধরনের পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তিনি বলেন-

قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر (مسلم)

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

ঙ. পশু কিংবা পাখির অবস্থা অবগত থাকতে হবে। مجهول الحال বা অবস্থা অস্পষ্ট থাকতে পারবে না। অর্থাৎ পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার হচ্ছে পশুটি/পাখিটি ত্রুটিমুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। এমনিভাবে বিক্রেতার দায়িত্ব হল কোন ত্রুটি থাকলে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

এ নীতির উপর ভিত্তি করে যেসব প্রাণীর প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না তা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। এ কারণে গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয় করা বা বিক্রি করা বৈধ নয়। জানা নেই বাচ্চাটি জীবিত নাকি মৃত। মোটা না চিকন। তাছাড়া এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন-

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع حبل الحبلة – (مسلم)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন- রাসূল (সা) গর্ভবতী পশুর বাচ্চাকে বিক্রিয় করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

উল্লেখ্য হাদীসটির এ ছাড়া ভিন্ন অর্থও করা হয়েছে। এটি অন্যতম একটি ব্যাখ্যা।

চ. ক্রয়-বিক্রয় প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। আমাদের সমাজে সাধারণত গৃহপালিত পশুর ক্রয়-বিক্রয় বেশী হয়ে থাকে। অনেক বিক্রেতা গৃহপালিত পশু বিশেষ করে গরু, ছাগল বিক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন- যেসব গৃহপালিত প্রাণীর দুধের পরিমাণ বেশী হলে ক্রেতা আকৃষ্ট হয় সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দুগ্ধদানকারী পশুকে ২/৩ দিন দুগ্ধ দোহন করে না, ফলে স্তন বড় দেখা যায়। ক্রেতা প্রথম দর্শনে পশুটিকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দানকারী মনে করে। তখন ক্রেতা প্রতারিত হয়ে তুলনামূলক বেশী দামে পশু ক্রয়ে আগ্রহী হয়। ইসলামের বাজারনীতিতে এ ধরনের প্রতারণামূলক বিক্রয়কে بيع المصراة (বাইয়ে মুসাররাত) বলে।

আবার হালের বলদ বিক্রির সময় অনেক বিক্রেতা বলদটি হালে ভাল বুঝাতে লাঠির আগায় কাঁপিন লাগিয়ে তার দ্বারা খোঁচায়, বলদটি লাফালাফি বা জোরে হাঁটে এবং ক্রেতাকে প্রতারণা করে।

এ ধরনের প্রতারণামূলক বিক্রয় ইসলামি বাজারনীতিতে অবৈধ / হারাম।

রাসূল (সা) বলেন-

من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام . ان شاء امسكها و إن شاء ودها و رد معها صاعا من تمر. (مسلم)

"যে ব্যক্তি ক্রেতাকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে দুগ্ধ দোহন ২/৩ দিন পরিহার করে বকরীর ওলান বড় করে বিক্রয় করল। তিনি তিনদিন সময়ের জন্য এখতিয়ার পাবেন। এই তিন দিন পর্যবেক্ষণ করে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবেন, নতুবা ফেরৎ দেবেন। অবশ্য ফেরৎ দিতে চাইলে এক সা (সাড়ে তিন সের) খেজুর সাথে ফেরৎ দিতে হবে।"এ ধরনের প্রতারণায় আশ্রয় নিয়ে কেউ যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করে ফেলে তার বিধান বর্ণনায় ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞগণ মতবিরোধ করেছেন। কাজটি হারাম হলেও ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে নিম্ন বর্ণিত দুটো কাজের যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে।

১. তিনি যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মেনে নেবেন। কিংবা দুধের পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে কম হওয়ায় বর্ণনা অনুযায়ী যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তত টাকা বিক্রেতার নিকট থেকে ফেরৎ নেবেন।

২. তিনি পশুটি মালিককে ফেরৎ দেবেন। আর তিনি দোহনকৃত দুধের সমপরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে তিন সের খেজুর বিক্রেতাকে পশু ফেরৎ দেওয়ার সাথে ফিরিয়ে দেবেন।

বর্ণিত মূলনীতিগুলো ছাড়া অন্যান্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে যেসব নীতিমালা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রচলিত সেসব সাধারণ বিধিমালা পশু-পাখির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় হারাম পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান কী ?
ক. হরাম পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ
খ. হারাম পশু-পাখি ক্রয-বিক্রয় মাকরূহ
গ. হরাম পশু বিক্রি হারাম পাখি বিক্রি হালাল
ঘ. মানব কল্যাণে ব্যবহৃত পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

২. মৃত পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান হল-
ক. মৃত পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয় হারাম
খ. মৃত মুরগী হালাল, অন্যান্য প্রাণী হারাম
গ. হালাল পশু-পাখি মৃত হলেও হালাল
ঘ. মাছ ব্যতীত কোন মৃত প্রাণী হালাল নয়।

৩. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের নীতিমালা ক'টি ?
ক. পাঁচটি
খ. ছয়টি
গ. সাতটি
ঘ. চারটি।

৪. গর্ভবতী পশুর বাচ্চা বিক্রি করার বিধান কী ?
ক. অবৈধ
খ. বৈধ
গ. মাকরূহ
ঘ. মুবাহ।

৫. বকরী বা গাভীকে ২/৩ দিন দোহন না করে ওলান বড় দেখিয়ে বিক্রি করাকে-
ক. বাইয়ে মুসাররাত বলে
খ. বাইয়ে সালাম বলে
গ. বাইয়ুল আইব বলে
ঘ. বাইয়ুল খিয়ার বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কী ধরনের পশু-পাখি ইসলামি শরীয়তে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গণ্য করা হবে ?
২. ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য পশু কিংবা পাখি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া শর্ত-ব্যাখ্যা করুন।
৩. ইসলামি বাজারনীতিতে পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি নীতি উল্লেখ করুন।
৪. বাইয়ে মুসাররাত কী ? বাই মুসাররাত-এর বিধান লিখুন।
৫. পশু-পাখির গর্ভকালীন বাচ্চা বিক্রয় করার বিধান বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. পশু-পাখি ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামি নীতিমালা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন।

পাঠ ঃ ১০

বৈদেশিক বাণিজ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলামি অর্থনীতি আমদানীর ক্ষেত্রে যেসব নীতির প্রতি উৎসাহিত করে তা বলতে পারবেন।
- রপ্তানির ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের করণীয় কি, তা আলোকপাত করতে পারবেন।

আমরা সকলেই ভালভাবে বেঁচে থাকতে চাই। অতীতে যারা ছিলেন তারাও চেয়েছেন। বেঁচে থাকতে চাইলে জীবনের চাহিদাগুলো পুরণ করা প্রয়োজন। আদিমকালে মানুষ স্বীয় শ্রম বলে তার চাহিদা পূরণ করত। যখন যা প্রয়োজন হত তা সংগ্রহ করতে ছুটে যেত এখানে-সেখানে। রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা তখন ছিল না। পরবর্তীতে মানুষ আরো বেশি সভ্য হতে শেখে। সামাজিক হয়। জাতি ও অঞ্চলভেদে ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হয় পৃথিবীর ভূখন্ড।

কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টির এ ভূখন্ড সর্বত্র এক ধরনের নয়। কোন দেশের ভূখন্ড হয়তো ধান চাষের উপযোগী আবার কোন দেশের ভূখন্ড পাট চাষের জন্য অধিকতর উপযোগী। উপযোগিতা না থাকলে শতচেষ্টা করেও ধান চাষের জমিতে উন্নত পাট চাষের আশা করা বৃথা। তাই দেশের জমির উপযোগিতা অনুযায়ী অল্প পরিশ্রমেও কম খরচে ফসল উৎপাদনে ব্রতী হওয়া প্রতিটি দেশের কর্তব্য। দেশের মানুষের সকল চাহিদা পূরণ করার মত সকল প্রকার সম্পদ একটি দেশে উৎপাদন করা অনেক সময় সম্ভব নয়। তাই তাকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অন্যথায় সেদেশ স্বীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

এভাবে দেশের প্রয়োজন অনুসারে অন্য দেশ হতে প্রয়োজনীয় পণ্য আনার ব্যবস্থা করা এবং নিজ দেশের প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্য অন্য দেশে বিক্রি করার নাম বৈদেশিক বাণিজ্য। আধুনিক সভ্যতার যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত কোন দেশই ভালভাবে চলতে পারে না।

ইসলামি অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি স্বাভাবিক কারণে গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের উন্নয়ন মানে জনগণের উন্নয়ন। ইসলাম চায় তার জনগণ সবার উপর মর্যাদাবান হোক। রাসূল (সা) বলেন-

الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه .

"ইসলাম সবার উপর সুউচ্চ হতে চায় তার উপর কাউকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হতে দিতে চায় না।" এ মূলনীতির আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারেও ইসলামি অর্থনীতি এমন মূলনীতি অবলম্বন করে থাকে যার ফলে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করা যায়।

উন্নয়নের চাবিকাঠি

একটি দেশের অর্থনীতির অধিক উন্নয়ন তখন হয়, যখন সে দেশে উৎপন্ন দ্রব্য বৈদেশিক বাজারে অধিক পরিমাণে বিক্রি করতে পারে। অন্য দেশ হতে পণ্য কম আমদানী করে।

দেশের গার্হস্থ্য ও বৃহৎ শিল্পোৎপন্ন পণ্য হতে অধিক মুনাফা অর্জন করতে প্রত্যেক দেশের তিনটি বিষয়ে নজর দিতে হয়।

১. শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিজ দেশ হতে সংগ্রহ করতে হবে।
২. কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদন করার মত প্রয়োজনীয় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. বৈদেশিক পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে বৈদেশিক পণ্য দেশের অভ্যন্তরে টিকতে না পারে।

আমদানী ও রপ্তানি

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, বৈদেশিক বাণিজ্যের মূলকথা হচ্ছে আমদানী ও রপ্তানি করা।

কোন দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হলে সে দেশের মূলধন বৃদ্ধি পায়। সেদেশের বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তি সম্ভব হয়। আর রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হলে সেদেশের ধনভান্ডার শূন্য হয়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এজন্য ইসলামি অর্থনীতি রপ্তানী ও আমদানীর ক্ষেত্রে এমন কিছু মূলনীতি অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করে যাতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

রপ্তানী নীতি

একটা দেশ সাধারণত অন্য দেশের নিকট তিন ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে।

১. শিল্প পণ্য

২. কাঁচামাল
৩. বিলাস দ্রব্য।
এসব দ্রব্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে যেসব নীতি অবলম্বন করা দরকার তা হল-

শিল্প পণ্য

ক. দেশের চাহিদার তুলনায় বেশী পরিমাণ শিল্পপণ্য উৎপাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। শিল্প পণ্য এত বেশী উন্নত করতে হবে যাতে তা বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়।
খ. যতদিন পর্যন্ত নিজে দেশের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পণ্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন করা সম্ভব না হয়। ততদিন বৈদেশিক পণ্য আমদানীর ব্যাপারে এমন নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে যেন দেশী শিল্প প্রসারের অনুকুল পরিবেশ তৈরি হয়।
গ. দেশের প্রয়োজনীয়াতিরিক্ত শিল্পপণ্য বৈদেশিক বাজারে বিক্রয় করার কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কাঁচামাল

কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য ঃ
ক. দেশের কাঁচামাল শিল্প পণ্য তৈরির কাজে ব্যবহার করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ইসলামি সরকারের দায়িত্ব। তাই কাঁচামাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে দেশী শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় এবং যথাসম্ভব কম মূল্যে সংগ্রহ করা যায়।
কাঁচামাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ না করে যদি তা বিদেশে ব্যাপক হারে রপ্তানী করে বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করতে হয় তবে নিজ দেশের শিল্পের কখনও উন্নতি সাধিত হবে না।
উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের পাটের কথা বলতে পারি। বাংলাদেশ যদি উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানী করে নিজ দেশে বস্তা, ছালার চট বা পাটজাতীয় দ্রব্য তৈরী না করে তবে এদেশের মানুষ বিদেশ থেকে প্রস্তুতকৃত পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হবে। ফলে বিদেশীরা এর মাধ্যমে মুনাফা লুটবে অথচ বাংলাদেশ কোন দিনই শিল্পের উন্নয়ণ করতে পারবেনা।
তাছাড়া অধিকহারে কাঁচামাল রপ্তানী করলে এবং বিদেশী পণ্য নিজ দেশে ব্যাপকহারে বিক্রয় হতে থাকলে দেশের বিরাজমান শিল্প ধ্বংস হবে। দেশের কারিগর ও শ্রমিক মজুর বেকার সমস্যার সম্মুখীন হবে।

বিলাস দ্রব্য

বর্তমান যুগে কোন দেশে বিলাস দ্রব্য তৈরি করার প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। বিলাস দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে সহজে বেশী মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় বলে এত গুরুত্ব। অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধণের জন্য বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে রপ্তানী করা সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এতে শ্রমিক, মজুর ও ব্যবসায়ীর প্রচুর মুনাফা হয়।

কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি নিছক মুনাফাকে গুরুত্ব প্রদান করে না। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনের নৈতিক চরিত্র, সর্বাধিক কল্যাণ ও মঙ্গলসাধণ করার প্রতি চেষ্টা করা হয়। এজন্যে বিলাসদ্রব্য উৎপাদন, রপ্তানী ও আমদানীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোন বিলাসদ্রব্য সমাজের কল্যাণকর ও ইসলামি শরীয়ত সম্মত হয় কেবল তাই উৎপাদন করে রপ্তানী করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ ইসলামি অর্থনীতিতে রয়েছে। বিলাস দ্রব্য মানব কল্যাণকর না হলে তা উৎপাদন ও রপ্তানী ইসলামি অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ মদ ও বিয়ার উৎপাদনের কথা বলা যায়। এগুলো লাভজনক হলেও শরীয়ত সম্মত না হওয়ায় এর উৎপাদন বিপণন, রপ্তানী ও আমদানী ইসলামি অর্থনীতিতে অবৈধ।

আমদানী নীতি

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানী যত কম করা যায় ততই ভাল। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করতেই হয়। সাধারণত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্য আমদানী করা হয়। একটা ইসলামি রাষ্ট্র আমাদনীর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতি অবলম্বন করতে পারে।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

আমদানী-নীতি নির্ধারণের সময় ইসলামি অর্থনীতিতে প্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উপর। এ ব্যাপারেও দেশের প্রকৃত অবস্থার উপর খুব কড়া নজর রাখা আবশ্যক। যে জিনিস যতখানি প্রয়োজন তা তত পরিমাণে আমদানী করা সঙ্গত। আর যেসব জিনিস কিছু না কিছু নিজ দেশে উৎপন্ন হয়, সেসব জিনিসের নিজস্ব উৎপাদন অনুপাতে কম আমদানী করা আবশ্যক- যেন দেশের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় হতে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। কারণ এরূপ ব্যবস্থা করা না হলে দেশীয় পণ্য বৈদেশিক পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী না হলে একদিকে

দেশী শিল্পপণ্যের মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে দেশের কারিগর ও মজুর-শ্রমিক বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। এই ভুল আমদানী নীতির ফলে দেশীয় কারিগর ও শ্রমিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমগ্র দেশে কঠিন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। অতএব

(১) অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে শুধু তাই আমদানী করা আবশ্যক, যা দেশীয় কারখানায় প্রস্তুত হয় না। দেশীয় কারখানায় যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে হয় না, এর আমদানী সীমাবদ্ধ ও পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) এই পণ্যের উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত যাতে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা যথারীতি বজায় থাকে এবং

(৩) দেশীর কারখানায় যেসব দ্রব্য প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়, সে সবের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা কর্তব্য।

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমাদানীর ব্যাপারে ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম সেসব যন্ত্রপাতি আমদানী চেষ্টা করা উচিৎ যা দেশীয় কাঁচামাল হতে পণ্যোৎপাদনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া নিম্নলিখিত প্রকারের কাঁচামাল আমদানীর জন্যও উৎসাহ দান করা বাঞ্ছনীয়

(১) নিজ দেশে চালু কারখানাসমূহের জন্য যা অপরিহার্য,

(২) মৌলিক শিল্পোৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজনীয়

(৩) এবং মৌলিক শিল্পে প্রতিনিয়ত যা প্রয়োজন, শিল্প ও কৃষিকার্যের উৎকর্ষ সাধন এবং এতদসংক্রান্ত মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

বিলাস-দ্রব্যের আমদানী

বিলাস-দ্রব্য আমদানী করলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা হ্রাস পায়। তাই কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সরকারের বিলাস দ্রব্য আমাদানীতে উৎসাহ যোগানো ঠিক নয়। কারণ বিলাস দ্রব্যের জন্য ব্যয়িত অর্থ দেশের জনস্বার্থের বিপরীত কাজ করে। জনসাধারণ কখনও বিলাস-দ্রব্য অবাধ ব্যবহার উপযোগী অর্থের মালিক হয় না। যাদের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সঞ্চিত হয়, সাধারণত কেবল তারাই বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করে থাকে। বর্তমান পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের যুগে শতকরা দুই কিংবা তিনজনের অধিকসংখ্যক লোক বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করতে সমর্থ হয় না। কাজেই যে দেশ এ ধরনের বিলাস-দ্রব্যের অবাধ আমদানীর অনুমতি দেয়, সে দেশ গণস্বার্থ উপেক্ষা করে শতকরা মাত্র তিনজনের জন্যই দেশের মূলধন ব্যয় করে। অথচ এই অর্থ দেশের শিল্পোনয়নের জন্য অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনীর কাজে এবং দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু তা দেশের মুষ্টিমেয় বিলাসী লোকের বিলাস-ব্যসনের লিপ্সা পূরণের জন্য ব্যয়িত হওয়া দেশের পক্ষে মারাত্মক, এতে সন্দেহ নেই।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যবসায়ীর দায়িত্ব

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ব্যবসায়ীর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসায়ী একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মনীতির কার্যকারিতার জন্য যথেষ্টভাবে সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হতে পারে। ব্যবসায়ী যদি নিজের ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অপরিহার্য প্রয়োজন, জনগণের প্রয়োজন ও মানুষের সাধারণ কল্যাণ সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে- জনগণের কল্যাণ সাধন নিজের ঈমানের অংশ মনে করে, তার নিজের স্বার্থের সাথে দেশের গণস্বার্থের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলে যদি প্রতিমুহূর্ত অনুভব করে, দেশের ব্যবসায়ী যদি নিজের প্রকৃত মর্যাদা বুঝে নেয় এবং দেশে ইসলামি অর্থনীতি কার্যকর করার জন্য যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যথাযথভাবেই পালন করে চলে, তবেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে।

প্রত্যেকটি মানুষই নিজের প্রয়োজন ও আকাঙ্খা পূরণ করার উদ্দেশ্যে অর্থোৎপাদনের জন্য চেষ্টা ও শ্রম করে। বস্তুত অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার মূল উৎস এভাবেই নিহিত রয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই কেবল নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করে কাজ করে, এটা অনস্বীকার্য সত্য। এমতাবস্থায় সঠিক কর্মনীতি এই যে, প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ-লাভের জন্য চেষ্টা ও সাধণা করবে, কিন্তু এই কাজে কেউই যেন অপরের স্বার্থের কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। কারণ তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে গণস্বার্থেরও নিবিড় যোগ রয়েছে।

একজন কৃষক কেবল নিজের খাদ্যের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই ভূমি চাষ করে না, উৎপন্ন যাবতীয় ফসলই সে নিজের খাদ্য হিসেবে খরচও করে না ; অন্যান্য যেসব লোক খাদ্যোৎপাদনের পরিবর্তে জীবনযাত্রা নির্বাহের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে লিপ্ত রয়েছে, তাদের খাদ্যের প্রয়োজনও সে উদ্বৃত্ত শস্য হতে পূর্ণ করে। এজন্য সমাজের এসব লোকের স্বার্থহানি করে কোন কাজ করার সুযোগ কিছুতেই কৃষককে দেওয়া যেতে পারে না।

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে ব্যবসায়ীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে- যথেষ্ট মুনাফা লাভের সুযোগ দিতে হবে; কিন্তু পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় জনগণের প্রয়োজন, ক্রয়-ক্ষমতা এবং দেশের সাধারণ অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এসব কাজে সর্বতোভাবে দেশবাসীর কল্যাণই দেখা উচিত। শোষণ করার কোন অবকাশ ব্যবসায়ীকে দেওয়া যাবে না। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস, কিংবা সঞ্চয় করার ফলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জনগণের শ্রমলব্ধ অর্থ জোকের মত শুষে নেওয়ার কৌশল ইসলামি অর্থনীতিতে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

দেশের জন্য কোন প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যদি বিদেশ হতে আমদানী করা অপরিহার্য হয়, তবে ইসলামি রাষ্ট্র তার যথাযথ ব্যবস্থা করবে। হয় রাষ্ট্র সরকারী পর্যায়ে এই দ্রব্য আমদানী করবে, অন্যথায় দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধা করে দেবে। এমন ব্যবস্থা করবে যেন দেশের আইনের বিধিবন্ধন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এর পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে। এরূপ করলে যদিও তার নিজের মুনাফার পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস পাবে- ব্যক্তিগতভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কিন্তু তার জন্য দেশের পক্ষে এটাই করা একমাত্র কল্যাণকর নীতি, ঈমানী দায়িত্ব।

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন পদ্ধতি

বর্তমান বিশ্বে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনের ক্ষেত্রে দু ধরনের পদ্ধতি চালু আছে-

১. ব্যবসায়ীগণ বা সরকার যে দেশ থেকে দ্রব্য আমাদানী করেন সেদেশের বন্দরে দ্রব্যাদি বুঝে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করেন। অতপর আমদানীকারী নিজের দায়িত্বে জাহাজে বা বিমানে করে নিজের দেশের মাল এনে সরবরাহ করেন।

২. আমাদানীকৃত পণ্য বিদেশ হতে ক্রেতার নিজের দেশের বন্দরে পৌঁছার পর মালামাল খালাস করে নেওয়ার সময় মূল্য পরিশোধ করেন। তখন তারা পণ্যের মূল মূল্য, ভাড়া এবং পণ্যমূল্য বিলম্বে আদায়ের সুদও প্রদান করে থাকেন।

বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ীগণ দ্বিতীয় প্রকারের লেন-দেনকে অপরিহার্য পদ্ধতি বলে মনে করেন। তাই তারা এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন করে আসছেন এবং বলেন যে, সুদ ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণযোগ্য নয়। সুদ মানুষ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই ইসলামি অর্থনীতির আলোকে ইসলামি রাষ্ট্র ও তার ব্যবসায়ীরা প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করবেন।

নিজ দেশের বন্দরে মূল্য পরিশোধ করার ফলে ব্যবসায়ীরা মূল মূল্যের সাথে বিদেশ মূল্য পরিশোধের জন্য যে সুদ প্রদান করেন তা মূলত জনগণের উপর বর্তায়। কারণ ব্যবসায়ী উক্ত সুদের টাকা তার মূলধনের অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে পণ্যের উপর মুনাফা যোগ করে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করেন। এর ফলে জনগণ অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য হন।

বর্তমানে ধর্মবিমুখ ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বৈদেশিক পণ্য আমাদানীর ক্ষেত্রে দুটি কারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ক. অতিরিক্ত সুদের জন্য তাঁর ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় না কারণ তিনি তা ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত মূল্য চাপিয়ে দেন।

খ. বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করলে তিনি উক্ত সময়ে তার মূলধন দেশীয় বাজারে খাটানোর ফলে এমন পরিমাণ মুনাফা করতে পারেন যা তার প্রদেয় সুদের চেয়ে বেশী।

পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য

সুদের মাধ্যমে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্তির জন্য ইসলামি রাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময় নীতি অবলম্বন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের নিকট দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত দুই কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য মজুত আছে তা ইরানের নিকট রপ্তানী করে তার বিনিময়ে দুইকোটি টাকার তৈল আমদানী করল।

কিংবা তিনকোটি টাকার তৈল আমদানী করল বাকী ১কোটি টাকার স্বর্ণ তাদেরকে প্রদান করে বিনিময় সমান সমান করল। এভাবে মুদ্রা ব্যতীতই বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব। তবে এজন্য সমমনা রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক জোট গঠন করা প্রয়োজন হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

১. একটি দেশের উন্নয়ন কীভাবে হতে পারে?
ক. আমদানী-রপ্তানী উভয়টি বেশী করলে
খ. আমদানী রপ্তান উভয়টি কম করলে
গ. আমদানী কম এবং রপ্তানী বেশী করলে
ঘ. উপরের সবগুলো ঠিক।

২. একটি দেশ অন্য দেশের নিকট কোন দ্রব্য রপ্তানী করতে পারে?
ক. কাঁচামাল
খ. শিল্পপণ্য
গ. বিলাসদ্রব্য
ঘ. উপরোক্ত সবগুলো।

৩. কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি লাভবান?
ক. দেশের সব কাঁচামাল রপ্তানী করা
খ. কাঁচামাল মোটেই রপ্তানী না করা
গ. কাঁচামাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা
ঘ. উপরের কোনটাই সঠিক নয়।

৪. ইসলামি অর্থনীতিতে কী ধরনের বিলাসদ্রব্য উৎপাদন ও বিপনন করা বৈধ?
ক. যে কোন বিলাস দ্রব্য
খ. জনকল্যাণকর বিলাসদ্রব্য
গ. শরীয়তসম্মত বিলাসদ্রব্য
ঘ. হারাম বিলাসদ্রব্য।

৫. কয় প্রকারের কাঁচামাল আমদানীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ?
ক. দুই প্রকার
খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার।

৬. সুদ পরিহার করে কোন পদ্ধতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য করা সম্ভব?
ক. পণ্যের বিনেময়ে পণ্যের লেন-দেন করে
খ. বিদেশের বন্দরে মূল্য পরিশোধ করে
গ. উপরোক্ত সব কটি পদ্ধতিতে।
ঘ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বৈদেশিক বাণিজ্য একটি দেশের জন্য প্রয়োজন কেন ? ব্যাখ্যা করুন।
২. একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি কী লিখুন।
৩. কাঁচামাল রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের কী ধরনের নীতি অবলম্বন করা উচিৎ? লিখুন।
৪. ইসলামি লর্থনীতিতেদ বিলাস দ্রব্য রপ্তানী নীতি উল্লেখ করুন।
৫. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী নীতি কী হওয়া উচিৎ? লিখুন।
৬. ইসলামি অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে লেন-দেন হওয়া কর্তব্য আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. ইসলামি অর্থনীতি আমদানীর ক্ষেত্রে যে সব নীতির প্রতি উৎসাহিত করে তার বিশ্লেষণ করুন।
৩. রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের করণীয় কী? ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৬

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মত মনে হলেও আদর্শ ও মূলবোধের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা সুদী লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামি শরীআর মৌলনীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালিত। ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচেছ-একটি সুদমুক্ত শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা। যার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে যুলম ও নিপীড়নমুক্ত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে উঠে। ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামি ব্যাংকের যে সংজ্ঞা অনুমোদিত ও গৃহীত হয় তারই আলোকে সারা বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক পরিচালিত হচেছ। ইসলামি ব্যাংক মানবজাতিকে একটি পরিপূর্ণ ও আদর্শিক জীবন গঠনে অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) মনোনীত বিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। সে লক্ষ্যে অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিধান তথা ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামি অর্থনীতির একটি দিক। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তা সারা বিশ্বে থাকলে ও এর অবকাঠামোগত বিকাশ বেশী দিনের নয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী অর্থ ব্যবস্থার সীমাহীন স্বেচছাচারিতায় বর্তমান বিশ্বকে অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত করে রেখেছে। দারিদ্র, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ, নির্যাতন, শ্রেণীগত সংঘাত প্রভৃতির কারণে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বিশ্ব মানবতাকে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা তথা ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা একমাত্র কার্যকর পন্থা। কেননা, মানব রচিত মতবাদ কখনোই সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আলোচ্য ইউনিটে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটকে ১১টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : ইসলামি ব্যাংকের পরিচয় এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
- ❖ পাঠ-২ : ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- ❖ পাঠ-৩ : ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের তুলনা
- ❖ পাঠ-৪ : ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী
- ❖ পাঠ-৫ : ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল ও এর কার্যাবলী
- ❖ পাঠ-৬ : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী
- ❖ পাঠ-৭ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ও এর সম্ভাবনা
- ❖ পাঠ-৮ : ইসলামি ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ❖ পাঠ-৯ : ইসলামি ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য
- ❖ পাঠ-১০ : বিনিয়োগ
- ❖ পাঠ-১১ : ইসলামি বীমাব্যবস্থা

পাঠ-১

ইসলামি ব্যাংকের পরিচয় এবং -এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ইসলামি ব্যাংক শরীআ ভিত্তিক পরিচালিত- তা আলোচনা করতে পারবেন
- ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংক

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক ব্যবস্থা। ইসলামি শরী'আ অনুযায়ী এ ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালিত। ইসিলামের সুমহান নীতিমালা অনুযায়ী একটি সুদমুক্ত শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার পথে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস হচ্ছে ইসলামি ব্যাংক। ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে যুলম ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা একটি অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা। একটি কল্যাণময় অর্থে-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলাম সম্মেলন সংস্থা (O.I.C) ইসলামি ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ও.আই.সি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। তা হল- Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations. অর্থাৎ ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার মৌলিক বিধান, নীতিমালা, বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতিতে ইসলামি শরীআর মূলনীতি অনুসরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে এবং যার সমুদয় কাজ-কর্ম, আদান-প্রদান হবে সুদের লেনদেন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অভ ইসলামি ব্যাংকস ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে- ইসলামি ব্যাংক কার্যত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণা যা আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন ইসলামি শরীআর নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু ব্যাংক যখন এ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে তখন বাস্তব জীবনে শরীআর নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত হতে হবে। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এ ব্যাংক কাজ করবে এবং এর মৌলিক উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে ইসলামি চেতনার বিকাশ সাধনে ব্যাংক নিরন্তর কর্মরত থাকবে।

মালয়েশিয়ার ইসলামি ব্যাংকিং আইন কর্তৃক ১৯৮৩ সালে অনুমোদিত ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা হল- ইসলামি ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা 'ইসলামি ব্যাংকিং' ব্যবসায় করে এবং যার একটি বৈধ লাইসেন্স আছে। আর ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসায় হচ্ছে এমন এক ব্যবসা যার লক্ষ্য ও কর্মকান্ডের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

ইসলামি ব্যাংক শরীআ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে- ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত সুদবিহীন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, কোন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে সুদ প্রথাকে রহিত করা হলেই বুঝি তা ইসলামি ব্যাংক বা ইসলামি প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়। আসলে তা নয়। কোন ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক হতে হলে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের সকল স্তরেই ইসলামি শরীআর নীতিমালাকে অনুসরণ করতে হবে। কেউ যদি কোন প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান বলে দাবী করে কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড-এ ইসলাম শব্দ ব্যবহার করে অথবা প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামি শরীআর নীতিমালা অনুসরণ করে, আবার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামি শরীআর নীতিমালা উপেক্ষা করে চলে, তাহলে সেটিকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণরূপে ইসলামি প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। অবশ্য কোন প্রতিষ্ঠান যদি তার কিছু কিছু কর্মকান্ডে ইসলামি শরীআকে অনুসরণ করে, তাহলে সেটিকে আংকি ইসলামিক বলা যেতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে এবং সম্পূর্ণরূপে ইসলামিক তখনই হবে, যখন সেটি তার কর্মকান্ডের সকল স্তরে ইসলামি শরীআর নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে এবং মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

কেউ কেউ হয়তো মনে করে থাকেন যে, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থাই তো লেনদেনের জন্য যথেষ্ট। কেননা, এ সকল ব্যাংকের মাধ্যমেই মামুষ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকের আবার কি

প্রয়োজন আছে? এ প্রসংগে বলা যায় যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) জীবন বিধান দিয়েছেন যা মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তথা ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামি ব্যাংকিং হলো ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার একটি দিক। বর্তমান বিশ্বে অন্তহীন সমস্যার উৎস হলো অর্থনীতি। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ, যুলম, শ্রেণীগত সংঘাত এসবের ক্রমবর্ধমান চাপে বিশ্বমানবতা আজ বিপর্যস্ত। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র কিংবা মানবরচিত অন্য কোন অর্থ ব্যবস্থাই মানবতার এ বিপর্যয়কে রোধ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে পেরেছে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ও মহানবীর (সা) প্রবর্তিত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামি ব্যাংকিং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থারই একটি অংশ।

ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। ইসলামি ব্যাংকেরও কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে এবং সেগুলো সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে হতে হবে। কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা কিংবা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইসলামি ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়।

ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান পালন করা।
খ. ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
গ. গরীব, অসহায়, বেকার ও স্বল্প আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
ঘ. ইসলামি পদ্ধতিতে উৎপাদনশীল ও কল্যাণকর খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
ঙ. সুদ বিহীন ও কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
চ. লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ করা।
ছ. অর্থ ব্যবস্থায় ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব হবার পথ সৃষ্টি না করা।
জ. শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
ঝ. ইসলামি ব্যাংককে বিশ্বের দরবারে ইসলামের একটি মডেল হিসেবে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা।
ঞ. অর্থনীতিতে শোষণ ও যুলমের অবসান ঘটিয়ে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা।
ট. মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে মুসলিম উম্মার উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা। এমনিভাবে প্রতিটি ইসলামি ব্যাংক ইসলামি শরীআর আলোকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন।

ক) ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে-
১. সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা
২. শরীআ ভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা
৩. শোষণ মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা
৪. সকল উত্তরই সঠিক।

খ) ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা কত সালে নির্ধারিত হয়?
১. ১৯৮৬ সালে
২. ১৯৮১ সালে
৩. ১৯৬৩ সালে
৪. ১৯৭৮ সালে

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের ৩টি সংজ্ঞা দিন।
২. ইসলামি ব্যাংক শরীআ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা-আলোচনা করুন।
৩. ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন। ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

পাঠ-২

ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সুদ প্রবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন
- ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ব্যাংকের একটি তালিকা দিতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংক সমূহের ন্যায় সুদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। তাছাড়া ইসলামি ব্যাংক শুধু সুদকে পরিহার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সকল কর্ম কান্ডের সকল স্তরের ইসলামি শরী'আতকে অনুসরণ করে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর আর্থ-সামাজিক ও শরীআতী প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শরী'আতের নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম-কান্ডের সকল পর্যায়ে সুদ বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বর্তমান কালের মত প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না, তবে সরকারী কোষাগার ছিল, যাকে بيت المال (বায়তুল মাল) বলা হত। তখনকার প্রয়োজনীয় আর্থিক লেন-দেন সমাপনের জন্য এ বায়তুল মালই যথেষ্ট ছিল, বায়তুল মালের লেন-দেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। অতীতের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিশ্বে ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। সুদ বর্জন করার নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। উমাইয়া শাসনামলে ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এরপর থেকে মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে সুদবিহীন ইসলামি অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। এই শতকে ইসলামি অর্থব্যবস্থার উপর পাশ্চাত্য অর্থ ব্যবস্থা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুসলিম অর্থনীতি তথাকথিত মুক্ত অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। তখন হতে সুদের সাথে মুসলমানদের পরিচয় ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা মুসলমানদের জীবন যাত্রার সাথে মিশে যায়।

সুদের প্রবর্তন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বটে কিন্তু মুসলমানগণ ইসলামি পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মাল' এর লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও 'বায়তুল মাল' বহাল ছিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন 'বায়তুল মাল' এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। প্রাথমিক যুগের এ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা কেবল আরব জাহানেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সমগ্র বিশ্বেই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা চালু ছিল। এমন এক যুগ ছিল যখন বিশ্বের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে; আর চালু ছিল সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র বিশ্বে সুদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু মুসলিম জাতি বিবিধ কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য শক্তি মুসলিম দুনিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুসলিম জাতি সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সংস্পর্শে আসে। ফলে সুদ বিহীন ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইয়াহূদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদকে মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয় এবং ইসলামি নতিমালার ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে রাশেদুন কর্তৃক অনুসৃত সুদবিহীন যে অর্ত ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হল। ইয়াহূদীরাই ছিল সুদের প্রবর্তক এবং সুদী প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক। যতদূর জানা যায় প্রাচীন গ্রীক সমাজে যখন ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে তখন ব্যাংকে সুদ গ্রহণ ছিল

নিষিদ্ধ। খ্রিষ্টানদের 'ওল্ড টেস্টমেন্ট' ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইয়াহূদী জাতি এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্যাংকসমূহে সুদের প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে খ্রিষ্টানরাও তাদের অনুসরণ করে এবং উত্তরোত্তর মুসলমানরাও সুদী কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মুসলমানদের মনমগজ ও চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, ব্যাংকিং বলতে তারা কেবল সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝে। ইসলামি ব্যাংকিং বললে তারা যেন কিছুই বুঝে না। ব্যাংকিং বলতে তারা সুদী ব্যঅংকের নাম, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে।

আমরা জানি, বর্তমান যুগে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক লেনদেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর, আমদানী রাপ্তানী ইত্যাদি যাবতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাংক ব্যতীত এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে ব্যাংক একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সুদ প্রথার কারণে সমগ্র ব্যবস্থাই অপবিত্র এবং মানবজাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক থেকে যদি সুদের মত এ ভয়াবহ পাপ ও অভিশাপটিকে দূর করা যায় তাহলেই ব্যাংক সত্যিকার অর্থে একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ শুরু থেকেই গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের জন্যে ব্যাংক থেকে সুদ প্রথা দূর করে এটিকে একটি প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তাঁরা কখনো নীরব থাকেননি। মুসলিম মনীষীগণ সর্বযুগেই ইসলামি নীতিমালাকে পুনঃ প্রবর্তনের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

সুদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করার বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামি চিন্তাবিদ, ইসলামি আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যাবসায়ী, গবেষক এবং দার্শনিকগণ বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য এবং লিখনীর ভাষা কখনো ছিল বলিষ্ঠ আবার কখনো ছিল মন্থর। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ সুদ বিহীন ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বপক্ষে ব্যাপক গবেষণা, লেখালেখি এবং জোরালো বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। তাঁদের এ বক্তব্য ক্রমান্বয়ে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ষাটের দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানী এবং সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৬৩ সালে মিসরে সর্বপ্রথম সুদ বিহীন ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ডঃ আহম্মদ আল নাজ্জার স্বউদ্যোগে মিসরীয় বদ্বীপ শহর মিটগামারে 'মিটগামার ব্যাংক' নামে একটি সেভিংস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংক। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ব্যাংক বিপুল সাফল্য অর্জন করে। ১৯৬৩-৬৭ সালের মধ্যে মিসরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে সকল ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অতপর মিসর সরকার জনগণের দাবী ও আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্যে ১৯৭২ সালে 'নাসের সোশ্যাল ব্যাংক' নামে অপর একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭০ সালে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের অপর সম্মেলনে 'আইডিবি' (ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক) চার্টার গৃহীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে সৌদী আরবে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে। অতপর ক্রমান্বয়ে, কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, জাম্মান, জর্দান, বাংলাদেশ প্রবৃতি দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইরান ও পাকিস্তানের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি ব্যাংক কেবলমাত্র মুসলিম দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী এর মত অমুসলিম দেশেও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৪২টি দেশে ১৫৫ টিরও অধিক সুদ বিহীন ইসলামি ব্যঅংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ইসলামি শরীআর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং মরীআর নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহক রেখেছে। নিম্নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বড় বড় ইসলামি ব্যাংকের একটি তালিকা দেওয়া হল-

১. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক জিদ্দাহ - ১৯৭৫

২. দুবাই ইসলামি ব্যাংক, ইউনাইটেড আর আমিরাত - ১৯৭৫
৩. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, াসফাত, কুয়েত - ১৯৭৭
৪. ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক, খারতুম, সুদান - ১৯৭৭
৫. নাসের সোল্যাল ব্যাংক, কায়রো, মিশর - ১৯৭৭
৬. ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক, কায়রো, মিশর - ১৯৭৭
৭. ইসলামিক ইন্টাশ্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ডিভেলপমেন্ট - ১৯৮০
৮. ব্রানসেস অভ ইসলামি ব্যাংক, কায়রো, ১৯৮০
৯. জর্দান ইসলামি ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট - ১৯৮০
১০. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট হাউস, আম্মান, জর্দান - ১৯৮১
১১. বাহরাইন ইসলামি ব্যাংক, মানামা, বাহরাইন - ১৯৮১
১২. বাহরাইন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, মানামা, বাহরাইন - ১৯৮১
১৩. দারুল মাল-আল ইসলাম, বাহামা - ১৯৮০
১৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটিড, বাহামা - ১৯৭৯
১৫. ইসলামিক এক্সচেঞ্জ এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী, দোহা, কাতার - ১৯৭৯
১৬. কাতার ইসলামি ব্যাংক, কাতার - ১৯৭৮
১৭. ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম, কুক্সেমবার্গ - ১৯৭৮
১৮. ইরানীয়ান ইসলামি ব্যাংক, তেহরান, ইরান - ১৯৭৯
১৯. ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, পাকিস্তান - ১৯৭৯
২০. হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন, পাকিস্তান - ১৯৭৯
২১. পাকিস্তান ব্যাংকারস ইকোয়ালিটি কর্পোরেশন, করাচী, পাকিস্তান - ১৯৭৯
২২. ইসলামিক মুদারাবা কোম্পানী, পাকিস্তান - ১৯৮০
২৩. ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক, পিএলস, পাকিস্তান - ১৯৮১
২৪. ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড, সুইজারল্যান্ড - ১৯৭৯
২৫. পাকিস্তান ইভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, করাচী, পাকিস্তান - ১৯৭৯
২৬. দারুল মাল আল ইসলামি, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড - ১৯৮০
২৭. আরব ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, আরব আমিরাত, দুবাই - ১৯৮০
২৮. ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ, ইংল্যান্ড - ১৯৮২
২৯. ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা - ১৯৮৩
৩০. ব্যাংক ইসলাম বারহাদ, মালয়েশিয়া - ১৯৮৩
৩১. আল বারাকা ব্যঅংক বাংলাদেশ, ঢাকা - ১৯৮৭
৩২. শরীআ ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস, জেনেভা - ১৯৮০
৩৩. ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস, লন্ডন - ১৯৮০
৩৪. কিবরিজ ইসলামি ব্যঅংক, নিকোশিয়া - ১৯৮০
৩৫. ইসলামং ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল, ডেনমার্ক, কোপেনহেগেন - ১৯৮৩
৩৬. লিফিপাইন আমানা ব্যাংক, জামবুয়াংগা সিটি - ১৯৮২
৩৭. শারজাহ ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন, জেনেভা - ১৯৮০
৩৮. আল বারাকা ব্যাংক, খারতুম - ১৯৮২
৩৯. আল বারাকা ইনভেস্টমেন্ট ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন জেদ্দাহ
৪০. ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, শারজাহ, আরব আমিরাত - ১৯৮০
৪১. ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অভ সুদান, সুদান - ১৯৮০
৪২. আল বারাকা ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন - ১৯৮৪
৪৩. ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট এন্ড রি-ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, বাহরাইন - ১৯৮৪
৪৪. ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক এন্ড নাইজার, মিয়ামী - ১৯৮৪
৪৫. ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক অভ গিণি, কোনার্কী - ১৯৮৪
৪৬. আল বারাকা ব্যংক অভ টার্কী, ইস্তাম্বুল - ১৯৮৫
৪৭. খার্তুম ইসলামি ব্যাংক, জেদ্দাহ - ১৯৮৪
৪৮. ইউরোপিয়ান ইসলামি ব্যাংক, সুইজারল্যান্ড,
৪৯. আঙ্কারা এন্ড ইস্তাম্বুল ইসলামি ব্যাংক, টার্কী
৫০. ইসলামি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অভ অস্ট্রালিয়া, মেলবোর্ন
৫১. ইসলামি ব্যাংক সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর

৫২. ফালাহ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, বোম্বাই, ইন্ডিয়া
৫৩. ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, বোম্বাই, ইন্ডিয়া।

আশা করা যায় গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ তাঁদের ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালনা করবে এবং সুদের ভয়াবহ অভিশাপ, শোষণ ও জুলম থেকে মুক্তি লাভ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. বায়তুলমাল বলা হয়-
ক. ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারকে খ. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংককে
গ. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গ. যাকাত ফান্ডকে

২. প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ?
ক. পবিত্র মক্কা নগরীতে খ. পবিত্র মদীনা মুনাওওয়ার
গ. দামেস্কে ঘ. মিশরে

৩. কে সর্বপ্রথম সুদমুক্ত লেনদেন ব্যবস্থা চালু করেন ?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত মুহাম্মদ (সা)
গ. হযরত উমর (রা) ঘ. হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)

৪. লেনদেনে সুদ ব্যবস্থা কে সর্বপ্রথম চালু করেন?
ক. আর্যগণ খ. ইয়াহূদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী
গ. আব্বাসীয় খলীফাগণ গ. মোঘল সম্রাটগণ

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মালেরগুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. সুদ ব্যবস্থার প্রবর্তন কীভাবে হয়েছিল ? লিখুন।
৩. ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।
৪. ১০টি ইসলামি ব্যাংকের নাম লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

পাঠ-৩

ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের তুলনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন
- প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামি শরী'আত অনুযায়ী পরিচালিত। ইসলামের সুমহান নীতিমালা অনুযায়ী একটি সুদমুক্ত পোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার পথে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস হচ্ছে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা। ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে যুলম ও নিপীড়নমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা একটি অনন্য সাধারণ ব্যবস্থা। একটি কল্যাণময় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক একটি নতুন সংযোজন হলেও প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাই ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলামি ব্যাংকের কতগুলো আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্নে ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো-

১. ইসলামি ব্যাংকের লক্ষ্য - উদ্দেশ্য শরী'আতের আলোকে নির্ধারিত।

২. ইসলামি ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদমুক্ত।

৩. এ ব্যাংক কৃষি, শিল্প-বাণিজ্যে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে বা অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে।

৪. এ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল দ্বারা যাকাত ফান্ড গঠন করে এবং যাকাত তহবিল দ্বারা জনসেবা করে থাকে।

৫. এ ব্যাংক জনকল্যাণমূলক কাজে করযে হাসানা বা সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান করে।

৬. ইসলামি ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যা ফিকহ শাস্ত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারবার করে।

৭. ইসলামি ব্যাংক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্য পরিচালনার মাধ্যমে মানবতার বিকাশ ঘটায়।

৮. এ ব্যাংক শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে।

৯. ইসলামি ব্যাংক জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কারবারের অঙ্গীকার আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

১০. ইসলামি ব্যাংক সুদমুক্ত পন্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যে অবদান রাখে।

১১. কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইসলামি ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১২. ইসলামি ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখে।

১৩. ইসলামি ব্যাংক ইসলামি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টা করে।

১৪. ব্যবসায় বাণিজ্যে ও অর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

১৫. ইসলামি ব্যাংক আন্তরিকতার সাথে উন্নতমানের সেবা প্রদান করে।

১৬. ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়ের শতকতা ৭০ ভাগ আমানতদারদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা ঃ

ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে কাঠামোগত কিছু সামঞ্জস্য আছে। তা সত্ত্বে অসামঞ্জ পরিমাণই বেশি। নিম্নে এ দু'ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো-

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ শরী'আতের বিধান মোতাবিক হালাল ও সহজ পন্থায় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করা ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সুদী অর্থাৎ লগ্নী ব্যবসায় পরিচালনা করা।

২. সুদের বিলুপ্তি ঃ শরী'আতের সুদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় ইসলামি ব্যাংক সুদ বর্জন করে লেনদেন করে। অপর দিকে প্রচলিত ব্যাংক সুদের মাধ্যমেই সব কারবার করে থাকে।

৩. অর্থের উৎস ঃ সুদী ব্যাংকগুলো সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে জনগণের আমানত গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে জনগণের আমানত গ্রহণ করে।

৪. বিনিয়োগ ঃ ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে- ক. মুদারাবা খ. মুশারাকা গ. মুরাবাহা ঘ. বাইয়ে মুয়াজ্জাল ঙ. বাইয়ে সালাম চ. ইজারা ইত্যাদি। প্রচলিত ব্যাংকের বিনিয়োগের মাধ্যম হচ্ছে- ক. ক্যাশ ক্রেডিট খ. ওভার ড্রাফট গ. লোন ইত্যাদি।

৫. সুদ বনাম লাভ-ক্ষতি ঃ প্রচলিত ব্যাংকের সুদ লাভ-লোকসানের সাথে সম্পর্কহীন। এখানে সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত। ইসলামি ব্যাংকে সুদ নেই। লাভ-লোকসানের হার বছরের নির্দিষ্ট সময় অন্তে হিসাব করে স্থির করা হয়।

৬. গ্রাহক সম্পর্ক ঃ ইসলামি ব্যাংকের গ্রাহকগণ ব্যাংকের ব্যবসায়ের সংগঠক অথবা আমানতকারী হিসেবে মূলধন দাতা। প্রচলিত ব্যাংকের সাথে গ্রাহকগণের সম্পর্ক পাওনাদার হিসেবে বিবেচিত।

৭. পরিচালন ব্যয় ঃ ইসলামি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় লাভের ওপর নির্ভরশীল। লোকসান হলে খরচ বেড়ে যায় এবং তা ব্যাংকের অস্তিত্বে হুমকি হয়ে দেখা দেয়। তবে ইসলামি ব্যাংকের দক্ষ কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পে ব্যাংকের লোকসান হয় না। প্রচলিত ব্যাংক সুদ আদায় করা ও সুদ প্রদান করা এ দু'য়ের বিয়োগফলের উপরে পরিচালনা ব্যয় নির্ধারণ করে থাকে।

৮. যাকাত ফান্ড ঃ ইসলামি ব্যাংক নিজস্ব তহবিলের জমাকৃত অর্থের যাকাত দিয়ে থাকে। এ অর্থ জনকল্যঅণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। প্রচলিত ব্যাংকে যাকাতের কোন প্রশ্নই উঠেনা। তেমনি সেবামূলক বা ত্রাণকার্য ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হলেও প্রচলিত ব্যাংকে তা নেই।

৯. শোষণের অবসান ঃ ইসলামি ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা। প্রচলিত ব্যাংকে সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণের ব্যঅপারে কোন পদক্ষেপ নেই। অর্রে ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের কতিপয় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নেই প্রধান ভূমিকা হিসেবে কাজ করে।

১০. আয়ের উৎস ঃ ইসলামি ব্যাংকের আয়ের উৎস মুনাফা, প্রাক্কলিত ব্যাংকের আয়ের উৎস সুদ।

১১. সামাজিক সংগঠন ঃ ইসলামি ব্যাংক নিজকে সংগঠনের একটি অংশ মনে করে। এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র্য জনগণকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংক সমাজের সাথে তার এ ধরনের সম্পর্ক ও সমন্বয়ে কখনোই চিন্তা করে না।

১২. প্রকৃত লোকসানের দায়ভার গ্রহণ ঃ ইসলামি ব্যাংক লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে; বিনিয়োগে প্রকৃত লোকসানের দায়ভারও ব্যাংক গ্রহণ করে। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থও এর উপর নির্ধারিত সুদ এক এক করে আদায় করে। বিনিয়োগের লাভ-লোকসানের ব্যাপারে তার কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

১৩. শরী'আ বোর্ড ঃ ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামি শরী'আত অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য প্রখ্যাত আলেম, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও আইনবিদদের সমন্বয়ে শরী'আ কাউন্সিল বা বোর্ড গঠন করে থাকে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই।

১৪. কার্যক্রমে পার্থক্য ঃ ইসলামি ব্যাংক শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন প্রকল্পে একজন অংশীদার হিসেবে জড়িত থাকে। এ জন্য ব্যাংক ব্যবসায়, শিল্প বা প্রকল্পের সফলতার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে। ব্যাংক আবার এর সুফলও পায়। লাভ আদায় হয় ভালভাবে। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবসা-শিল্পের কোন অংশীদার নয় বলে অর্থ গ্রহণকারী সংগঠনের সফলতার জন্য ব্যাংক উদ্বিগ্ন নয়। তবে এ ব্যাংকগুলো সুদসহ অর্থ ঠিকমত ফেরত দিতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। তা সত্ত্বেও অন্তত সরকারি ব্যাংকগুলো ঋণ আদায় সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ। প্রভাবশালী ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণের অর্থ প্রদানে উৎসাহী নয়। এ জন্য ব্যাংক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

সারকথা

বস্তুত ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা সফল বিবেচনায় আজ সাধারণ ব্যাংকের চেয়ে অধিক লাভজনক এবং কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সকল ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য একই রকম হওয়া জরুরী নয়। তবে মৌলিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অভিন্ন হবে। আর তা হচ্ছে ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া। প্রতিটি ইসলামি ব্যাংক তার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে নিতে পারবে। তবে তা অবশ্যই ইসলামি শরীআর নীতিমালার ভিত্তিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংক পরিচালিত হয়-
ক. প্রচলিত ব্যাংকিং নীতিমালার ভিত্তিতে খ. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতে
গ. আল-কুরআনের নীতিমালার ভিত্তিতে গ. ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে।

২. ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
ক. ইসলামি ব্যাংক সুদমুক্ত লেনদেন করে খ. ইসলামি ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে
গ. ইসলামি ব্যাংক নিজস্ব যাকাত ফান্ড গঠন করে ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৩. ইসলামি ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্র ক'টি?
ক. ৪ টি খ. ৫ টি
গ. ৬ টি ঘ. ৩ টি

৪. ইসলামি ব্যাংকের আয়ের উৎস হচ্ছে-
ক. সুদ খ. লাভ-লোকসান
গ. মুনাফা গ. আমানত গ্রহণ

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
২. ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে ৫টি পার্থক্য নির্ণয় করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য আলোচনাসহ ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে তুলনা করুন।

পাঠ-৪

ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

♦ ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুদ্রা এবং ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামি অর্থনীতির আলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামি শারীআ মুতাবিক ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সে অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করে তাকে ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

বর্তমান যুগে সুসভ্য মানব সমাজের জন্য ব্যাংক যে একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থা তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক কাজই একমাত্র ব্যাংকের সাহায্যে সম্পন্ন করা সম্ভব। এতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামের দৃস্টি আর আদুনিক বা প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগতের সৃষ্টি। প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ পরিচালার Measurment হচ্ছে Secularism ধর্মনিরপেক্ষতা, পক্ষান্তরে ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য পরিচালনার Measurment হচ্ছে ইসলামি শরীআ।

প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- মুদ্রা ও নোট প্রচলন, নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করা, অন্যান্য ব্যাংকের এবং সরকারি ব্যাংকের হিসেবে কাজ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ঋণ দান ইত্যাদি। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন কার্যে শরীআ বিরোধী কোন ছবি মুদ্রায় ছাপাতে পারে না। প্রচলিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মূলধন যোগান দিতে পারে। ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত সরকারি ঋণ হবে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ। এ কাজগুলো ছাড়াও ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরো কর্ম সম্পাদন করে থাকে। নিম্নে ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করা হল-

১. শরী'আ বোর্ড গঠন ঃ ইসলামি ব্যাংকের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য শরী'আ বোর্ড গঠন অপরিহার্য। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, আলিমে দ্বীন, আইনবিদ এবং ইসলামি অর্থনীতিবিদদের মাধ্যমে এ বোর্ড গঠন করা হয়। তাঁরা কুর'আন সুন্নাহকে Measurment হিসেবে ধরে নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকেন। ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বোর্ড হিসেবেও সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

২. প্রতীকী মুদ্রা প্রচলন ঃ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে কারেন্সী নোট ছাড়ে। পাঁচ টাকা বা তার বেশি মূল্যের নোট আমাদের দেশে কারেন্সী বলে পরিচিত, বাকিটা রেজগি। আমাদের দেশের কাগজের নোটগুলো পরিবর্তনীয় মুদ্রা নয়। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রায় রূপান্তর করা যায় না। কাগজী মুদ্রা প্রচলন যেন সরকারের একটি অনর্জিত আয়। স্বার্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের জন্য আয় করতে হয় কিন্তু কাগজী মুদ্রার জন্য আয়ের প্রয়োজন নেই, মেশিনে নোট ছাপালেই হলো। এর জন্য কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না।

৩. সুদপ্রথা রহিত করে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ঃ আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

احل الله البيع وحرم الربوا

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। এ সুদ প্রথাকে রহিত করে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। হারাম দ্রব্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, শিল্প বাণিজ্য সবই হারাম। এগুলোর উৎপাদন ও ব্যবসায় যেন কোন মূলধন বিনিয়োগ করা না হয়, তা ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৪. যাকাত ফান্ড ঃ যাকাতের অর্থ হিসেবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে যে টাকা জমা হবে বায়তুল মাল তথা ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার হিসাব সংরক্ষণ করে এবং তা বণ্টনের ব্যবস্থা করে। অপরিবর্তনীয় মুদ্রা একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে অর্থমূল্যকে সর্বদা অস্থির রাখে, অপরদিকে পুঁজিবাদের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটায়। তাছাড়া কাগজী মুদ্রার কারণেই পুঁজিবাদ দ্রুত বেড়ে ওঠে। কাগজী মুদ্রার অনেক সুবিধাও রয়েছে। যেমন- সহজেই বিনিময় করা যায়। সেজন্য এ মুদ্রা প্রতীক মুদ্রা হিসেবে চালু রাখা উচিত, যেন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তন করা যায়। যার ফলে পাঁচ টাকার মুদ্রার গায়ে লিখিত এ কথাটি সত্যে পরিণত হয়- চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে বিভিন্ন নোটের গায়ে লেখাটা সত্যের অপলাপমাত্র। এ সমস্যা হয়েছে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রায় পরিবর্তন যোগ্য না হওয়ায়। কাজেই ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি আবারো পরিবর্তন যোগ্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন করে এবং কাগজী মুদ্রা সমমানের স্বর্ণ ও পৌপ্য মুদ্রা ট্রেজারিতে মওজুদ রাখে তবে এ সমস্যার সমাধান হবে।

৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা ঃ ইসলামে সুদ হারাম। তাই ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ইসলামি চিন্তাবিদগণ সুদের পরিবর্তে ফী নেয়ার পরামর্শ দেয়। তবে সত্য কথা বলতে কি-কোন ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক করযে হাসানা ব্যতীত কোন ঋণ দিতে পারে না। যার ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ওঠে না। তবে দেশে স্বল্পমাত্রায় বিনিয়োগ হলে মুদ্রা সংকোচন এবং অধিক হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। বিনিয়োগের পরিমাণের কারণে যদি বিভ্রাট দেখা দেয় তবে ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাভের হার কম-বেশি হতে পারে। ফলে সংগঠনগুলো মূলধন কম বা বেশি সংগ্রহ করবে। ব্যাংকের লভ্যাংশ ১৫% থেকে যদি ৩০% করা হয় তা হলে সংগঠনের লাভ থাকবে ২০%। এ অবস্থায় ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. ইসলামি শরীআ ভিত্তিক — খ. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতামত ভিত্তিক
গ. সাধারণ ব্যাংকিং নীতি ভিত্তিক — গ. পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভিত্তিক।

২. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে-
ক. মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রচলন — খ. নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করা
গ. ইসলামি ব্যাংকের শাখা নিয়ন্ত্রণ করা — ঘ. উত্তর সব ক'টিই সঠিক।

৩. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
ক. হারাম দ্রব্য উৎপাদন নিষিদ্ধ — খ. হালাল দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান
গ. হারাম দ্রব্য বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ — ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৪. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমার্থবোধক শব্দ কী?
ক. ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক — খ. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
গ. বায়তুলমাল — গ. যাকাত ফান্ড।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
২. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্য হতে যে কোন তিনটির উল্লেখ করুন।
৩. প্রতীকী মুদ্রা বলতে কী বুঝেন? ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে মুদ্রা বিনিময় করে? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল ও এর কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- শরীআ কাউন্সিলের পরিচয় ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- শরীআ বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয় দিকগুলো তুলে ধরতে পারবেন
- শরীআ বোর্ডের কার্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল

কোন একটি ব্যাংকের কেবল মাত্র আর্থিক লেনদেন সুদমুক্ত হলে কিংবা সাইন বোর্ডে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করলেই তা প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক বা ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়ে যায় না। প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক হতে হলে ব্যাংকের সমুদয় কর্মকান্ড ইসলামি শরীআ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামি শরীআ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য সরবরাহের জন্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শরীআ বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন। দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কিরাম, ইসলামি চিন্তাবিদ, ফকীহ, ইসলামি অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, ইসলামি আইনবিদ এবং দার্শনিকগণকে নিয়ে এ শরীআ বোর্ড গঠিত হবে। শরীআ বোর্ডের সদস্যদের কেবল উচ্চ ডিগ্রী এবং জ্ঞানের পান্ডিত্য থাকলেই চলবে না; বরং প্রত্যেক সদস্যকে পরহেজগার, মুত্তাক্বী এবং ইসলামি শরীআতে পারদর্শী হতে হবে। শরীআ বোর্ডের সদস্যগণকে কেবল ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন হলেই চলবে না, জনগণের নিকটও আস্থাভাজন হতে হবে। এখানে 'মুত্তাক্বীন' শব্দ এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে যারা অসীম জ্ঞানের অধিকারী। দেশ বিদেশের কোন উচ্চ ডিগ্রীরও অভাব নেই তাঁদের। ইসলামের কথা বলে মানব হৃদয়কে শীতল করে দিতে পারে। অথচ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের কোন অসুশাসন তাঁরা মেনে চলবেন না। বাহ্যিক অবস্থা দেখলে বুঝার উপায় নেই যে, তিনি মুসলিম নাকি অমুসলিম। ব্যক্তি স্বার্থ ও অর্থের লোভ লালসা তাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। নিজ অপরাধগুলোকে ধামাচাঁপা দেওয়ার জন্যে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না তাঁরা। সুতরাং এ ধরনের আমলহীন আলেম বা পন্ডিতগণকে শরীআ বোর্ডের সদস্য মনোনীত করা হলে তাঁদের ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত জনগণ মানবে না। ফলে এর মাধ্যমে শুধু ব্যাংকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলামি ব্যাংক শুধু জনগণকে বুঝানো ও সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে নামে মাত্র একটি শরীআ বোর্ড গঠন করলে হবে না বরং শরীআ বোর্ডের সদস্যগণ যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সে সুযোগ দিতে হবে এবং ইসলামি ব্যাংকে ইসলামি শরীআর পরিপন্থী কোন কাজ করা হলে কিংবা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা রোধ করণে হস্তক্ষেপ করার পর্যাপ্ত ক্ষমতাও শরীআ বোর্ডের থাকতে হবে।

সুতরাং ইসলামি ব্যাংক-কে একটি পরিপূর্ণ ইসলামি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে শরীআ বোর্ড গঠনকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

১. শরীআ কাউন্সিল সদস্যদের কেউই ইসলামি ব্যাংকের কর্মকর্তা হবেন না। কারণ নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাগণ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রভাবিত হতে পারেন। তবে তাঁদের কাজের জন্যে উপযুক্ত সম্মানী ও সুযোগ সুবিধা থাকবে।

২. ব্যাংকের মালিকপক্ষ তথা বোর্ড অভ ডাইরেক্টরস শরীআ কাউন্সিলের কোন সদসস্যের উপর প্রভাব খাটাবে না। বরং ব্যাংকের কোন কর্মকান্ডে বোর্ড অভ ডাইরেক্টরস কিংবা কর্মকর্তা কর্তৃক ইসলামি শরীআর নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে শরীআ বোর্ডের নিকট তাঁদের জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকবে।

৩. শরীআ কাউন্সিলের সদস্যগণের স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার কাজ পরিলক্ষিত হলে কিংবা কোন

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা রোধ করার জন্যে শরীআ বোর্ডকে প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করা।

৪. ব্যাংকের কর্মকান্ড সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বোর্ড অভ ডাইরেক্টরস এর কোন সভা অনুষ্ঠিত হলে তাতে শরীআ বোর্ডের এক বা একাধিক সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো।

৫. ব্যাংকের স্বার্থে কিংবা ব্যাংকের কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা বাস্তবায়িত করার পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত ইসলামি শরীআ সম্মত কিনা তা শরীআ কাউন্সিল থেকে লিখিত অনুমোদন দেয়া।

৬. ব্যাংক যে সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করবে তা বাস্তবায়িত করার পূর্বে শরীআ বোর্ডের অনুমোদন নেয়া।

৭. ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ব্যাংকের কর্মকান্ড, কর্মপদ্ধতি এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সকল সার্কুলার ইস্যু করা হবে তা বৈধ কিনা এ বিষয়ে শরীআ বোর্ড থেকে লিখিত অনুমোদন নেয়া।

৮. শরীআ কাউন্সিলের রায় বা সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা। ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এমনকি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পর্যন্ত শরীআ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে এবং পালন করতে বাধ্য থাকা।

৯. ইসলামি ব্যাংক-কে একটি আদর্শ, কল্যাণকর এবং প্রকৃত ইসলামি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে শরীআ বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দেয়ার ব্যাপক অধিকার দেয়া।

১০. শরীআ কাউন্সিলের সদস্যদের যেন শরীআতী কোন কারণ ব্যতীত সহজেই পদচ্যুত করা না হয় তার ব্যবস্থা করা।

১১. শরীআ কাউন্সিলকে যে কোন সময় ব্যাংকের যে কোন কর্মকান্ড তদারক করার, বিভিন্ন ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করার, অডিট করার এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করার অনুমতি থাকা এবং এতদবিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার ব্যাংক কর্তৃক বহন করা।

ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিলকে যে সকল সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা প্রদানের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হল তা শরীআ কাউন্সিলকে দিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানাবে না। এছাড়া শরীআ কাউন্সিলেরও জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকবে।

এখানে আরো একটি বিষয় বলা দরকার যে, প্রতিটি ইসলামি ব্যাংকে একটি শরীআ কাউন্সিল থাকা তো প্রয়োজন। তবে যে দেশে একাধিক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে দেশের কেবল নিজস্ব শরীআ কাউন্সিল থাকা হয়তো যথেষ্ট হবে না। এক্ষেত্রে সকল ইসলামি ব্যাংকের যৌথভাবে বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শরীআ কাউন্সিল গঠন করা দরকার। প্রয়োজন বোধে দেশের বাইরের আলেম, ফকীহ, ইসলামি অর্থনীতিবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ, ব্যাংকার, দার্শনিক এবং ইসলামি আইনবিদগণের সমন্বয়ে বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শরীআ কাউন্সিল গঠন করা হবে। প্রতিটি ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যৌথ শরীআ কাউন্সিলের একজন সদস্য বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণী এবং কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি ব্যাংকের নিজস্ব শরীআ কাউন্সিলের অতিরিক্ত যৌথভাবে বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শরীআ কাউন্সিল গঠন করা দরকার। যৌথভাবে গঠিত বিশেষ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সেন্ট্রাল শরীআ কাউন্সিলেরও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার এবং বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের কর্মকান্ড যে কোন সময় তদারক করার এবং অডিট করার অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। যৌথভাবে গঠিত সেন্ট্রাল শরীআ কাউন্সিলের সদস্যগণ উপযুক্ত সম্মানী, সুযোগ সুবিধা এবং তদারক ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের খরচ ব্যাংকসমূহ যৌথভাবে বহন করবে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সেন্ট্রাল শরীআ কাউন্সিলের সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ নিষেধ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

শরীআ কাউন্সিলের কার্যবালী

ইসলামি ব্যাংকের শরীআ কাউন্সিল নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পদান করে থাকে-

১. ইসলামি ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং যে যে ক্ষেত্রে ইসলামি শরীআর নীতিমালাকে লঙ্ঘন করা হয় সেগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়া।

২. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প, সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞপ্তি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় ইসলামি শরীআর পরিপন্থী হলে তা বাতিল করে দেয়া এবং ব্যাংকের বিভিন্ন সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে যোগদান করা।

৩. ইসলামি ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রকল্প গ্রহণ, বিনিয়োগ পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিময়, পারস্পরিক অধিকার এবং ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ, তথ্য, ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করা।

৪. ইসলামি ব্যাংক এবং এতদ্সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্প অনুমোদনের জন্যে শরীআ বোর্ডে পেশ করা হলে তা শরীআ সম্মত কিনা খতিয়ে দেখা এবং শরীআ সম্মত হলে অনুমোদন দেয়া।

৫. ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলার (বিজ্ঞপ্তি) জারী করার পূর্বে তা অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হলে তা শরীআ সম্মত কিনা খতিয়ে দেখা এবং শরীআ সম্মত হলে অনুমোদন দেয়া।

৬. ইসলামি ব্যাংকে সালাত এবং এতদসংক্রান্ত ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয় কায়েম আছে কিনা তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করা।

৭. ইসলামি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার লেনদেন, বিনিয়োগ ও সার্বিক কার্যক্রম ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রয়োজনবোধে নিয়মিত অথবা বৎসরে এক বা একাধিক বার অডিট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একে 'শরীআ অডিট' বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এসদসংক্রান্ত কাজের জন্যে শরীআ বোর্ড প্রয়োজনীয় জনশক্তি কাজে লাগাবে এবং ব্যয়ভার ব্যাংক বহন করবে।

৮. ইসলামি ব্যাংকে ইসলামি শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা-তথা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা, কাজের সময়সূচি, চাকুরীচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত, অধিকার, শ্রমিক নির্যাতন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েম হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. শরীআ কাউন্সিল ব্যাংকের যে সকল কর্মকান্ড ও পদ্ধতিতে অনুমোদন দিয়েছে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সেভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং ইসলামি শরীআর নীতিমালার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. ইসলামি ব্যাংক-কে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যাপারে শরীআ বোর্ডকে সম্যক ভূমিকা রাখা দরকার। ইসলামি ব্যাংকের সমুদয় কার্যক্রম যাতে ইসলামি শরীআ ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেদিকে শরীআ বোর্ডকে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শরীআ বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলামের একটি মহৎ ও বৃহৎ কাজের বোঝা তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকে যদি ইসলামি শরীআর পরিপন্থী কোন কর্মকান্ড সংঘটিত কিংবা চর্চা হয়, আর শরীআ বোর্ড তা তদন্ত না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে কিংবা ইসলামি ব্যাংকের যাবতীয় কাজ ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত না করে তাহলে পরকালে আল্লাহর দরবারে এর জন্যে শরীআ বোর্ডকে অধিক দায়ী হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন।

১. শরীআ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক. সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা তদারক করা
খ. ব্যাংক ব্যবস্থাকে শরীআ অনুযায়ী পরিচালনা করা
গ. ইসলামি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা
গ. উপরের সকল উত্তরই সঠিক।

২. শরীআ কাউন্সিলের সদস্যগণ কেমন হবেন?
ক. উচ্চ শিক্ষিত
খ. ইসলামি চিন্তাবিদ
গ. মুত্তাকী
ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

৩. ব্যাংকের কর্মচারী কর্মকর্তা শরীআ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন কী?
ক. কোন কোন ক্ষেত্রে
খ. কর্মকর্তাগণ হতে পারবেন
গ. না, সদস্য হতে পারবেন না
ঘ. ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যগণ পারবেন।

৪. বাংলাদেশে ক'টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
ক. ৪ টি
খ. ৬ টি
গ. ৭ টি
গ. ২ টি।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. কোন শ্রেণীর লোক শরীআ কাউন্সিলের সদস্য হবেন?
২. শরীআ কাউন্সিলকে কোন কোন বিষয়ে নযর দিতে হবে? লিখুন।
৩. শরীআ কাউন্সিলের ৫টি কার্যের বিবরণ দিন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. শরীআ কাউন্সিল কী? শরীআ কাউন্সিল কোন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে? লিখুন।
২. শরীআ কাউন্সিলের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক

ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আলাদা। এতে জনগণের আমানত গ্রহণ বা অর্থবিনিয়োগ কোনটাই সুদভিত্তিক নয়। ইসলামি ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করে না। আবার সুদে কাউকে ঋণ দেয় না।

ও.আই.সি. সচিবালয় ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা নিম্নরূপ-

"Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the reciepts and payments of interest in on any of its operations."

"ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মৌলিক বিধান, নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিতে শরী'আতের মূলনীতি অনুসরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে এবং যার সমুদয় কাজ ও লেন-দেন সুদমুক্ত।" ও.আই.সি'র উক্ত সংজ্ঞা ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও.আই.সি'র নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ইসলামি মূলনীতি অনুসারে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং আর্থিক লেন-দেন করে থাকে, তাকে ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। নিম্নে ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর কার্যাবলী আলোচনা করা হলো ঃ

১. আমানত গ্রহণ ঃ ইসলামি ব্যাংক ব্যবসায় ও শিল্পে বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণের নিকট থেকে সুদবিহীন আমানত গ্রহণ করে। ব্যবসায় ও শিল্পে আমানত বিনিয়োগের ফলে যে লাভ হয় তার অংশ চুক্তি অনুসারে আমানতকারীকে প্রদান করা হয়। ইসলামি ব্যাংক সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে আমানত গ্রহণ করে থাকে ঃ

   ক. চলতি হিসাব (Current Account) ঃ যে হিসাবে যখন তখন টাকা জমা দেয়া ও ওঠানো যায় তাকে চলতি হিসাব বা Current Account বলা হয়। যে কোন কোম্পানী, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, সংস্থা ও ট্রাষ্ট কিংবা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ একাউন্ট খুলতে পারেন। এর জন্য সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা দিতে হয়।

   খ. লাভ-লোকসানে অংশীদারী মেয়াদী আমানত হিসাব ঃ এক হাজার টাকা অথবা এর দ্বিগুণ, তিনগুণ প্রভৃতি হারে অর্থ জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়। বারো, আঠারো, চব্বিশ, ত্রিশ, ছত্রিশ মাস মেয়াদী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ হিসাবে টাকা জমা রাখা যায়। এ একাউন্ট খোলার সময় নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করতে হয়। এ Account এর জন্য চেক বই দেওয়া হয় না। চেক বই এর পরিবর্তে প্রতিবার অর্থ জমা গ্রহণের বিনিময়ে টার্স ডিপোজিট রশিদ (PLS-TDR) ইস্যু করা হয়। লাভ-লোকসানের অংশীদারী মেয়াদিজমাকে এর প্রকৃতি অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে (i) অনুমোদন সমেত (with authorisation) এবং (ii) অনুমোদনহীন (without authorisation).

   গ. লাভ-লোকসানের অংশীদারী আমানত হিসাব ঃ এ হিসাব ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা দিয়ে খোলা হয়। প্রতি বছর ছ'মাস অন্তর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে Account এ জমাকৃত অর্থের লাভ-লোকসানের হিসাব করা হয়।

ঘ. নিরাপত্তা হিসাব ঃ (Payment order/Security Deposit) এ একাউন্টে ইসলামি ব্যাংক রশিদ প্রদান করে সুদমুক্ত আমানত গ্রহণ করে থাকে। টেন্ডার বা অন্যকোন চুক্তির ক্ষেত্রে এ রশিদ Security Deposit ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের আমানতের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করে না।

ঙ. লাভ-লোকসানে অংশীদারী বিশেষ নোটিশ ডিপোজিট হিসাব ঃ এ ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম প্রায় চলতি হিসাব খোলার মতই। ন্যূনতম অর্থ জমা দিয়ে যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এ হিসাব খুলতে পারে। যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায়। কিন্তু ওঠানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ সাতদিন আগে টাকার পরিমাণ জানিয়ে চিঠি দিতে হয়। এ হিসেবে দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে হিসাব করে ব্যাংক ঘোষিত হারে লাভ-লোকসান প্রদান করা হয়। ন্যূনতম পরিমাণ সংরক্ষণ না করা হলে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না।

২. বিনিয়োগ ঃ ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু মুনাফা অর্জনের উপরেই গুরুত্বারোপ করে না; বিনিয়োগের ভিত্তিতে যাতে সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখে। নিম্নে ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঃ ইসলামি ব্যাংক শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পরিবহন, স্থাবর সম্পত্তি এবং গৃহ নির্মাণ (Real Estate and Housing) প্রভৃতি খাতে স্বল্প অথবা মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে।

খ. মুদারাবা - স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ ঃ মুদারাবা বলতে এমন একটি চুক্তি বুঝায়- যার শর্তানুসারে একপক্ষ অর্থাৎ ব্যাংক মূলধন যোগান দেয় এবং অন্যপক্ষ অর্থাৎ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা চুক্তির নির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী লাভের জন্য তার দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা নিয়োজিত করেন। এ জাতীয় বিনিয়োগের কয়েকটি দিক হল-

- চুক্তির শর্তানাযায়ী মুনাফা ব্যাংক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে বন্টন করা হয়।
- ব্যাংক শুধু প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- উদ্যোক্তা বা তার কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক শর্ত লংঘন, অবহেলা, অদম্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কারণে কোন লোকসান হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক উদ্যোক্তার নিকট থেকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়ার অধিকার রাখে।

গ মুশারাকা অংশীদারী বিনিয়োগ ঃ মুশারাকা বলতে এমন ব্যবসায়িক চুক্তি বুঝায় যার অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগন দেয় এবং বাকি অংশ যোগান দেয় বিনিয়োগ গ্রাহক। এ পদ্ধতি অনুযায়ী-

- মূলধন সরবরাহের আগেই মুনাফা বন্টনের অনুপাত ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতিতে এ চুক্তিনামায় নির্ধারিত হয়।
- ব্যবসায়ে প্রকৃত লোকসানের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে তা বহন করে।

ঘ. মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয় ঃ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল বিক্রির জন্য ব্যাংক গ্রাহক সংগ্রহ করে এবং তা চুক্তির ভিত্তিতে কিছু লাভসহ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। মুরাবাহা চুক্তির বৈশিষ্ট্য হল-

- এ পদ্ধতিতে তিনটি পক্ষ থাকে যথা- ব্যাংক, বিক্রেতা (যার নিকট থেকে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) এবং ক্রেতা (যার নিকট ব্যাংক মাল বিক্রি করে)।
- মালামালের দাম ও লাভের অংক ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকতে হয়।
- ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে প্রস্তাবিত মালের মূল্যের ২৫/৩০ ভাগ জামানত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

ঙ. বায়-ই-মুয়াজ্জাল বা বাকিতে বিক্রয় ঃ বায়-ই-মুয়াজ্জাল বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে বাকিতে মাল বিক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে চুক্তিকে বুঝায়। এ পদ্ধতির বিশেষ দিক হলঃ

- এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পসহ বিভিন্ন খাতের উপকরণ ও মালামাল ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট তা বাকিতে বিক্রয় করে।
- গ্রাহকগণ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিমোধ করেন।
- চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরণ, গুণাগুণ, পরিমাণ, বিক্রয় মূল্য, সরবরাহের স্থান, সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়-সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

চ. বায়-ই-সালাম ঃ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ঃ বায়-ই-সালাম হলো এমন একটি ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহের শর্তে, ব্যাংক মালের ক্রয়মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে। এ ধরনের ব্যাবসায়িক চুক্তির কয়েকটি দিক হল-

- এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্প পণ্য অগ্রিম ক্রয় করে থাকে।
- এ পদ্ধতিতে ব্যাংক হচ্ছে ক্রেতা এবং গ্রাহক হচ্ছে বিক্রেতা।
- ব্যাংক এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের সময় গ্রাহককে অর্থের যোগান দেয়।

ছ. ভাড়ায় ক্রয় ঃ এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে, যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন ও এপার্টমেন্ট এবং গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে তা মালিকানা অর্জন করেন। এ পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল-

- গ্রাহক এ পদ্ধতির ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় করার আগ্রহ ব্যক্ত করে ব্যাংকের কাছে অনুরোধ জানায় এবং তার নির্ধারিত অংশের টাকা ব্যাংকে জমা দেয়।
- গ্রাহকের অংশের টাকার সাথে ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে।

জ. ইজারা ঃ ব্যাংক মেশীনারী সামগ্রী, যানবাহন, বাড়িঘর, জাহাজ ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় রেখে গ্রাহককে তা ভাড়ার চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা দেয়।

ঝ. করযে হাসানা ঃ লাভ-লোকসান মুক্ত ঋণকে করযে হাসানা বলা হয়। এ ঋণের উপর লাভ বা লোকসানের কোনটিই হিসাব করা হয় না। গ্রাহক যে পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তাই পরিশোধ করেন।

ঞ. নিলাম বিনিয়োগ ঃ ব্যাংক নিজের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী ছোট ও মাঝারী ধরনের শিল্প কারখানা তৈরি ও চালু করে ঐগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করে।

ট. স্বাভাবিক লাভের হারে বিনিয়োগ ঃ ছোট-খাট ব্যবসা যেগুলোতে বার্ষিক ব্যালেন্সশীট হয় না, সেগুলোতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য লাভের হারে এ ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে।

৩. বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক শরী'আতের সীমানায় অবস্থান করে বৈদেশিক বিনিময়সহ সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রমের অধীনে এ ব্যাংক ঃ (i) আমদানী; (ii) রপ্তানি, (iii) রেমিটেন্সেস এবং (iv) বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৪. যাকাত গ্রহণ ঃ ইসলামি ব্যাংক সম্পদশালী এবং শুভাকাঙ্খীদের দেয়া যাকাত, সাদকা ইত্যাদি গ্রহণ করে তহবিল গঠন করে থাকে এবং তা উন্নয়নমূলক খাতে অথবা দরিদ্র, অনাথ, ইয়াতীমদের মধ্যে নগদ অর্থে বণ্টন করে থাকে।

৫. লকার ভাড়া ঃ ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকদের মূল্যবান দলীলপত্র, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য গ্রাহকদের লকারের সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক লকার ভাড়া দেয়ার কারণে নির্দিষ্ট অর্থ পায়।

৬. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিয়োগ ঃ ইসলামি ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এতে তার লাভ-লোকশানের অংশীদারিত্ব থাকে।

৭. বিল কালেকশন ও পরিশোধ ঃ ইসলামি ব্যাংক বিল কালেকশনও পরিশোধ করে এবং গ্রাহকদের পক্ষে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে।

৮. বিবিধ ঃ

১. শেয়ার গ্রহণ, সনদ দান ও নবায়ন;
২. হস্তান্তরের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন;
৩. বিনিয়োগ ট্রাষ্টি হিসেবে কাজ করে;
৪. বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে;
৫. কোম্পানির পক্ষে মূলধন আদায় করে;
৬. গ্রাহকদের পরামর্শ প্রদান করে;
৭. ত্রাণকার্য পরিচালনা করা;
৮. লেটার অব ক্রেডিট বা ঋণপত্র খোলা;
৯. ভূ-সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা;

১০. এজেন্ট নিয়োগ করা;

১১. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য কারিগরী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত পরামর্শ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।

১২. বিশেষ উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প বা ভূ-সম্পত্তিতে বিশেষ তহবিল গঠন ও পরিচালনা করা।

১৩. ইসলামি আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে ঘাটতি পূরণের জন্য সলিডারিটি ও সিকিউরিটি তহবিল গঠন করা।

সারকথা

ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত এবং ইসলামি নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম, আমানত গ্রহণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ, যাকাত গ্রহণ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিয়োগ, বিল আদায় ও পরিশোধ ইত্যাদি সকল কার্যক্রমে ইসলামি নীতিমালা মেনে চলা হয়। একজন মুসলমানের জন্য সুদী ব্যাংকিং লেনদেন পরিহার করে সুদমুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংক কয়ভাবে আমানত গ্রহণ করে?

ক. ৪ ভাবে খ. ৩ ভাবে
গ. ২ ভাবে গ. ৬ ভাবে

২. লাভ-লোকসানের অংশীদারী আমানত বছরে কয়বার হিসাব করা হয়?

ক. দু'বার খ. চারবার
গ. তিনবার ঘ. একবার

৩. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত কয় ধরনের বিনিয়োগ করে থাকে?

ক. ৮ ধরনের খ. চার ধরনের
গ. এগার ধরনের ঘ. পাঁচ ধরনের

৪. বায়-ই সালামে পণ্যের মূল্য-

ক. অগ্রিম প্রদান করা হয় খ. নগদ লেনদেন করা হয়
গ. চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রদান করা হয় গ. ১ এবং ৩ নং উত্তর সঠিক।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দিন।
২. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণের পদ্ধতিগুলো লিখুন।
৩. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরাবাহা এবং মুশারাকা বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. বায়-ই-মুয়াজ্জাল এবং বায়-ই সালাম বলতে কী বুঝায়? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ও এর সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন
- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ইসলামিকরণের বাঁধাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় অনেক আগে থেকেই। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম বিশ্বে যখন ইসলামি পুনর্জাগরণের জোয়ার আসে এবং বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণসুদবিহীন ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তখন বাংলাদেশের ইসলামি চিন্তাবিদঘনও থেমে থাকেননি। তাঁরা তখন ইসলামি ব্যাংকিং এর উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাতে থাকেন। বাংলাদেশর জনগণ মুসলমান হিসেবে ইসলামি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। অর্থনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে তোলার দাবী ও আকাঙ্ক্ষা তাঁদের দীর্ঘ দিনের লালিত। কিন্তু পরাধীন জাতির ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা থাকলে সবকিছু করতে পারে না। মুসলিম জনগণের দাবী ও আকাঙ্ক্ষা থাকলে সবকিছু করতে পারে না। সুমলিম জনগণের দাবী ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে দেশ বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম, ইসলামি চিন্তাবিদ, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার এবং মুসলিম জাতিকে সুদের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর-এর শাসনামলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের লাহোর সম্মেলনে ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ করে এবং একই বছরের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) চার্টারে স্বাক্ষর করে দেশের অর্থ ব্যবস্থা ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৯৮১ সালে জানুয়ারী মাসে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৌদী আরবের তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইস'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। নভেম্বর, ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' দেশের বাইরের কয়েকটি দেশে ইসলামি ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। অতঃপর ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবি'র একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন এবং এখানে বেসরকারীভাবে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরা লক্ষ করেন যে, এদেশে সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে এখানে ইতোমধ্যে অনেক কাজও সম্পাদন করা হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর বেশ কয়েকটি সেমিনার, প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ইসলামি সংস্থা ইসলামি ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামি শরীআ নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার এবং আর্থনীতিতে ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ 'ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৮৩ সারের ১২ই আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বের ৫৬টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক, দুবাই ইসলামি ব্যাংক, বাহরাইন ইসলামি ব্যাংক প্রভৃতি ইসলামি ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এ বংকের মূলধন যোগানে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, আইসিবি, আইইআরবি, কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় ব্যক্তিবর্গ।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে দ্বিতীয় ইসলামি ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড' নামে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে ইসলামি শরীআর ভিত্তিতে পরিচালিত আরো তিনটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

লাভ করে। এ তিনটি ইসলামি ব্যাংকের নাম হচ্ছে- (১) আল্ আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড, (২) সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (৩) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামি শাখা) (৪) শাহজালাল ব্যাংক। এছাড়া বাংলাদেশে আরো একাধিক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার পূর্ণাংগ ইসলামিকরণ সময়ের দাবী। বেসরকারি খাতে যে দু'টো ইসলামি ব্যাংক কাজ করছে তারা বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রয়োজনীয় গতিশীলতা অর্জন করতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবে দেশের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা ইসলামিকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও আজ অবধি কোন ব্যাপক ও কর্যকর পন্থা গৃহীত হয়নি। নিম্নে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের পথে অন্তরায়সমূহের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো ঃ

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামিকরণের পথে অন্তরায়

১. সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব ঃ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামি ব্যবস্থায় রূপান্তর করার জন্য প্রথম এবং প্রধান যে পদক্ষেপ দরকার তা হচ্ছে- এ ব্যাপারে ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবধর্মী একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। কাজ যত মহৎ এবং কল্যাণকর হোক সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা ব্যতীত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকার যদিও এ ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১৯৭৫ বাংলাদেশ ওআইসি বেং আইডিবি-এর গঠনতন্ত্রের সাথে একমত হয়ে এ ব্যাংকের সদস্য পদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়-

Strict adherence to Islam and Islamic Principles and values, as a way of life, constitutes the highest protection for Muslim against the dangers which confront them. Islam is the only path which can lead them to strenght, diginity, prosperity and a better future. অর্থাৎ "মুসলিমগণ ে যসব বিপদের সম্মুখীন হয় তা থেকে রক্ষা পেতে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম, ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধ কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরাই হচ্ছে আসল কাজ। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যা তাদেরকে শক্তি, সম্মান, উন্নতি এবং উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।" উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশ ঐকমত্য পোষণ করে। আমাদের দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও এর মাধ্যমে পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামিকরণ সরকারের প্রচেষ্টায়ই সম্ভব।"

ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, কেবল সরকারি পদক্ষেপই ব্যাংকিং তথা গোটা অর্থনীতিকে ইসলামিকরণ করার ক্ষমতা রাখে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপগ্রহণ অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, সুদের ন্যায় একটি জঘন্য হারাম থেকে দেশের মানুষকে বাঁচানোর প্রধান দায়িত্ব এদেশের সরকারেরই।

২. শিক্ষার অভাব ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের দ্বিতীয় অন্তরায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা নেই। এমনকি, বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামি ব্যাংক তার কার্যক্রম চালু করলে এ এখন পর্যন্ত বিএ/বিএ পাস, বিএ/বিএসএস অনার্স কোর্সেও ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টির অধিক ইসলামি ব্যাংক চালু থাকলেও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়েও তা পড়ানো হচ্ছে না। ফলে লোকজন শিক্ষিত হচ্ছে বটে কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর দিক দিয়ে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তারা অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে ইসলামি ব্যবস্থার তুলনা করতে সুযোগ পাচ্ছে না। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশ জুড়ে এর অসংখ্য শাখা থাকলেও দেশে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করায় নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন-

   ক. এক নতুন উদ্যোগ হিসেবে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্য যে ব্যাপক গবেষণা, পুস্তকাদি প্রণয়ন ও পথ নির্দেশনা দরকার এবং এজন্য যে ধরনের প্রতিভাধর যোগ্য লোক প্রয়োজন তা তৈরি হচ্ছে না।

   খ. ইসলামি ব্যাংক পরিচালনার জন্য যে দরণের যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তির প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা সরবরাহ করছে না। এছাড়াও গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের জন্য যে বিপুল সংখ্যক জনশক্তির প্রয়োজন তাও তৈরি হচ্ছে না।

৩. দক্ষ জনশক্তির অভাব ঃ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামিকরণের পথে তৃতীয় বড় অন্তরায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাব। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ইসলামিকরণ করতে হলে প্রথমে ব্যাংকে কর্মরত লোকদেরকেই তা করতে হবে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের ধারণা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মনীতি প্রচলিত ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ নব ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়া ব্যাংকসমূহ পরিচালনা করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই ব্যাংকসমূহ এবং সরকারের যৌথ প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহজেই এ সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

৪. প্রয়োজনীয় আইন কাঠামোর অভাব ঃ দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্টা লাভ করেছে বটে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন আজও প্রণীত হয়নি। এ দিকে প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য না থাকায় ব্যাংকগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে পারছে না। ইসলামি ব্যাংকিং লেন-দেনে চুক্তি ভংগ হলে ইসলামি আইন অনুসারে গঠিত আদালতে তার সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু আজও তা কায়েম হয়নি।

৫. ইসলামি বিনিয়োগের পরিবেশের অভাব ঃ দেশে ইসলামি বিনিয়োগের পরিবেশ না থাকায় ইসলামি ব্যাংকসমূহকে বিনিয়োগ বিমুখ করে রাখছে এবং রাখবে। এ থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে ইসলামি মুদ্রাবাজার, পুঁজিবাজার গঠন হওয়া দরকার। ইসলামি নীতিমালা মুতাবেক আর্থ-সামাজিক কাঠামো ঢেলে সাজানো না হলে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারবে না।

৬. আয়কর আইন ঃ দেশের প্রচলিত আইন ইসলামি ব্যাংকিং এর পক্ষে এক বড় সমস্যা। আয়করের উচ্চহার ও আয়কর প্রশাসকের অমনোযোগের দরুণ দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বর্তমান রয়েছে। করের হার কমিয়ে এমন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে যাতে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা আদৌ না থাকে। এং যাকাতের মত অবশ্য দেয়সহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক দান যাতে আয়কর মুক্ত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. কোম্পানি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর অভাব ঃ বর্তমান কোম্পানি আইন রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। সময়ের আবর্তনে এ আইন আজ স্বাধীন দেশের জন্য যথেষ্ট উপযোগী বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। এ আইন সংশোধন করে কোম্পানি গঠনকে আরো গণমুখী ও গতিশীল করা এবং ইসলামি ব্যাংকিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সহজতর করা দরকার। তা না হলে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাধাগ্রস্থ হবে।

৮. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রচারণার অভাব ঃ ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বমহলে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কোন সার্বিক ও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামি ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী এবং ইসলামি ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়।

৯. ইসলামি বীমা ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাব ঃ সার্বিক কার্যক্রম শরী'আতের সীমার মধ্যে পরিচালনা করা সত্ত্বেও কেবল টাকার জন্য সুদী কোম্পানীর দারস্থ হতে হয়। এতে ব্যাংকের পুরো আয় সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের সাথে বীমাকেও ইসলামিকরণ জরুরি। তবে ইদানীং কয়েকটি ইসলামি বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকার এ ব্যাপারে বাস্তব সহযোগিতা প্রদান করলে এবং অন্যান্য বীমা কোম্পানীকে ইসলামিকরণের উদ্যোগ নিলে সম্পূর্ণ অর্থনীতিকে ইসলামিকরণ সহজতর হবে।

১০. ইসলামি ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের অভাব ঃ ইসলামি শরীআ অনুসারে বিভিন্ন ধরন ও মেয়াদী ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের অভাব ইসলামি ব্যাংকিংকে কার্যকর বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত করছে। এজন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট, ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট, মুদারাবা বন্ড, পার্টিসিপেশন টার্ম সার্টিফিকেট, ইসলামিক কমার্শিয়াল পেপার, সলিডারিটি বন্ড ইত্যাদি চালু করা প্রয়োজন।

১১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কোষের অভাব ঃ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণে যথেষ্ট অবদান রাখছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক- বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে "ইসলামি অর্থনীতি সেল" নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত এ সেলের কার্যক্রম যথাযথভাবে শুরু হয়নি।

১২. সরকারি অর্থায়নে সুদবিহীন সার্টিফিকেট চালুর অভাব ঃ সরকারের অর্থ ঘাটতি পুরণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত বন্ড, সার্টিফিকেট তৈরি না হলে ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের উদ্বৃত্ত তারল্য খাটাতে পারবে না। সরকার যদি সুদমুক্ত বন্ড, সার্টিফিকেটের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতিজনক বন্ড চালু করত, তবে ইসলামি

ব্যাংকসমূহে স্বীয় অলস অর্থ এরূপ বন্ডে খাটাতে পারত। ফলে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাও অধিকতর কার্যকর হত।

বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধানে ইসলামি শরী'আ বিশ্বজনীনভাবে কাজ করে আসছে। যা শত শত বছর যাবত মানুষের কল্যাণ সাধন করে চলছে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। বর্তমান বিশ্বের আর্থিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে ব্যাংকিং সমস্যা সমাধানেও ইসলাম যে সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে আজকের ইসলামি ব্যাংকের উত্তরোত্তর অগ্রগতি এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৮৮ খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৮৪ সালে গ. ১৯৮১ সালে

২. ১৯৮১ সালে ওআইসি'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
ক. মক্কায় খ. রাবাতে
গ. তায়েফে ঘ. অম্মানে

৩. "ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে

৪. ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে শরীআ ভিত্তিক কয়টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. পাঁচটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. দু'টি

৫. কোনটি ইসলামি ব্যাংক?
ক. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক খ. আরব ন্যাশনাল ব্যাংক
গ. সোশ্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক ঘ. কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন।
২. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামিকরণের পথে অন্তরায়সমূহ হতে পাঁচটি অন্তরায় উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন।
২. বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামিকরণের পথে অন্তরায়সমূহ কী কী? উল্লেখ করুন।

পাঠ ঃ ৮

ইসলামি ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা কিভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা বলতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম শুরূ হয় ১৯৮৩ সালে। একই বছর ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর ১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে আরো দু'টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দুটি ব্যাংক হলো সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ ও আল-আরাফা ইসলামি ব্যাংক লিঃ। এদেশে ইসলামি ব্যাংকের প্রাথমিক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ইসলামি ব্যাংকের সম্ভাবনা ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রাইম ব্যাংকে একটি ইসলামি বুথ খোলা হয়েছে। এ বুথে লেনদেনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আগ্রহ উল্লেখ করার মত। বাংলাদেশে প্রথমে যারা ইসলামি ব্যাংকের যাত্রা শুরূ করেন তাদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, প্রশিক্ষিত জনশক্তি ও উপায় উপকরণের অভাব ছিল। তা সত্বেও গত দুই যুগের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর অভিজ্ঞতায় সাফল্য ও সম্ভাবনার যে ইংঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে তাতে এ দাবি খুবই যুক্তিসঙ্গত যে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের সকল ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ইসলামিকরণ করা উচিৎ। নিম্নে ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হল-

১. সুদমুক্ত লেনদেনের পরিবেশ সৃষ্টিঃ ইসলামি ব্যাংকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সুদমুক্ত লেনদেনের স্বার্থে। আল্লাহ পাক সুদকে সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন। এমতাবস্থায় কোন মুসলমান সুদভিত্তিক লেনদেন করতেই পারে না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের অনুপস্থিতিতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই একজন মুসলমানকে সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে হয়। ইসলামি ব্যাংক এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তি দেয় এবং সুদমুক্ত লেনদেনের সুযোগ তৈরী করে।

২. স্বল্পবিত্তের লোকদের বিনিয়োগ/সুদমূক্ত ঋণ সুবিধা দানঃ সুদ ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণত সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করেনা। যার অর্থ হলো, যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি অথবা কমপক্ষে জামানত দেয়ার মত যথেষ্ট স্থাবর সম্পত্তি আছে সেই-ই শুধু ঋণ পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যবস্থায় স্বল্প বিত্তের মানুষ ঋণ পায়না। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেরও বেশীরভাগ মানুষ হয় বিত্তহীন নয়তো স্বল্পবিত্তের। ফলে সুদী ব্যাংকসমূহ থেকে তাদের ঋণ পাওয়ার সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য চাই জামানতবিহীন ঋণের নিশ্চয়তা। কেবল ইসলামি ব্যাংকই জামানতবিহীন সুদমুক্ত ঋণ/ লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

৩. উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানঃ সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ঋণের মাধ্যমে শিল্প বা ব্যবসায়ে অর্থায়ন করা হলে যদি কোন কারণে লোকসান হয় তবে ব্যাংক সে লোকসানের দায় বহন করেনা। সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করতে হয় উদ্যোগী ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী বা ফার্মকে। উদ্যোক্তা এক্ষেত্রে যুগপৎভাবে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এক. উদ্যোক্তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় উদ্যোগ বা প্রয়াসের সুযোগ ব্যয় করে অর্থাৎ যে শ্রম বা প্রয়াস নিয়োজিত করার পর উদ্যোক্তা আলোচ্য লোকসানের সম্মুখীন হলেন তার সেই নিজস্ব শ্রম বা প্রয়াস অন্য কোন ফার্মের নিকট বিক্রি করলে অবশ্যই একটা দাম পেতেন। অন্য কথায়, উদ্যোক্তা অন্য কোথাও চাকুরী করলে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট বেতন পেতেন কিন্তু সেই শ্রম লাভের আশায় নিজের প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে বিনিয়োগ করেছেন। এখন যখন নিজের প্রতিষ্ঠানে লোকসান হলো, তখন উদ্যোক্তা না পেলেন লাভ না পেলেন বেতন।

দুই. আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা তার শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেছিলেন, লোকসান হওয়ার ফলে তার উপর প্রত্যাশিত মুনাফা তো পাচেছনই না উপরন্তু পুরা কারবারের

ক্ষতি তাকেই বহন করতে হচ্ছে যার অর্থ তার স্বনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কমে যাওয়া।

তিন. উদ্যোগ ও মূলধনের এই বিরাট ক্ষতির বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসেবে এবার যোগ হয় সুদে অর্থলগ্নিকারী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের সুদ বাবদ পাপ্য বিরাট অংকের টাকা যা কোন অবস্থাতেই মওকুফযোগ্য নয়।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের ঋণদানব্যবস্থা নতুন পুরাতন সকল প্রকারের উদ্যোক্তাকেই নিরূৎসাহিত ও সর্বশান্ত করতে বাধ্য। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য এ ধরণের ঋণদানব্যবস্থা কোনক্রমেই উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারেনা। একারণেই স্বাধীনতার তিন যুগের অধিক সময় পার হওয়ার পরও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত ও হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। এরফলে একদিকে দেশের শিল্পায়ন ব্যহত হয়েছে অন্যদিকে অগণিত উদ্যমী কর্মপ্রার্থী যুবক হয়ে গেছে বেকার, যা তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে মারাত্মক হতাশা, আর এ সর্বব্যাপী হতাশাই তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে সর্বনাশা নেশার কবলে কিংবা দাঁড় করিয়েছে রাস্তায় খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, মাস্তানী আর সন্ত্রাসের নিয়ামক হিসেবে।

ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা এ চরম হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা থেকে এ দেশে বাণিজ্যকে যেমন রক্ষা করতে পারে তেমনি হতাশাগ্রস্ত অথচ সম্ভাবনাময় এই বিরাট যুবসমাজকে দিতে পারে সম্মানজনক জীবিকা ও কাজের সন্ধান। কেননা ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনা বা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ প্রদান করে তবে প্রকৃত লোকসানের সবটাই বহন করবে ব্যাংক। বিশেষকরে স্বল্পবিত্তের জামানতবিহীন সৎ, যোগ্য ও উদ্যমী নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য এ যে কতবড় সুসংবাদ তা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। কেউ ভাবতে পারেন যে, এ ব্যবস্থায় উদ্যোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কান্ডজ্ঞানহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে লোকসান ডেকে আনতে পারে কিংবা হিসাবপত্রে অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত লাভকে লোকসান দেখিয়ে ব্যাংকের বারোটা বাজাতে পারে? এ ধারণা মোটেই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবভিত্তিক নয়। কারণ-

প্রথমতঃ প্রকৃত লোকসানে উদ্যোক্তার দায় না থাকলেও প্রকৃতলাভে তার অবশ্যই অংশ রয়েছে। সুতরাং অবহেলার মাধ্যমে নিজের লভ্যাংশ খুইয়ে দেয়া স্বাভাবিক আচরণ নয়।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক হিসাব পদ্ধতি এতই জটিল ও স্বপ্রমাণিত যে, প্রকৃত লাভকে লোকসানে রূপান্তরিত করা খুবই কঠিন, বলা যায় অসম্ভব ব্যাপার।

তৃতীয়তঃ মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারবার পরিচালনার মৌল নীতিমালা ও শর্তাবলীর বিষয়ে ইসলামি ব্যাংক ও মুদারিব ব্যক্তি বা সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মুদারিব কর্তৃক যথাযথ অনুসৃত হচ্ছে কি-না তা তদারক করার জন্য ইসলামি ব্যাংক (ছাহেবে মাল) একটি মনিটরিং সেল গঠণ করে থাকে যার ফলে মুদারিবের পক্ষে চুক্তির শর্ত লংঘন করে বা এড়িয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কারবারকে ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করানো খুব সহজ হবেনা। অন্যকথায়, উদ্যোক্তা কখনোই এককভাবে ব্যবসার ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না।

৪. অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন নিশ্চিত করাঃ সুদী ব্যবস্থায় উৎপাদকের পরিচালনা ব্যয়ের (operating cost) পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট আর্থিক ব্যয় (financial cost) ও থাকে। এ আর্থিক ব্যয় সাধারণত সুদের হারের সমান। ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ের বালাই নেই। যেমন, প্রচলিত ব্যবস্থায় সুদের হার যদি ১৫% হয়, তার অর্থ হচ্ছে উৎপাদককে সমুচ্চ বিন্দুতে পৌছার জন্য (break even point) তার উৎপাদন খরচের অতিরিক্ত কমপক্ষে ১৫% লাভ করতেই হবে। অন্যকথায় জাতীয় স্বার্থে একটি প্রকল্প যতই গুরুত্বপূর্ণ হোকনা কেন তা থেকে উপার্জনযোগ্য লাভের হার কমপক্ষে ১৫% না হলে সুদী ব্যবস্থায় সে প্রকল্পে বিনিয়োগের কোন সুযোগই নেই। বাংলাদেশের অনেকগুলি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী কেন জীবন রক্ষাকারী ঔষধের চেয়ে কেবল অধিক লাভের জন্য জীবন সাজানোর প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদানে অধিকমাত্রায় ঝুঁকে পড়ছে তার যথার্থ ব্যাখ্যা হচ্ছে এ সুদী লগ্নী ব্যবস্থা। ১৩ কোটি মানুষের এ বাংলাদেশে জীবন সাজানোর চেয়ে জীবন বাঁচানোর সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনেক বেশী প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থাই এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কাংঙ্খিত সেই দ্রব্যাদির উৎপাদন নিশ্চিৎ করতে সক্ষম।

৫. দেউলিয়াত্বের হাত থেকে ব্যাংকিং সেক্টরকে বাঁচানোঃ ব্যাংকিং ব্যবসাকে বলা হয় পরের ধনে পোদ্দারি। সে কারণেই ব্যাংক ব্যবসা শতকরা একশত ভাগ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যাংকের উপর একবার

মানুষের আস্থা বিনষ্ট হলে তা ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন। আর কোন ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার অর্থ আমানতকারীদের চূড়ান্ত সর্বনাশ। সুদী ব্যাংকিং জগতে প্রায়শঃ এ দুর্ঘটনাটি ঘটছে। বাংলাদেশে বি.সি.আই এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বি.সি.আই.সি কেলেঙ্কারি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত পুজিবাদী রাষ্ট্রে ও প্রায় প্রতি বছরই শতাধিক ব্যাংকে দেউলিয়ার ঘটনা ঘটে। অথচ গত প্রায় তিন যুগের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে কোন ইসলামি ব্যাংক দেউলিয়া গ্রস্থ হয়নি। কারণ, ইসলামি ব্যাংকের গঠন কাঠামোতে এমন উপাদান সন্নিবেশিত আছে যার ফলে একটি প্রকৃত ইসলামি ব্যাংক কখনো দেউলিয়া হতে পারেনা। ইসলামি ব্যাংকের ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতা (shock absorbing capacity) সুদী ব্যাংকের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। সাময়িকভাবে কোন ইসলামি ব্যাংকের আর্থিক লোকসান হতেও পারে। কিন্তু যেহেতু- ইসলামি ব্যাংকের সাথে আমানতকারীর সম্পর্ক মুনাফা বন্টন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্যাংকের প্রকৃত ক্ষতি আমানতকারীকেই বহণ করতে হয়। অর্থাৎ, লোকসানের বেলায় ইসলামি ব্যাংককে আমানতকারীর আমানতের উপর কোন নির্দিষ্ট লাভ তো করতে হয়-ই না, উপরন্তু আনুপাতিকভাবে আমানতকারীর আমানত হ্রাস পায় । এভাবেই ইসলামি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এদিক থেকে বিচার করলেও বাংলাদেশের মত অস্থিতিশীল অর্থনীতির একটি দেশে ইসলামি ব্যাংকই হতে পারে সর্বোত্তম পছন্দ।

৬. ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রাস্ফিতি দুর করাঃ প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ কম আমানত সৃষ্টি করে থাকে। একে ঋণসৃষ্টি বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করে না বরং ঋণদান করে। ব্যাংক যখন কোন মক্কেলকে ঋণদান করে তখন তাকে ঋণের অর্থ হাতে হাতে না দিয়ে দুতরফা দাখিলার নিয়মানুসারে ব্যাংকে রক্ষিত মক্কেলের হিসাবে মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ জমা করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকে (secondary deposit) মাধ্যমিক আমানতের সৃষ্টি হয়, ফলে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানক্ষমতা যেহেতু আমানতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল তাই ঋণসৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রবৃদ্ধি পাইলে কাজগুলো (fictitious) আমানতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানক্ষমতা ও বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন সুদী ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ১ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনগত রিজার্ভ অনুপাত (legal reservse ratio) ৪%। এমতাবস্থায় ঐ বাণিজ্যিক ব্যাংকটি তার এক কোটি টাকার প্রকৃত আমানত থেকে ১০% বাদ দিয়ে সর্বাধিক ৯০ লাখ টাকা ঋণদান করতে পারবেন। এ টাকা মক্কেলকে সরাসরি নগদ টাকায় না দিয়ে ব্যাংকে রক্ষিত তার একাউন্টে জমা করার ফলে ব্যাংকের মাধ্যমিক আমানত (secondary deposit) সৃষ্টি ৯০ লাখ টাকা। এ ৯০ লাখ টাকা থেকে আইনগত রিজার্ভের অনুপাত ১০% (৯,০০০ টাকা) বাদ দিয়ে বাকী ৮১,০০০ টাকা ব্যাংক নতুন করে ঋণদান করতে পারবে। এ ভাবে সুদী বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রত্যেকটি ঋণদান নতুন আমানতের সৃষ্টি করতে থাকে এবং ব্যাংক ঋণের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এ ধরণের কাগুজে (fictitious) ঋণদান অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় যা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, ইসলামি ব্যাংক অর্থের লগ্নি করেনা বরং পণ্যের কেনাবেচাই ইসলামি ব্যাংকের মূল ভিত্তি। এ ইসলামি বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি ত করেইনা বরং উল্টা মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৭. অংশগহণমূলক র্আয়ন নিশ্চিৎ করাঃ ইসলামি ব্যাংক ঝুঁকিতে অংশগহণ করে মূলত উদ্যোক্তাকে শুধু উৎসাহিতই করেনা বরং ব্যাংক তার অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও তত্বাবধান দিয়ে মক্কেলের ব্যাবসার সাফল্য নিশ্চিৎ করতে চায়। কারণ, ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে মক্কেলের ব্যবসার সাফল্য ও ব্যর্থতার সাথে ব্যাংকের স্বার্থও জড়ানো থাকে। একের সাফল্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে আর এভাবেই জোয়ার আসে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে।

৮. জাতীয়ভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধিঃ এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলিম। ইসলাম সকল প্রকার সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম করেছে। আল-কুরআনে সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সুদের আদান প্রদানকে নিজের মায়ের সাথে সত্তর বার ব্যভিচারের সমতুল্য গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবগতভাবে খুবই ধর্মপ্রান বিধায় দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ সুদের ভয়ে কখনোই তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখেনা। কেবল অধিক সংখ্যায় ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এসব সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব।

৯. ঈমানদার আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষাঃ মুসলমানদের মধ্যে যারা সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন তাদের অনেকেই ধর্মীয় কারণে জমাকৃত অর্থের উপর সুদ গ্রহণ করেন না। যার অর্থ হলো, ক্ষুদ্র আমানতকারীগন

তাদের ঈমান রক্ষার প্রয়োজনে আমানতের উপর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচেছন এবং এ অর্থ থেকে যাচেছ ব্যাংক মালিকের কাছে যে প্রকৃতপক্ষে এর হকদার নয়। এ ব্যবস্থা আমানতকারীদের নিরূৎসাহিত করতে বাধ্য। দেশে ইসলামি ব্যাংক কর্মরত থাকলে ক্ষুদ্র ঈমানদার আমানতকারীগণকে তাদের আমানতের উপর আয় থেকে বঞ্চিত হতে হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-বারাকা ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৮৩ সালে
খ. ১৯৮৫ সালে
গ. ১৯৮৭ সালে
ঘ. ৯৯৫ সালে

২. জামানতবিহীন ঋণব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে-

ক. পুঁজিবাদ ব্যাংকব্যবস্থা
খ. সুদী ব্যাংকব্যবস্থা
গ. ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা
ঘ. সেক্যুলার অর্থব্যবস্থা

৩. কোন জাতীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে?

ক. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
খ. জনতা ব্যাংক
গ. ইসলামি ব্যাংক
ঘ. সোনালী ব্যাংক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদী ব্যাংকব্যবস্থায় উদ্যোক্তা কয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? লিখুন।

২. "ইসলামি অর্থব্যবস্থা উৎপাদন নিশ্চিত করে" আলোচনা করুন।

৩. ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা দেউলিয়াত্বের হাত থেকে ব্যাংকিং সেক্টরকে রক্ষা করে-আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামিকরণের যৌক্তিকতা তুলে ধরুন।

পাঠ ঃ ৯

ইসলামি ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

◆ ইসলামি ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

ইসলামি ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নানা দিক থেকে এ পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। নিচে বিভিন্ন উপ শিরোনামে একে একে সে সব পার্থক্য আলোচিত হলঃ

উদ্দ্যেশ্য

ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক উভয়ই মুনাফা অর্জনের উদ্যেশ্যে কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। মুনাফা অর্জনই প্রচলিত ব্যাংকের প্রধান উদ্দ্যেশ্য। পক্ষান্তরে মুনাফা অর্জণ কোনক্রমেই একটি ইসলামি ব্যাংকের প্রধান উদ্দ্যেশ্য হতে পারে না। ইসলামি ব্যাংকের প্রধান উদ্দ্যেশ্য সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন সম্পাদনের মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহকারী ও পুঁজি ব্যবহারকারীর ন্যায্য স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিৎ করা।

তাত্বিক ভিত্তি

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের সকল স্তরে সুদ হচেছ প্রধান বিবেচ্য ও উদ্দীপক উপাদান। পক্ষান্তরে, ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের কোন অস্তিত্ব নেই। বরং সত্যি বলতে সুদী শোষণের নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দানের লক্ষ্যেই ইসলামি ব্যাংকের জন্ম। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকিং এর কর্মকান্ডের কোন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার সুদের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

তহবিলের উৎস

প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎস সাধারণত দুধরনের।
এক, ইক্যুইটি তহবিল। যেসব উপায়ে প্রচলিত ব্যাংক ইক্যুইটি তহবিল সংগহ করে থাকে সেগুলি হলোঃ
শেয়ার বিক্রয়ঃ প্রচলিত ব্যাংক শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে এ জাতীয় তহবিল সংগ্রহ করে। এ তহবিলের বিপরীতে প্রচলিত ব্যাংক সাধারণত লভ্যাংশ ঘোষণা করে থাকে।

ডিবেঞ্জার বিক্রয়

দুই, ঋণ তহবিল। যেসব উপায়ে প্রচলিত ব্যাংক ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে থাকে সেগুলো হলোঃ
সংগৃহীত আমানতঃ প্রচলিত ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার চলতি, সঞ্চয়ী মেয়াদী হিসাব খোলার মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। এছাড়া ডিপিএস জাতীয় বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমেও তারা তহবিল সংগহ করে থাকে। এ সব আমানতের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়।

কল মানি ঋণঃ সাময়িক অর্থ ঘাটতি মিটাবার জন্য প্রচলিত ব্যাংক অর্থবাজার থেকে অতি অল্প সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। যেসব ব্যাংকের উদ্বৃত্ত নগদ তহবিল থাকে তারা নির্দিষ্ট হার সুদে বিনিয়োগের জন্য অথবা চাহিবা মাত্র পরিশোধের শর্তে তারল্য ঘাটতিযুক্ত ব্যাংকে ঋণ দিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণঃ সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দিয়ে থাকে।

সাংগঠনিক কাঠামো

সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকেও ইসলামি ব্যাংকের সাথে প্রচলিত সুদভিকি ব্যাংকের একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলী ব্যাংকের সকল নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিচালকমন্ডলীর পাশাপাশি একটি শরীয়া কাউন্সিলও কার্যকর থাকে। শরীয়া

কাউন্সিল কার্যত পরিচালক মন্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করে। বিশেষ করে কোন ইসলামি ব্যাংক তার নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে শরীয়া নীতিমালা যথেষ্ট পরিমানে অনুসরণ করছে কি না তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব শরীয়া কাউন্সিলের। এর পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংকের দৈনন্দিন গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পরিচালক মন্ডলীর মধ্য থেকে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়ে থাকে।

বিনিয়োগ নীতিমালা

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সকল প্রকার বিনিয়োগ সুদভিত্তিক। সাধারণত ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতা ঋণের অর্থ ব্যবহার করে কোন লাভ অর্জণ করূক চাই না করূক ব্যাংক ঋণের অংকের উপর নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্টহারে সুদ আদায় করবেই।

পক্ষান্তরে, ইসলামি ব্যাংক সাধারণত ঋণে কোন অর্থ লগ্নি করে না। ইসলামি ব্যাংক কখনো কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিলে তা করজে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ হিসাবেই দিয়ে থাকে। ইসলামি ব্যাংক সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। যেমন,

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক ঋণ দানের পরিবর্তে মক্কেলের পক্ষে তার দরকারী পণ্য বা বস্তু ক্রয় করে এবং ক্রয়কৃত পণ্য বা বস্তুর ক্রয়মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যুক্তিসংগত ও উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা মক্কেলের কাছে বিক্রয় করে।

ভাড়া পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক তার মালিকানাধীণ কোন সম্পদ মক্কেলের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া দেয়। অথবা মক্কেলের ফরমায়েশ অনুযায়ী কোন সময় গাড়ী, নিজ নামে ক্রয় করে তা মক্কেলের নিকট ভাড়ায় খাটায়।

লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় যাতে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভ ইসলামি ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টিত হয়। পক্ষান্তরে, বিনিয়োগের যে কোন লোকসান মূলধনে অংশীদারিত্বের অনুপাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হচেছ-

ক. মুনাফা অর্জন করা
খ. কর্জে হাসানা দেওয়া
গ. প্রচলিত ব্যাংকের কার্যক্রম বিঘ্নিত করা
ঘ. সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করা।

২. প্রচলিত সুদী ব্যাংকের তহবিল সাধারণত কয় ধরনের?

ক. দু'ধরনের
খ. তিন ধরনের
গ. চার ধরনের
ঘ. পাঁচ ধরনের।

৩. ইসলামি ব্যাংক সাধারণত কয়ভাবে বিনিয়োগ করে থাকে?

ক. পাঁচভাবে
খ. ছয়ভাবে
গ. তিনভাবে
ঘ. চারভাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদী ব্যাংকের তহবিল গঠনের উৎস কী? লিখুন।
২. সাংগঠনিক কাঠোমোর দিক থেকে ইসলামি ব্যাংকের সাথে সুদী ব্যাংকের পার্থক্য লিখুন।
৩. প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতি ও ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতির বিনিয়োগ নীতিমালার পার্থক্য উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকিং ও সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

পাঠ ঃ ১০

বিনিয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- মুনাফা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- বাইয়ে মুশারাকা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাইয়ে মুশারাকা পদ্ধতির শর্তসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- বাইয়ে মুদারাবা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতির শর্তসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- বাইয়ে সালাম এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং বাইয়ে সালামের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- ইজারা ও মালিকানা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

মানুষ তার আয়ের যে অংশ ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে জমা করে তার নাম সঞ্চয় (savings)। এ সঞ্চয় যখন সঞ্চয়কারী নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন দ্রব্য (যেমন, ধান, পাট, কাপড়, জুতা) বা সেবা (যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা, টেলিফোন) উৎপাদনের কাজে লাগায় তখন তাকে বলা হয় বিনিয়োগ (investment)। এই বিনিয়োগের কাজটি প্রত্যক্ষ (direct) ও পরোক্ষ (indirect) দু'রকম হতে পারে। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (Direct Investment)ঃ মূলধন সরবরাহকারী যদি কোন মাধ্যম (intermediary) ছাড়াই সরাসরি মূলধন ব্যবহারকারী বা উদ্যোক্তার সাথে বিনিয়োগ চুক্তি চুড়ান্ত করে তবে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। যেমন কেউ এককমালিকানা বা শরীকানা কারবার গঠনের মাধ্যমে তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে। আবার কেউ সরাসরি কোন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণ ক্রয়ের মাধ্যমেও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করতে পারে।

পরোক্ষ বিনিয়োগ (Indirect Investment)t কোন অর্থ বিনিয়োগকারী যখন কোন মধ্যস্থতাকারী অর্থ প্রতিষ্ঠান (financial intermediary) যেমন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফাইনান্স কোম্পানী ইত্যাদির সহায়তায় কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ বিনিয়োগ। প্রচলিত ব্যবস্থায় হাজার হাজার মানুষ ব্যাংকে নির্দিষ্ট সুদের (deposit interest) বিনিময়ে টাকা জমা রাখে। ব্যাংক ঐ জমাকৃত টাকার অধিকাংশই কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সূদের (lending interest) বিপরীতে ধার দেয়। ব্যাংকের প্রাপ্য ও প্রদেয় সুদের হারের পার্থক্যই ব্যাংকের আয় বা মুনাফা হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে ইসলাম প্রত্যক্ষ পদ্ধতিকেই অগ্রধিকার দেয়। কারণ, এটি সহজ ও ঝামেলামুক্ত। ইসলাম বিনিয়োগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত যদি তা সূদমুক্ত হয়। কেননা, সুদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। আর ইসলাম হচেছ মানব কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সুদের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সর্বনাশা সয়লাব থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে তাই ইসলাম সকল প্রকার সুদকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থেই সুদকে বৈধতা দেয়া হয়নি। এমনকি ইহুদীরা সুদী কারবারের আদিপুরূষ হিসেবে ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করলেও তাদের ধর্মগ্রন্থে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আধুনিককালে ব্যাংকব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখা ও উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচিত। যদিও একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত আধুনিক ইসলামি সমাজ নির্মাণের জন্য একটি অত্যাধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার অপরিহার্যতা প্রশ্নের উর্ধে নয় তথাপি সহজ সত্য কথাটি হচ্ছে, অমুসলিম বিশ্ব তো বটেই এমনকি মুসলিম বিশ্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধারার আদলে একটি ব্যাংক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে আর্থিক কর্মকান্ড সচল রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করার কথা ভাবতে পারেনা। পৃথিবীতে বর্তমানে দুই ধারার ব্যাংকিং চালু রয়েছে। একটি অতি পুরাতন যা সুদী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অপরটি অতি সাম্প্রতিক যা লাভলোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইসলামি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার বয়স সবে মাত্র দুই যুগ অতিক্রম করেছে। এ সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল ও বিরূপ অবকাঠামো সত্বেও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়া জুড়ে যে ব্যাপক সাফল্য ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে তাতে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এদেশে আরো অধিক সংখ্যক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল ও অনস্বীকার্য।

বিনিয়োগ পদ্ধতি

ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সর্বসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার। এক, মুশারাকা; দুই, মুদারাবা

১. মুশারাকা পদ্ধতি

মুশারাকা হচেছ এমন এক কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভের উদ্দ্যেশ্যে কারবার সংগঠনের জন্য পুঁজি যোগান দেয়, কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ ক্ষতিতে অংশ নেয়। এ পদ্ধতিতে কারবারের সব শরীকই যুগপৎভাবে গণ্য হয়। শ্রম ও পুঁজি সরবরাহের ক্ষেত্রে কারবারের সদস্যদের মধ্যে পুঁজির পরিমাণে তারতম্য হতে পারে এমনকি কেউ পুঁজি সরবরাহ না করেও অংশীদার হতে পারে। ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ই কারবার পরিচালনায় অংশগহণ করতে পারে আবার এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতিনিধি বা ট্রাস্টী হিসেবে ও কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয় হচেছ, অংশীদারদের প্রত্যেকেই লাভ-লোকসানে অংশগহণ করছে। মুশারাকা পদ্ধতিটি অনেকটা আধুনিক অংশীদারী কারবারের মতই। তবে এতদুভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য খুবই উল্যেখযোগ্য। অর্থাৎ সাধারণ অংশীদারী কারবারে লাভ-লোকসান উভয়ই চুক্তি অনুপাতে বন্টিত হবে এবং চুক্তির অনুপস্থিতিতে অংশীদারদের মূলধন অনুপাতে বন্টিত হবে। পক্ষান্তরে, মুশারাকা কারবারে লাভ হলে তা চুক্তি অনুযায়ী এবং চুক্তির অনুপস্থিতিতে অংশীদারদের মূলধন অনুপাতে বন্টন হবে। কিন্তু কোন কারণে কারবারে লোকসান হলে তা অবশ্যই মূলধন অনুপাতে অংশীদারদের মধ্যে বন্টন হবে। এমনকি অংশীদারগণ সর্বসম্মতভাবে চাইলেও লোকসান বন্টনের জন্য মূলধন ছাড়া আর কোন অনুপাত বৈধ বলে গৃহীত হবেনা।

মুশারাকার শর্তসমূহ

১. চুক্তি ঃ অংশীদারদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। এ চুক্তিপত্র প্রত্যেক অংশীদারের প্রদেয় মূলধনের পরিমাণ, মুনাফার অংশ, কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা এবং অংশীদারদের বেতন-ভাতা বিষয়ে নিয়ম ও শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্ল্যেখ করতে হবে। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২. লাভ-লোকসান বণ্টন ঃ মুশারাকা কারবারের শুরূতেই শরীকদের মধ্যে আলাপ আরোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মুনাফার অংশ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মুশারাকা কারবারে কোন অংশীদারের মুনাফার অংশ তার পুঁজির অনুপাতে না হলে দোষ নেই; কিন্তু লোকসানের অংশ অবশ্যই পুঁজির অনুপাত অনুযায়ী হতে হবে। এটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

৩. কারবার পরিচালনা ঃ মুশারাকা কারবারে নীতিগতভাবে সকল অংশীদারের কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ কোন অংশীদার ইচছা করলে কারবার ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত ও থাকতে পারে।

৪. অংশীদারদের বেতন ভাতা ও পারিতোষিক ঃ আগের দিনের ফকীহগণ কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য কোন অংশীদারকে বেতন-ভাতা ইত্যাদি পারিশ্রমিক অনুমোদন করতেন না। কিন্তু আধুনিককালে ফকীহদের একটি অংশের মতে ম্যানেজিং পার্টনার অংশীদার হিসেবে কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগী হবার পাশাপাশি ম্যানেজার হিসেবে বেতন নিতে পারবেন যদি এ ব্যাপারে সকল অংশীদারের সম্মতি থাকে। তাদের মতে মুদারিব ও অংশীদারকে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, মুদারিব তার শ্রম ও দক্ষতার বলেই কারবারে অংশীদার হয়; এক্ষেত্রে পরিশ্রমের বিণিময়ে আবার বেতন-ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন আসেনা। পক্ষান্তরে, মুশারাকা কারবারে সকল অংশীদারই পুঁজির যোগান দানের বিণিময়ে লাভ-লোকসানের ভাগী হন এবং অংশীদারদের মধ্যে কেউ কারবার পরিচালনায় অংশ নিলে তিনি তার কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার। মুশারাকা কারবারে কোন অংশীদার তার নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারেনা। কিন্তু কারবারের উদ্যেশ্যে অংশীদারের যাতায়াত, থাকা খাওয়া ইত্যাদি খরচ কারবার বহন করবে।

২. মুদারাবা পদ্ধতিঃ

অন্যদিকে মুদারাবা এমন একটি ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি যেখানে একপক্ষ পুঁজির যোগানদাতা (supplier of capital) ও অপরপক্ষ পুঁজির ব্যবহারকারী (user of capital) রূপে বিবেচিত। মুদারাবা ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন হতে পারে তেমনই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন, ব্যাংক) মধ্যেও মুদারাবা গঠন করা যেতে পারে। আমানতকারী-ব্যাংক ও ব্যাংক গ্রাহক সমন্বয়ে যে মুদারাবা গঠিত হয় তাকে দ্বিধাপ (two tire Mudarabah) মুদারাবা বলে। প্রথম ধাপে আমানতকারী ছাহেবে মাল এবং ব্যাংক মুদারিব পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ধাপে ব্যাংক ছাহেবে মাল এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা মুদারিব। কারবারে লাভ হলে তা চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্টিত হবে পক্ষান্তরে কারবারের প্রকৃত লোকসানের সবটুকুই বহন করবে ছাহেবে মাল অর্াৎ পুঁজির যোগানদাতা। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা বা মুদারিবের ক্ষতি এতটুকু যে সে তার নিয়োজিত শ্রম বা তৎপরতার জন্য পারিশ্রমিক পাচেছনা। মুদারাবা চুক্তি কার্যকর করার জন্য ফকীহগণ বেশকিছু শর্ত আরোপ করেছেন যার মধ্য থেকে প্রধান শর্তসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১. চুক্তি ঃ মুদারিব ও ছাহেবে মাল এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। এ চুক্তিপত্রে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, ব্যবসার মেয়াদ (যদি কারবার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে), মূলধনের পরিমাণ, মুনাফার অংশ, কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিয়ম ও শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্ল্যেখ করতে হবে। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২. লাভ-ক্ষতি বন্টন ঃ মুদারাবা কারবারে মুনাফা চুক্তি অনুসারে মুদারিব ও ছাহেবে মালের মধ্যে বন্টিত হবে। মুনাফার অংশ অনুপাত (যেমন ১/২, ১/৩) অথবা শতকরা হিসাবে (যেমন ২০%, ২৫%) নির্ধারণ করতে হবে। আর লোকসানের দায় পুঁজির উপর বর্তাবে এবং সে লোকসান পুঁজির মালিক বা মালিকদের মধ্যে প্রত্যেকের পুঁজির আনুপাতিক হারে ভাগ করে দিতে হবে।

৩. কারবার পরিচালনা ব্যয় ঃ মুদারাবা কারবারের মুনাফা নির্ধারণের উদ্যেশ্যে কারবারের স্বাভাবিক উৎপাদন ও পরিচালন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া কারবারের কাজে মুদারিবকে যদি নিজ শহরের বাইরে যাতায়াত ও অবস্থান করতে হয় তবে সফরকালে সে পানাহার, পোশাক, পরিবহন, যাতায়াত ও খিদমতের জন্য নিযুক্ত ভৃত্যের খরচ পাবে। তবে নিজ শহরে অবস্থানকালে মুদারিব তার নিজের পানাহার, পোষাক-আশাকসহ নিজস্ব কোন খরচ কারবার থেকে বহন করতে পারবেনা। এছাড়া মুদারিবকে তার কাজের জন্য কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করাও বৈধ নয়।

উপরোল্লিখিত দুটি সর্বসম্মত পদ্ধতি ছাড়াও কয়েকটি বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রায়শঃ অনুসরণ করে থাকে। যার প্রকৃতি মূলত বাণিজ্যিক। অর্থাৎ এ পদ্ধতিগুলি ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে যতটা উপযোগী অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেতটা নয়। এজাতীয় পদ্ধতির মধ্যে সর্বাধিক উল্ল্যেখযোগ্য হচেছ, 'বাইয়ে মুরাবাহা', 'বাইয়ে মুয়াজ্জাল', 'ইজারা', 'বাইয়ে সালাম' ইত্যাদি। ইসলামি ফকীহগন প্রতিকুল বিনিয়োগ পরিবেশে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এসব বিতর্কিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহকে সীমিত অনুমতি প্রদান করেছেন। সেই সাথে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এসব পদ্ধতির যথেষ্ট ও ব্যাপক ব্যবহার ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যেশ্যকেই বানচাল করে দিতে পারে।

বাইয়ে মুরাবাহা

মুরাবাহা অর্থ লাভে বিক্রয়। সাধারণভাবে 'বাই-মুরাবাহা বলতে ক্রয় মূল্যের উপর বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফা, মার্জিন বা মার্ক-আপ ধার্য করে বিক্রয় করা বুঝায়। এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক মক্কেলের ফরমায়েশ অনুসারে নির্দিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করে এবং নির্ধারিত লাভসহ ঐ দ্রব্য মক্কেলের নিকট বিক্রয় করে। সাধারণত দ্রব্য ডেলিভারী নেয়ার সময় ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। তবে প্রয়োজনে ব্যাংক কর্তৃক ক্রেতাকে ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

বাইয়ে মুয়াজ্জাল

বিক্রয় যখন বাকীতে করা হয় তখন তা হয় বাইয়ে মুয়াজ্জাল। বাইয়ে মুয়াজ্জাল চুক্তি অনুসারে মক্কেল ব্যাংকের নিকট থেকে বাকীতে মাল ক্রয় করে থাকে। ব্যাংক মক্কেলের হয়ে পণ্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করে এবং বাকীতে সেগুলো মক্কেলের নিকট বিক্রয় করে। ব্যাংক ও মক্কেল উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। চুক্তি অনুসারে মক্কেল কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্ধারিত তারিখে একত্রে অথবা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে ব্যাংক গ্রাহককে মাল সরবরাহ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মক্কেলকে পণ্যের ক্রয়মল্য ও মুনাফা পৃথকভাবে

জানাতে বাধ্য নয়; অন্যকথায় কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করলেই চলে।

বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতির শর্তসমূহ

১. মক্কেলের কাছে বিক্রির পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মালামাল ব্যাংকের মালিকানা ও দখলে থাকতে হবে। কারণ শরীয়তের বিধান অনুসারে যা নিজের মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যায়না।

২. মাল ক্রয়ের পর থেকে মক্কেলের (ক্রেতা) কাছে হস্তান্তর করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মালের হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া, নষ্ট হওয়া ইত্যাদি যে কোন ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব ব্যাংককেই (বিক্রেতা) বহন করতে হবে। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঝুঁকি বহন না করে মুনাফা করা বৈধ নয়।

৩. ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল ক্রয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের দায়িত্ব ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির। তবে সে প্রতিনিধি কোনক্রমেই ফরমায়েশ দানক্রীত ক্রেতা হবেনা। মালের পরিবহন এবং বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ব্যাংকের।

৪. অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো, মক্কেলের ফরমায়েশ অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত মাল মক্কেলের (ক্রেতা) কাছে হস্তান্তর পর্যন্ত মাল নেয়া বা না নেয়ার ব্যাপারে ক্রমাগত এখতিয়ার দেয়া উচিৎ। আবার আধুনিক কোন কোন বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল- মতামত নেয়া বা না নেয়ার ব্যাপারে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেয়া উচিৎ। আবার আধুনিক কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এরূপ এখতিয়ার দেয়া জরূরি নয়। তবে ক্রেতাকে যদি এ এখতিয়ার দেয়া যায় তবে বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতি হালাল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন দ্বিমত থাকেনা।

৫. বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে একবার পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করা যায়না। ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ক্রেতা বিলম্ব করলে অতিরিক্ত সময়ের লাভের হার বা দাম বৃদ্ধি করা যাবেনা।

৬. মক্কেলের কাছে পণ্য বিক্রয়ের পূর্বেই ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার হার ঘোষনা করতে হবে। মক্কেল ব্যাংক ঘোষিত মুনাফার ভিত্তিতে ক্রয়ে সম্মত হলেই তবে উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে।

বাইয়ে সালাম

বাইয়ে সালাম আগাম ক্রয়ের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ইসলামি ব্যাংক কোন পণ্য ক্রয় করার শর্তে দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে ক্রয় চুক্তিকৃত পণ্যের দাম অগ্রিম পরিশোধ করে থাকে এবং বিক্রেতা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে বা সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে মাল ডেলিভারী দেয় । সাধারণতঃ কৃষি ও কুটির শিল্পের জন্য এ পদ্ধতি বেশী উপযোগী।

বাইয়ে সালামের বৈশিষ্ট্য

(১) এটি একটি বিক্রয় চুক্তি যার অধীণে ইসলামি ব্যাংক ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহের শর্তে ক্রয়চুক্তিকৃত পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করে।

(২) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংক পণ্য সংগ্রহ করে থাকে।

(৩) সময়, মূল্য, ডেলিভারী পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাংক ও মক্কেল উভয়েরই আগে থেকে জানা থাকে।

ইজারা

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক স্থানান্তর যোগ্য সম্পত্তি ক্রয় করে এবং তা মক্কেলের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া পদ্ধতিতে লীজ দেয়। ইজারার সময় শেষে ব্যাংক সম্পত্তি ফেরৎ পায়।

ইজারা ও মালিকানা

এ বিশেষ ধরণের ইজারার মাধ্যমে ইজারা গ্রহীতা ক্রমান্বয়ে ইজারাকৃত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। অর্থাৎ ইজারাগ্রহীতা একইসাথে ভাড়া ও ক্রয়মূল্যের কিস্তি পরিশোধ করে। যে পরিমাণ ক্রয়মূল্য পরিশোধ হয় ইজারাগ্রহীতা এ পরিমাণ ঐ সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। আবার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে ইজারাগ্রহীতার মালিকানা যত বৃদ্ধি পায় ভাড়ার পরিমাণ ও সে অনুপাতে হ্রাস পায়। এ পদ্ধতিগুগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে কম। তবে যে কথাটি অবশ্যই বলা প্রয়োজন তা হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর সব কয়টিতেই মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত (profit predetermined)। অর্থাৎ ব্যাংক লেনদেনের শুরূতেই মুনাফা নির্ধারণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিৎ করতে চায়। লোকসানের কোন দায় ইসলামি ব্যংক বহন করেনা। বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতিদ্বয় বাস্তব ফলাফলের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি হলেও একটি বড় পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। অর্থাৎ বাইয়ে মুরাবাহা এর অনুবাদ 'লাভে বিক্রয়' করা হলেও বাইয়ে মুয়াজ্জালও অবশ্যই লাভেই বিক্রয় করা হয়ে থাকে। বাইয়ে

মুরাবাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচেছ লাভে বিক্রয়। পক্ষান্তরে বাইয়ে মুয়াজ্জাল এর মূল কথা হচেছ বাকীতে বিক্রয়, লাভ অথবা ক্ষতি এখানে মুখ্য বিবেচ্য নয়। এ দুয়ের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য বাইয়ে মুয়াজ্জাল ক্রয় মুল্যের সাথে মূনাফা আলাদাভাবে ক্রেতাকে জানানোর দরকার হয়না। কিন্তু বাইয়ে মুরাবাহাতে ক্রয়-মূল্য জানাতে হয়। বাইতে মুয়াজ্জাল ও বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় অতি সহজ এবং ব্যাংকের দিক থেকে এতে ঝুঁকিও কম। তবে এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার করা হলে এর মাধ্যমে ব্যাংকের লেনদেনে সুদ ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যাংক বাস্তবে মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ঝামেলায় না গিয়ে কেবল কাগজে-কলমে ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে নির্ধারিত মুনাফা মার্জিনের ছদ্মাবরনে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা দান করতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে সুদী লেনদেনে পর্যবসিত হবে। এছাড়া ক্রেতার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশঙ্কাও এপদ্ধতিতে রয়েছে যা যুলমেরই নামান্তর। এসব দিক বিবেচনা করেই বিশেষজ্ঞগণ বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতির সীমিত ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রধানত-

ক. দুই প্রকার
খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার।

২. বাইয়ে মুশারাকার শর্ত ক'টি?

ক. পাঁচটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. দু'টি।

৩. বাইয়ে মুদারাবা পদ্ধতির শর্ত ক'টি?

ক. ছয়টি
খ. চারটি
গ. পাঁচটি
ঘ. তিনটি।

৪. বাইয়ে সালাম হচেছ-

ক. বাকীতে বিক্রয়
খ. লাভে বিক্রয়
গ. আগাম ক্রম পদ্ধতি
ঘ. নগদ ক্রয় পদ্ধতি।

৫. বাইয়ে মুয়াজ্জাল হচেছ-

ক. বাকীতে বিক্রয়
গ. নগদ বিক্রয়
গ. আগাম ক্রয়
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে প্রধানত বিনিয়োগ পদ্ধতি কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দিন।
২. মুশারাকা পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? মুশারাকা পদ্ধতির শর্তসমূহ লিখুন।
৩. মুদারাবা পদ্ধতি কী? মুদারাবা পদ্ধতির শর্তসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. বাইয়ে মুরাবাহা ও বাইয়ে মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ধারণা দিন।
৫. বাইয়ে মুয়াজ্জাল ও বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতির শর্তসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. বাইয়ে সালাম বলতে কী বুঝায়? বাইয়ে সালামের শর্তাবলী উল্লেখ করুন।
৭. ইজারা ও মালিকানা বলতে কী বুঝায়? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ১১

ইসলামি বীমাব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামি বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলামি বীমা শরীয়তসম্মত-তা আলোচনা করতে পারবেন।
- ইসলামি বীমা মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে পরিচালিত তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইসলামি বীমার অগ্রগতি তুলে ধরতে পারবেন।

ইসলামি অর্থনীতির ন্যায় ইসলামি বীমা ব্যবস্থাও সমাজে দীর্ঘকাল যাবত কার্যকারিতা-বিহীন অবস্থায় ছিল। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ইসলামি বীমার বিলুপ্ত কাঠামোকে পুনর্জীবিত করে দেয়। এটা গতানুগতিক বীমা ব্যবস্থার ইসলামিকরণ নয়, বরং ইসলামি বীমার স্বকীয়তার আধুনিক রূপায়ণ বলা যেতে পারে। গতানুগতিক অর্থনীতিতে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ব্যাপক হলেও ইসলামি বীমা সেই গতানুগতিক বীমার ইসলামিকিকরণ মনে করা ঠিক নয়। বস্তুত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের পূর্ব থেকেই ইসলামি বীমা পলিসি ও ব্যবস্থার সংযুক্তি ঘটেছে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান 'আল আকিলা' নামক প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলন থেকে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা অনুমোদন করেছিলেন হুধাইল গোত্রের দুই মহিলার মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির রায় দানের মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লিখিত রায়ের বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যায় ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুধাইল গোত্রের দুই মহিলা ঝগড়া করার সময় একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে আক্রান্ত মহিলা এবং তার গর্ভস্থ সন্তান নিহত হয়। এবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করা হলে তিনি তাঁর রায়ে বলেন, গর্ভস্থ শিশুর দিয়ত (রক্তমূল্য) হবে শক্তি-সামর্থ্যবান একজন ক্রীতদাস বা দাসী। তাঁর রায়ে তিনি আরও বলেন, ঘাতকের পক্ষ থেকে তার পৈত্রিক আত্মীয়-স্বজনরা এ দিয়ত পরিশোধ করবে এবং নিহতের পুত্র ও অন্যান্য ওয়ারিশরা এটা পাবে।

'আল-আকিলা' বিষয়ক এ মতবাদ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-ও অনুমোদন করেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি তা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এ ঐতিহ্যের আলোকে গৃহীত বীমা ব্যবস্থার যৌক্তিক ও আইনগত ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে।

ইসলামি বীমা (তাকাফুল) পলিসি কোন প্রস্তাব প্রদান ও তা গ্রহণ করার মাধ্যমে পক্ষগুলোকে একটি সমঝোতায় নিয়ে আসে। উভয়পক্ষ কৃত চুক্তিমালার নীতির উপর আস্থা স্থাপন করে থাকে। কোন বীমা পলিসির মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে চুক্তির পক্ষসমূহ, পক্ষসমূহের আইনগত সামর্থ্য, প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ, বিষয়বস্তুর বিবেচনা, বীমাগত স্বার্থ- যা যেকোন চুক্তির বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর চুক্তি হলো প্রস্তাব প্রদান ও তা গ্রহণের একটি প্রতিশ্রুতি এবং যা বাস্তবায়ন করতে হবে। আল-কুরআন ঘোষণা করছে, "হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের চুক্তিসমূহ পূরণ কর।" (৫ঃ১)

আইনগত সামর্থ্যের মধ্যে বীমা চুক্তির পক্ষগুলোর বয়স অন্তর্ভুক্ত। সে বয়স ১৮ বছর বা তার চেয়ে অধিক। 'দ্যা তাকাফুল এক্ট (মালয়েশিয়া) ১৯৮৪ অনুযায়ী আঠারো বছর বয়সের নীচে কোন ব্যক্তি তাকাফুল (ইসলামি বীমা) চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য হবে না। বীমা পলিসিতে প্রয়োজনীয় বয়স এবং যেকোন সাধারণ চুক্তির বয়স একই সমান। তা ছাড়া সাধারণ চুক্তির প্রাসংগিক নীতিমালাসমূহ বীমা চুক্তি সম্পাদনেও মৌলিকভাবে প্রয়োজ্য।

বীমা পলিসি মৃত্যু, দুর্ঘটনা, বিপর্যয় এবং মানুষের জীবন, ব্যবসা বা সম্পত্তির অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। বীমাকারক (বীমা কোম্পানী) বীমা পলিসির মাধ্যমে সম্মত (চুক্তিবদ্ধ) বিষয়ে ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

বীমা পলিসির অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা প্রধানত চুক্তির ও শাস্তির আইন থেকে উদ্ভূত। যেমন কোন মটর বাইক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমাকারক (বীমা কোম্পানী) দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দিতে

বাধ্য ও দায়বদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে বীমাকারক উক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বীমাকারক ও বীমা গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলীর আওতায় বাধ্য থাকে।

বীমা পলিসি কার্যকর করার জন্য বীমাচুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। তাই, প্রাসংগিক তথ্য অব্যক্ত করা, প্রতারণামূলক তৎপরতায় জড়িত থাকা, অসত্য বিবরণ বা ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির কারণে কোন বীমা পলিসি বাতিল হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধন-সম্পদ সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়া অন্যায়ভাবে খেয়োনা।" (৪ঃ২৯)

জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে বীমা গ্রাহকের নিয়োগকৃত নমিনি পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করতে পারে না। ১৯৭৪ সালের মালয়েশিয়ার বীমা আইনে The National Council for Muslim Religious Affairs-এর উত্তরাধিকার ও উইল বিষয়ক ফতোয়া এবং ১৯৭০ সালের করাচি হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উভয় সিদ্ধান্তেই বলা হয়েছে, জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে নমিনি কেবল একজন ট্রাস্টি যিনি পলিসির বেনিফিটসমূহ গ্রহণ করে তা উত্তরাধীকার আইন ও ওয়াসিয়্যাতের নীতিমালার আলোকে মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।

বীমা পলিসির মোকাবিলায় বস্তুগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। শরীয়তের বিধিবিধানের আলোকে বীমা পলিসি পলিচালনা আসলে আল-মুদারাবা পদ্ধতির নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, যা মূলত সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থার বিকল্প। এমতাবস্থায়, একটি যৌথ উদ্যোগে একদিকে এক ব্যক্তি মূলধনের যোগান দেয়, অন্যদিকে আরেক ব্যক্তি নিজের ব্যবসায়িক দক্ষতার প্রয়োগ করে এবং পারস্পরিক সমাঝোতার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ লাভের অংশ পায়। তেমনি, বীমা পলিসি লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই একমত হয় যে বীমা গ্রহীতা নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে যাবে আর বীমাকারক সংগৃহীত প্রিমিয়ামসমূহ বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে, যাতে করে বীমাকারক ও বীমা গ্রহীতা উভয়ই চুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশ বণ্টন করে নেবে। একই সাথে বীমাকারক এ প্রতিশ্রুতিও দেবে যে বীমা গ্রাহক ভবিষ্যতে কোন অপ্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুখীন হলে বীমাকারক তাকে চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেবে। এভাবে বীমা পলিসির ক্ষেত্রে আল-মুদারাবা অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

তাছাড়া ইসলামি বীমা পলিসি আল-মুশারাফা নীতিমালার ভিত্তিতেও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বীমাকারক ও বীমা গ্রাহক উভয়ই কোম্পানী পরিচালিত পলিসির অংশীদার হিসেবে কাজ করে থাকে।

আধুনিক বিশ্বে সাধারণ বীমা ব্যবস্থার পাশাপাশি শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা কোম্পানী অনেক দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরান, সুদান, সৌদী আরব, কাতার, বাহরাইন বাংলাদেশসহ আরও অনেক দেশে। বীমা পলিসির অনুশীলনের মাধ্যমে চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটতে পারে। অপ্রত্যাশিত কোন ক্ষতি, লোকসান বা দুর্বিপাকে পতিত ব্যক্তিদের কল্যাণের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা ছাড়াও বীমা পলিসি সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের কাজ করে থাকে। এতে করে যেকোন কঠিন অবস্থার শিকার না হয়েই সমাজ সদস্যদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

বীমা পলিসির অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি এর বাধ্যবাধকতার নীতিমালাসমূহ উদ্ভূত হয়ে থাকে মানবতা ও মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে। সমাজের সকল মানুষই তার নিজের, তার সম্পদ ও পরিবারবর্গের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, বিপদ ও বিপর্যয়ের সময় বস্তুগত নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার অধিকার পাওয়ার আশা করে থাকে। ইয়াতীম, অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও শিশুদের বিপর্যয়ের হাত থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি মানব স্বভাব ও মানবাধিকারের আওতাভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নবর্ণিত হাদীসের আলোকে এ ধরনের বাধ্যবাধকতা ও অধিকারের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেছেন, "তোমার সন্তানদের অন্যদের মুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সম্পদশালী হিসেবে রেখে যাওয়া অনেক ভাল।"

রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নলিখিত হাদীসের মাধ্যমে বিধবা এবং দরিদ্র পীড়িতদের বস্তুগত নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ

আবূ সাফওয়ান ইবন সালিম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস- রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদের দেখাশুনা করে, তাদের কাজ করে দেয়, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর বা যে দিনে রোযা রাখে রাতে ইবাদত করে তার মত।"

মানবিক আইনের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, লোকসান বা অন্য কোন ধরনের ঝুঁকি বা কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। একটি বীমা পলিসি ঠিক অনুরূপ কোন অপ্রত্যাশিত বস্তুগত ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত সমস্যা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মহানবী (স)-এর নিম্নবর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে এর যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের জাগতিক কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তাআলা হাশরের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করে দেয়, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব মোচন করে দেবেন।"

বিশ্বে বীমা ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ সত্ত্বেও ইসলামি চিন্তাবিদগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট এগিয়ে আসতে পারেন নি। এ প্রসংগে একথাটি পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, ইসলামি বীমা পলিসির মডেলটি প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা থেকে ভিন্নরূপ। এ মডেলটি শরীয়াহ ভিত্তিক মীরাস ও ওয়াসিয়্যাত নীতিমালার আলোকে প্রণীত। কোন বীমা ব্যবস্থায় যদি রিবা বা সুদের কোন উপাদান থাকে তবে তা বৈধ বা জায়েয হবে না। তাই বীমা ব্যবস্থাকে বৈধ এবং বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য বীমা পলিসি অবশ্যই আল-মুদারাবাহ' অর্থনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত কোন ক্ষতি বা লোকসান থেকে বীমাগ্রাহককে নিরাপত্তা দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামি বীমা ব্যবস্থা সংহতি, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বীমা ব্যবস্থা পরিচালিত করে থাকে। বীমা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে বস্তুগত লাভের সুযোগ দেয় না বরং কোন বিষয়ে বীমাগ্রাহকের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি বা লোকসান থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে মাত্র- যা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার মূনীতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামি বীমার অগ্রগতি

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়ায় তাকাফুল (ইসলামি বীমা) বিষয়ে নয়টি রাষ্ট্রের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রগুলো হলো বাংলাদেশ, মিশর, জর্দান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, পাকিস্তান ও কুয়েত।

সেমিনারে মুসলিম দেশসমূহে তাকাফুল বানিজ্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে এবং ধারণাগত ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। সেমিনারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশদভাবে পঠিত ও আলোচিত হয় ঃ

1. Development and Success of Takaful Business World Wide.
2. The Philosophy of Islamic Insurance : Shariah Conecpt and Principles.
3. Relationship between Participants and Shareholdres.
4. Challenges and Prospects of Takaful Business.
5. Strategies in Lanching Takaful Business.
6. Introduction to General Takaful Business : Operational Framework of General Takaful Business.
7. Introduction to Family Takaful Business : Operational Framework of Family Takaful Business.
8. Role of Bank Negara Malaysia : Legislation an Supervision.
9. Takaful Accounting System –Accounting System in Accordance with Sharia and the Requirements of Takaful Act. 1984
10. Investment of Takaful Fund.

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে উক্ত সেমিনারের উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশেও বেশ কিছু ইসলামি বীমা কোম্পানী গড়ে উঠে।

১১. বাংলাদেশে ইসলামের আলোকে অনেকগুলো বীমা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে
খ. ব্যাংকিং নীতিমালার ভিত্তিতে
গ. সাধারণ বীমা ব্যবস্থার ভিত্তিতে
ঘ. সুদ ভিত্তিক নীতিমালার ভিত্তিতে।

২. কত বছরের বয়সে তাকাফুল চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাবে?
ক. ২০ বছরের নিচে নয়
খ. ১৮ বছর বয়সে
গ. ১৮ বছরের কম হলেও চলবে
ঘ. ২৫ বছরের উর্ধ্বে

৩. নমিনি বীমা পলিসির সকল সুবিধা ভোগ করতে পারবে কী?
ক. পারবে
খ. আংশিক পারবে
গ. মিরাসী ও ওয়াসিয়াতের নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন করবে মাত্র
ঘ. সকল উত্তরই ভুল।

৪. ইসলামি বীমা পরিচালিত হয়ে থাকে-
ক. মুশারাকা পদ্ধতিতে
খ. মুদারাবা পদ্ধতিতে
গ. বাইয়ে সালাম পদ্ধতিতে
ঘ. ১নং এবং ২ নং উত্তর সঠিক।

৫. ইসলামি বীমার আন্তর্জাতিক সেমিনার কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক. সৌদী আরবে
খ. সিঙ্গাপুরে
গ. কুয়ালালামপুরে
ঘ. বাংলাদেশে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি বীমাব্যবস্থা ইসলামি নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত- প্রমাণ দিন।
২. ইসলামি বীমাব্যবস্থা আল-মুশারাকা ও আল-মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণ করে- ব্যাখ্যা করুন।
৩. মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি বীমা ব্যবস্থার প্রচলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামি বীমা কি শরীয়ত সম্মতভাবে পলিসি গ্রহণ করে? আপনার মতামত যুক্তি প্রমাণসহকারে উপস্থাপন করুন।

ইউনিট ৭

সুদ

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। কেননা সুদ হচেছ শোষণের হাতিয়ার। সুদ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদী লেনদেনের মাধ্যমে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরীব অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। সুদের মধ্যে মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কুফল বিদ্যমান রয়েছে। একজন মুসলমান কখনো সুদের আদান-প্রদান করতে পারে না। এমনকি সুদী লেনদেনের লিখকও সাক্ষী হতে পারে না। সুদখোরদের ব্যপারে আল-কুরআন কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে তাদের খারাপ পারিণতি এবং কিয়ামাতে তাদের বেদনাদায়ক শাস্তির বিষয় উল্লেখ করেছে। এমনকি সুদখোরদের বিরূদ্ধে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদ সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মেও নিষেধ বাণী রয়েছে। এমনকি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল পর্যন্ত সুদকে কৃত্রিম জালিয়াতি ব্যবসা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ সাধারণতঃ দুই প্রকার যথা- মেয়াদী সুদ বা রিবা আন-নাসিয়া এবং পণ্যের সুদ বা রিবা আল-ফাদল। ইসলাম দুই ধরনের সুদকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ইসলামি খিলাফত যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। রিবা এবং ব্যবসা এক জিনিষ নয়। ব্যবসায়ের মুনাফা ববং সুদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আলোচ্য ইউনিটে সুদ বা রিবা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটকে ৫টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ পাঠ-১ : সুদের পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ।
- ❖ পাঠ-২ : সুদযোগ্য পণ্য ও সুদের শর্তাবলী।
- ❖ পাঠ-৩ : সুদ ও মুনাফার পার্থক্য।
- ❖ পাঠ-৪ : সুদের কুফল।
- ❖ পাঠ-৫ : ইসলামে ঋণ দেওয়ার বিধান।

পাঠ ঃ ১

সূদের পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সুদের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিচয় দিতে পারবেন
- সুদের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।

সুদের সংজ্ঞা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিপরীতে পূর্বনির্ধারিত হারে যে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয় এবং একই শ্রেণীভূক্ত মালের পারস্পরিক লেনদেন কালে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করা হয় তাকে 'সুদ' বলে।

পবিত্র কুরআনে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি 'রিবা' শব্দের অর্থ হচেছ বেশী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, বিকাশ ঘটা ইত্যাদি। ইসলামে 'রিবা' অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার বৃদ্ধিকে ইসলামে 'রিবা' বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যেও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যা 'মুনাফা' নামে আখ্যায়িত। মূলধনের এ বৃদ্ধি অর্থাৎ 'মুনাফা' সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং তা হারামও নয় বরং সম্পূর্ণ হালাল। ইসলামে একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা প্রদত্ত মূলধনের উপর চুক্তি মোতাবেক আদায় করা হয়।

পবিত্র কোরআনের মোট সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও অধিক হাদীসের মাধ্যমে রিবার অবৈধতা, কূফল এবং দাতা, সাক্ষী ও লেখকের খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের আলোকে সুদের সংজ্ঞা

পবিত্র কুরআনে সুদের সংজ্ঞা দেয়া না হলেও হাদীসে এর সংজ্ঞা এবং বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে ফিকহবিদগণ রিবাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে রিবা বা সুদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

كل قرض جر نفعا فهوربا

"যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা (সুদ)।"

২. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

فهوزيادة احدالبدلين المتجالسين من غير ان يقابل هذة الزياة عوض.

একই জাতীয় কোন পণ্য সামগ্রীর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত সম্পদগ্রহণ করা হয়, সে অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় 'সুদ'। যেমন কেউ এক কেজি চাল দিয়ে দেড় কেজি চাল নিল। এখানে অতিরিক্ত আধা কেজি চালের কোন বিনিময় দেয়া হয়নি। ইসলামি শরীয়াতে এ অতিরিক্ত আধাকেজি চাল গ্রহণ করাকে সুদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মুজামু লুগাতিল কুফাহা গ্রন্থে আছে-

كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع.

"শরীয়াত সম্মত বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্তানুযায়ী যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয় তাকে 'সুদ' বলে।

৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) তাঁর কাওয়াইদুল ফিকহ গ্রন্থে লিখেছেন-"চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরীয়াত সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে 'সুদ' বলা হয়।

৫. আহকামুল কুরআন গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) লিখেছেন-

الربا في اللغة الزيادة والمراد في الاية كل زيادة لايقابلهاعوض.

রিবার আভিধানিক অর্থ হচেছ বৃদ্ধি। পবিত্র কুরআনে ঐ বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।"

৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-"ইসলামি শরীয়াতে 'সুদ' ঐ মালকে বলা হয়েছে যে মালের পরিবর্তে লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়, যার কোন বিনিময় নেই।"

৭. প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবু ইসহাক আল যাজ্জাজ-এর মতে-

كل قرض يوخذ اكثرمنه فهوربا.

"যে ঋণের দরূন আসলের অতিরিক্ত নেয়া হয় তা সুদ"।

৮. ইমাম আবু বকর আল জাসসাস এর মতে,-"একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদেয় ঋণে মেয়াদোত্তীর্ণের পর পূর্ব শর্ত অনুযায়ী আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয় তা হচেছ সুদ।" (তাজুল আরূসঃ রিবা দ্রঃ)

এমনিভাবে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীগণ বিশ্বনবী (স.)-এর হাদীসের ভিত্তিতে সুদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে পৃথিবীর মানুষের সামনে পেশ করে গিয়েছেন। মোটকথা সর্বপ্রকার সুদ ইসলামে অবৈধ। সেটা জাহেলী যুগে প্রচলন থাকুক বা না থাকুক।

সুদের শ্রেণী বিভাগ

সুদ সাধারণত দুই প্রকার, যথা-রিবা আল-নাসিয়া এবং রিবা আল-ফাদল। রিবা আল-নাসিয়া রিবা আরবী শব্দ যার অর্থ বৃদ্ধি। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অর্থ বা পণ্য ঋণ হিসাবে প্রদানের বিনিময়ে ঋণগহীতার নিকট থেকে সময়ের ভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত হারে ঋণ বাবদ বা পণ্যের অতিরিক্ত যে অর্থ বা পণ্য আদায় করা হয় তাকে বলা হয় রিবা আল-নাসিয়া'। যেমন, রহিম করিমকে ১০% হার সুদে এক বছরের জন্য ১,০০,০০০ টাকা ধার দিল। এক বছর পর করিমের কাছে রহিমের পাওনা হবে সুদাসল ১,১০,০০০ টাকা। একইভাবে যদি 'ক' 'খ'কে ধার হিসাবে দশ মণ ধান দেয় এই শর্তে যে, ৬ মাস পর "ক" ১০ মণ আসলের সাথে ১মণ অতিরিক্তসহ মোট ১১ মণ ধান পরিশোধ করবে তবে এই লেনদেনটি ও রিবা আল-নাসিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে রিবা আল ফাদল হচেছ, সমজাতীয় পণ্যের তারতম্যপূর্ণ তাৎক্ষণিক (on the spot) লেনদেন। যেমন, 'ক' যদি তার ২ কেজি সরূ চালের বিণিময়ে 'খ' এর নিকট থেকে চার কেজি মোটা চাল গ্রহণ করে তবে তা রিবা আল-ফাদল হিসাবে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি ভিন্ন জাতীয় দুটি দ্রব্যের লেনদেনের পরিমানের তারতম্য করে তবে তা রিবা আল-ফাদল হবে না। যেমন 'ক' এক কেজি চালের বিনিময়ে 'খ'-এর নিকট থেকে দুই কেজি আলু গ্রহণ করলো। এরূপ লেনদেন বৈধ।

রিবা আল-নাসিয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনের সূরাহ আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে সুদকে শয়তানী উন্মাদনা বলে উল্যেখ করে বলা হয়েছে- "ঐ ব্যক্তিরা যারা সুদ গ্রহণ করে, দাঁড়াতে পারবেনা, ঐরূপ ব্যতীত যেমন দাঁড়ায় একজন, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে উন্মাদনার দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা বলে; বাণিজ্য সুদের মত। কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুণরায় সুদ খায় তারাই দোজখে যাবে; তারা সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে।" পক্ষান্তরে, রিবা আল-ফাদল তথা সমজাতীয় পণ্যের তারতম্যপূর্ণ লেনদেনের ফলে সৃষ্ট সুদ আল্ লাহর রাসূল (স) কর্তৃক নিষিদ্ধ।

সরল সুদ বনাম চক্রবৃদ্ধি সুদঃ রহিম ১২% সুদে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র কিনলো। ৫ বছর পর সে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাবে। এটি হচেছ সরল সুদের উদাহরণ। অন্যদিকে রহিম কোন সুদী বানিজ্যিক ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা ১০% সুদে ৫ বছরের জন্য ধার নিল। প্রথম বছর শেষে ১ লক্ষ টাকা আসলের সাথে ১০ হাজার টাকা সুদ যুক্ত হয়ে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরের আসল হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে ১,১০,০০০ টাকার সাথে ১০% হারে ১১,০০০ টাকা সুদ যুক্ত হয়ে সুদাসলে ১,২১,০০০ টাকা তৃতীয় বছরের জন্য আসল হিসাবে বিবেচিত হবে। এভাবে প্রতিটি হিসেব শেষে সুদ পূণঃবিনিয়োগের ধারণার ভিত্তিতে ক্রমাগত আসলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তার উপর পরবর্তী সুদ নির্ণয় প্রক্রিয়ার নাম চক্রবৃদ্ধি সুদ।

পবিত্র কুরআনে সাধারণভাবে সুদ হারাম করার পাশাপাশি বিশেষভাবে চক্রবৃদিধ সুদ হারাম করা হয়েছে। সুরাহ

আল-ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা দ্বিগুন চতুর্গুন হারে সুদ খেওনা। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে, পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ করার ফলে কিছু কিছু লোকের মাঝে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সরল সুদ হয়তো অতটা খারাপ নয় এবং সরল সুদের লেনদেন করা যেতে পারে। এ ধারণা একবারেই ভুল। কারণ, বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রথম দিকে আল্লাহ পাক চক্রবৃদ্ধি সুদের নিষেধাজ্ঞার কথা উল্ল্যেখ করলেও কুরআনের অন্য সাধারণভাবে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষ করে কুরআনের যে আয়াতে সুদের বিরূদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেখানে সাধারণভাবে (unqualified) সুদের উল্যেখ করা হয়েছে।

ভোগ্য ঋণের সুদ বনাম বিনিয়োগ ঋণের সুদ

কেউ যখন তার জীবন ধারনের প্রয়োজনে ঋণ গহণ করে তখন তাকে বলা হয় ভোগ্য ঋণ (consumption credit)| যেমন ফ্রিজ বা গৃহস্থালীর আসবাবপ এ ক্রয়ের জন্য ঋণ। পক্ষান্তরে, কেউ যখন উৎপাদন কিংবা ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় বিনিয়োগ ঋণ (investment credit)। তথাকথিত উদারপন্থী কিছু মুসলিমের ধারণা, ভোগ্য ঋণের বেলায় সুদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ হলেও বিনিয়োগ ঋণের বেলায় সুদ সম্ভবতঃ অতটা নিষিদ্ধ নয়। তাদের এ ধারণার পিছনে যুক্তি হলো, প্রথমতঃ বাণিজ্যিক ঋণগ্রহীতা গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে যেহেতু ব্যবসা করছেন লাভের উদ্দ্যেশ্যে, সুতরাং তার উপার্জিত লাভ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়াতে আপত্তির কি থাকতে পারে? তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হচেছ এই যে, রাসুল (স) এর যুগে মূলতঃ ভোগের উদ্দ্যেশ্যেই ঋণ দেয়া নেয়া হতো। এমতাবস্থায়, আধুনিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য গৃহীত ঋণের জন্য সুদ গ্রহণ ও প্রদান অবৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়িক সুদের বৈধতার প্রবক্তাদের প্রথম যুক্তি ধোপে টেকে না এজন্য যে, ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনার পাশাপাশি লোকসানের ও ঝুঁকি থাকে। সুতরাং লোকসানের ঝুঁকি পুরোটাই উদ্যোক্তার মাথায় চাপিয়ে মূলধনের যোগানদাতা নিশ্চিত লাভের নৌকায় পা রাখবেন এটা মোটেই মেনে নেয়া যায় না। তাদের দ্বিতীয় যুক্তিও অকার্যকর কারণ- রাসূল (স) এর যুগে যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেও সুদে ঋণ আদান-প্রদান হতো তা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত

কোমল সুদ বনাম কঠোর সুদঃ কেউ কেউ আবার সুদকে কোমল ও কঠিন এ দু'ভাগে বিভক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সুদের হার অপেক্ষাকৃত স্বল্প ও শর্তাবলী নরম বা সহজ হলে তাকে কোমল সুদ এবং এর উল্টো হলে তাকে কঠোর সুদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। সে সাথে যুক্তি দেখানো হয় যে, কঠোর সুদ হারাম হলেও কোমল সুদ হারাম না হওয়াই উচিৎ। এ ধারণা ভ্রান্ত, কারণ ইসলামি উসুলের একটি বড় বিধান হলো এই যে, যে জিনিসের বেশী হারাম তার অল্প ও হারাম । যেমন, মদ খাওয়া, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। অল্প মদ বা আংশিক মিথ্যা যেমন বৈধতা পেতে পারে না, তেমনি অল্প বা হালকা সুদও বৈধতা পাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. রিবা শব্দের অর্থ হচ্ছে-

ক. বেশী হওয়া
খ. বৃদ্ধি পাওয়া
গ. মূল থেকে বৃদ্ধি পাওয়া
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

২. পবিত্র কুরআনে ক'টি আয়াতে সুদের কথা উল্লেখ আছে?

ক. সাতটি
খ. বারটি
গ. আটটি
ঘ. পাঁচটি।

৩. মুফতী আমিমুল ইহসানের গ্রন্থের নাম-

ক. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা
খ. কাওয়াইদুল ফিকহ
গ. কিতাবুল ফিকহ
ঘ. আহকামুল কুরআন।

৪. রিবা আল-নাসিয়া হারাম হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়-

ক. আল-কুরআন থেকে
খ. আল-হাদীস থেকে
গ. ইজমায়ে-উম্মত থেকে
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদ কী? বুঝিয়ে লিখুন।
২. ফিকহবিদগণের দৃষ্টিতে সুদের তিনটি সংজ্ঞা লিখুন।
৩. রিবা আল-নাসিয়া ও রিবা আল ফাদল কী?
৩. সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. ভোগ্য ঋণের সুদ বনাম বিনিয়োগ ঋণের সুদ সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করুন।
৬. কোমল সুদ এবং কঠোর সুদ বলতে কী বুঝায়? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১.সুদের সংজ্ঞা লিখুন এবং সুদের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সুদযোগ্য পণ্য ও সুদের শর্তাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সমজাতীয় পণ্যের অসম বিনিময়ের বিধান বলতে পারবেন
- সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে কীভাবে সুদ হয় আর কিভাবে সুদ হয় না তা বলতে পারবেন।

একই জাতীয় পণ্য ও খাদ্যশস্যের পারস্পরিক ক্রয় বিক্রয়কালে একপক্ষ অপর পক্ষকে বর্ধিত অংশ প্রদান করে। এ বর্ধিত অংশ প্রদান সুদ হিসেবে গণ্য হয়। হাদীস শরীফে একই জাতীয় কোন জিনিসের মধ্যে অসম বিনিময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর নগদ আদান প্রদানে অসম বিনিময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে নিম্নের হাদীসটির মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই।

বিশ্ব নবী (স) বলেছেন-

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرو الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أواستزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء-

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। সুদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান অপরাধী। (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীসে ছয় প্রকার দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছয় প্রকার দ্রব্য থেকে প্রত্যেক প্রজাতির দ্রব্যের পরস্পর লেনদেনের সময় কম বেশী করা হলে কিংবা নগদ না হলে কিংবা কম বেশী করে বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ক্রয় বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু এক প্রজাতির দ্রব্যের সাথে অন্য প্রজাতির দ্রব্যের কম বেশী করে লেনদেন করা হলে তা সুদ হবে না। যেমন- এক মণ খেজুরের সাথে দুই মণ গম কিংবা এক মণ চালের সাথে দুই মণ গমের বিনিময় করা হলে সুদ হবে না। উল্লেখ্য যে, সুদ (রিবা) হারাম হবার বিধান উপরোক্ত ছয় প্রকার দ্রব্যের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। ইমাম আবু হানিফা (রা) এর মতে ওজন বা পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, এরূপ একই শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের নিম্নলিখিত দু'টি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে সে সকল দ্রব্যের পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশী করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১. দ্রব্য দু'টি একই প্রজাতির হলে।

২. ওজন বা পরিমাপের (যেমন দাড়িপাল্লা, বাটখারা, পাত্র ইত্যাদি) দ্বারা এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হলে।

হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, একদা হযরত বিলাল ৯রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণ প্রজাতির কিছু (উন্নতমানের) খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খেজুর তুমি কোথা থেকে আনলে? বিলাল (রা) উত্তরে বললেন, আমাদের খেজুর খারাপ ছিল, তাই আমি আমাদের দু' সা' পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এ সা'পরিমাণ ভাল খেজুর ক্রয় করে এনেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আহ! এটাতো সুদের মতই হলো, এতো সুদের মতোই। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি ভাল খেজুর পেতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে বিক্রয় করবে। তারপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় করে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, একই জাতীয় জিনিসের বিনিময় সমান সমান এবং নগদ হতে হবে। নিকৃষ্ট জিনিসের বদলে মেয়াদান্তে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করলে তা মেয়াদী ঋণের সুদ হিসেবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (স) কাঁচা ফলের বিনিময়ে শুষ্কফল সমপরিমাণে বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে অনির্দিষ্ট পরিমাণ স্তূপীকৃত খেজুর বিক্রয় নিষেধ করেছেন। কারণ এতে রিবার আশংকা রয়েছে। এমনিভাবে ব্যবহারোপযোগী হবার পূর্বে বৃক্ষে ফল রেখে ফলের ক্রয় বিক্রয়ও নিষেধ করেছে। কারণ উপযোগী হবার সময় পর্যন্ত যে পুষ্টি সাধিত হবে তা ক্রয় বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আলোচ্য হাদীসমূহের আলোকে একই জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে কিভাবে সুদ হয় আর কিভাবে সুদ হয় না তা উল্লেখ করা হল।

১. টাকার সাথে সোনা, সোনার সাথে রূপার, ভাতের সাথে রুটির ইত্যাদি ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ে কমবেশী করা হলে এবং তা একই মজলিসে হলে সুদ হবে না।

২. যে সব এলাকায় ওজন করে মাছ ক্রয় বিক্রয় করা হয় সে সব এলাকায় একই শ্রেণীভুক্ত মাছের পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশী করা হলে তা সুদ হবে। আর যদি ওজন করে ক্রয় বিক্রয় করার প্রচলন না থাকে বরং গণনা করে ক্রয় বিক্রয় করা হয় সে ক্ষেত্রে লেনদেনে কম বেশী করা হলে সুদ হবে না।

৩. যে সব দ্রব্য গণনা করে পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় কিংবা গজ, ফুট বা ফিতা দিয়ে পরিমাপ করা হয় যে সব একই জাতীয় দ্রব্য বা জিনিসের পারস্পরিক লেনদেনে কম বেশী করা হলে তা সুদ হবে না বরং বৈধ বলে গণ্য হবে

৪. ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে একই শ্রেণীভুক্ত জীবন্ত পশুর বিনিময়ে গোশত ক্রয় বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বৈধ হবে না। তবে পশুর শরীরে যে পরিমাণ গোশত আছে এর চেয়ে অধিক পরিমাণ গোশতের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে বৈধ হবে যাতে অতিরিক্ত গোশত পশুর চামড়ার পরিবর্তে ধরা যেতে পারে। ভিন্ন শ্রেণীর গোশত পারস্পরিক লেনদেনে কমবেশী করা হলে তা বৈধ হবে না।

৫. যে সব দ্রব্যের ওজন বা পরিমাপ করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, এরূপ একই শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়কালে পরিমাণে সমান সমান এবং নগদ আদান প্রদান করা হলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে। আর যদি পরিমাণে কমবেশী করা হয় কিংবা নগদ আদান প্রদান না হয় তাহলে সুদ হবে এবং লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। দ্রব্যের গুণ ও মানগত পার্থক্য থাকলেও পরিমাণে কমবেশী করা যাবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে সকল দ্রব্যের ওজন বা পরিমাপ করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এরূপ একই জাতীয় বা শ্রেণীভুক্ত দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয়ে সুদের ভয়াবহ গোনাহ থেকে রক্ষা পেতে হলে দু'টি শর্ত মেনে চলতে হবে। শর্ত দু'টি হচ্ছে- (১) উভয় দিকে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। কোন কমবেশী করা যাবে না। (২) বিনিময় লেনদেন, আদান প্রদান বা ক্রয় বিক্রয় একই মজলিসে হতে হবে। যেমন চাউলের সাথে চাউলের আদান প্রদান করা হলে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। এবং তা একই মজলিসে হতে হবে। এক্ষেত্রে বাকী ক্রয় বিক্রয় চলবে না। যদি বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করতে হয় তাহলে টাকা হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করতে হবে। নতুবা সুদ হবে।

যে সকল পণ্য দ্রব্য ওজন বা পরিমাপ করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এরূপ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় করা হলে ১ম শর্ত পালন করতে হবে না। কিন্তু ২য় শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। অর্থাৎ পরিমাণে কম বেশী করা যাবে। এতে সুদ হবে না। কিন্তু একই মজলিসে তা সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় সুদ হবে। যেমন চাউলের সাথে চিনির বিনিময় করা।

যে সকল দ্রব্য ওজন বা পরিমাপ করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না বরং গণনা বা সংখ্যা দ্বারা কিংবা গজ ফুট বা ফিতার দ্বারা পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এরূপ একই জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় বা ক্রয় বিক্রয়ে ১ম শর্ত পালন করতে হবে না কিন্তু ২য় শর্ত পালন করতে হবে। যেমন ৫টি কমলার সাথে ৭টি কমলার বিনিময় করা হলে সুদ হবে না। তবে একই মজলিসে সম্পন্ন হতে হবে। নতুবা সুদী কারবার বলে গণ্য হবে।

গণনা, সংখ্যা বা গাজ, ফুট কিংবা ফিতা দ্বারা পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এরূপ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের পারস্পরিক আদান প্রদানে উপরোক্ত দু'টি শর্তের কোনটিই পালন করতে হবে না। যেমন ৮টি নারিকেলের সাথে দুই গজ কাপড়ের বিনিময় করা হলে তা বৈধ হবে এবং একই মজলিসে লেনদেন সম্পন্ন করা ওয়াজিব নয়। এটা বাকীতেও করা যাবে। এতে সুদ হবে না।

কোন দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করলে কম মূল্যে এবং বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করলে বেশী মূল্যে এরূপ উল্লেখ করা সুস্পষ্টরূপে সুদী কারবার হবে। যেমন কোন একটি জিনিস নগদ ক্রয় করলে মূল্য ১০০ টাকা আর বাকীতে ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হলে মূল্য ১৩০ টাকা দিতে হবে। এরূপ বলা হলে তা সুদী কারবার বলে গণ্য হবে।

কারো নিকট যদি সুদের টাকা জমা থাকে কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে সুদের টাকা অর্জিত হয় তাহলে এ পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সুদের সমুদয় অর্থ নিঃস্ব, অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হয়। অথবা একটি তহবিল গঠন করে এ তহবিল হতে সুদের অর্থ অসহায়, নিঃস্ব এবং অভাব গ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। অথবা এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যা থেকে কেবল অভাবগ্রস্তরা উপকৃত হবে।

সুদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সকল লেনদেন সন্দেহজনক এবং যেগুলোতে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে সে সকল লেনদেন অবশ্যই পরিহার করহে হবে। আল্লাহ রাসূল (স) বহু সংখ্যক হাদীসে সুদের সন্দেহ হয় এমন সব লেনদেন ও ক্রয় বিক্রয়কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

সারকথা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুদ একটি জঘন্য ও অমানবিক প্রথা। তাই, ইসলাম সকল প্রকার সুদী লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে। তাছাড়া সন্দেহজনক বিষয়গুলোতে ও সতর্কতার সাথে দ্রব্য লেনদেন ও আদান প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। তাই একই জাতীয় পণ্য ও দ্রব্যের পারস্পরিক আদান প্রদানকালে কোন পক্ষ বাড়তি কোন কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন পরিমাণ সমানও নগত হতে হবে। নতুবা তা সুদী হিসেবে গণ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

১. কোন জিনিসের সাথে অসম বিনিময় বৈধ নয়?
ক. লবনের বিনিময়ে লবন খ. লবনের বিনিময়ে ডাল
গ. চালের বিনিময়ে যব গ. সকল উত্তর সঠিক

২. পণ্যের পারস্পরিক অসম লেনদেনে সুদ হিসেবে গণ্য হবে-
ক. পণ্যের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে খ. চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলে
গ. তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে ঘ. পণ্যটি একক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হলে

৩. ২ কেজি খারাপ খেজুর দিয়ে ১ কেজি ভাল খেজুর লেনদেন করা-
ক. সুদ হিসেবে গণ্য হবে খ. মাকরূহ হবে
গ. মুবাহ হবে ঘ. জায়েয হবে

৪. একই শ্রেণীভুক্ত জীবন্ত পশুর বিনিময়ে গোশত ক্রয় বৈধ-এ মতবাদটি কার?
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর খ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর
গ. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ-এর ঘ. ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে সুদযোগ্য পণ্য কী কী? লিখুন।
২. দুই কেজি খারাপ খেজুর দিয়ে ১ কেজি ভাল খেজুর ক্রয় করার বিদান আলোচনা করুন।
৩. একই জাতীয় জিনিসের অসম বিনিময়ে কখন সুদ হয় আর কখন সুদ হয় না লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদযোগ্য পণ্য কী কী? হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠ ঃ ৩

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি-

◆ **সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।**

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

আধুনিক বিশ্বে এমনকি আমাদের সমাজেও কেউ কেউ সুদ ও মুনাফাকে একই জিনিস মনে করে থাকে যা আইয়্যামে জাহেলিয়াতে করা হত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তারা বলে ব্যবসাতো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।" বর্তমানে কেউ কেউ সুদকে মুনাফা বলেও প্রচার করছে এবং কাগজপত্রে 'সুদ'-এর স্থলে 'মুনাফা'/ 'লাভ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে হারামকে নিজেদের মনগড়াভাবে হালাল বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'সুদের অর্থ যেমন অতিরিক্ত, বেশী, বৃদ্ধি, তদরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও তো অতিরিক্ত, বেশী বা বৃদ্ধি। কাজেই সুদ ও মুনাফা একই জিনিস।" অথচ সুদ ও মুনাফা কখনো এক জিনিস নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সুদ ও মুনাফার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ করা হলঃ

পার্থক্যের বিষয়	সুদ	মুনাফা
১. সংজ্ঞা	অর্থ বা দ্রব্য ঋণ দানের বিপরীতে সময়ের ভিত্তিতে পুর্ব নির্ধারিত হারে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত মূল অর্থ বা দ্রব্যের অতিরিক্ত যে অর্থ বা দ্রব্য গ্রহণ করা করা নির্দিষ্ট হয় তাকে সুদ বলা হয়।	উৎপাদন কিংবা ক্রয় বিক্রয়ের ফলে অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে মূলধনের অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থ বা সম্পদকে মুনাফা বলা হয়।
২. নির্ধারক উপাদান	সুদের নির্ধারক উপাদান হলো তিনটি; সময়, সুদের হার ও মূলধনের পরিমান। নির্দিষ্ট সুদের হারে ধার দেয়া কোন মূলধনের সুদ ঋণের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।	অপরপক্ষে মুনাফা হওয়া না হওয়া কিংবা কম বেশী হওয়া নির্ভর করে অনুকূল ব্যবসায়িক লেনদেন, ব্যয়, সাশ্রয় ও অনুকূল বাজার চাহিদার উপর।
৩. ভিত্তি	সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি। অন্যকথায়, সুদমুক্ত ঋণ সম্ভব কিন্তু ঋণ ব্যতিরেকে সুদের উদ্ভব সম্ভব নয়।	মুনাফার ভিত্তি হলো প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় কিংবা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা।
৪.ঝুঁকি (তহবিল মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে)	সুদের বেলায় ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ মালিক পুঁজি খোয়াবার ঝুঁকি বহন করে না।	মুনাফার বেলায় ক্ষতি হবার ঝুঁকি প্রযোজ্য। অন্য কথায় মালিক সম্পূর্ণ বা আংশিক পুঁজি খোয়াবার ঝুঁকি বহন করে।
৫.ঝুঁকি (তহবিল ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ্ থেকে)	একটি ফার্মের মূলধন কাঠামোতে সুদযুক্ত ঋণের পরিমান যত বৃদ্ধি পায় ফার্মটি তত বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হয়। নতুন বিনিয়োগকারীগণ ঋণ ভারাক্রান্ত ফার্মে বিনিয়োগ করতে নিরূৎসাহিত হয়।	৪.লাভ লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে কোন পরিমাণ বিনিয়োগ ফার্মের আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধি করে না। যত বেশীই ঝুঁকি (তহবিল মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে) PLS system does increase the risk of the firm because the actual loss is adjusted with the a/c of the fund-owner.
৬. সুবিধা প্রাপক	ঋণদাতা নিজেই কেবল সুদের সুবিধা লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ সুদের সব টাকাগুলো চলে যায় ঋণদাতার	অন্যদিকে ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থায় মুনাফা বাবদ প্রাপ্য অর্থ পুজির যোগানদাতা ও পুঁজির ব্যবহারকারী

	পকেটে।	উদ্যোক্তার মাঝে চুক্তি অনুপাতে বন্টন করা হয়।
৭. নিশ্চয়তা	সুদের হার ও সময় পূর্ব নির্ধারিত বিধায় এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কোন উপাদান নেই। ঋণদাতা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট সময় শেষে সুদ পাবেন তা আগে থেকেই জানতে পারেন।	সময় যেহেতু মুনাফা নির্ধারণের কোন নিয়ামক উপাদান নয় এবং মুনাফার হার যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত হয় না সেহেতু একজন বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগে আদৌ মুনাফা পাবেন কি না অথবা কি হারে বা কি পরিমাণ পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব হয় না।
৮. ফলাফলের গণনাসংখ্যা	একটিমাত্র ঋণচুক্তির অধীনে ঋণদাতা দীর্ঘকালব্যাপী একই পরিমাণ সুদ বারবার পেতে থাকে।	পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে অর্জিত মুনাফা একবারই পাওয়া যায় এবং বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে মুনাফা অর্জন সাপেক্ষেই পাওয়া যায় বিধায় একই ফল বারবার পাওয়ার প্রশ্ন আসে না।
৯. নির্ণয় পণালী	সুদ নির্ণয়ের ফর্মূলা নিরূপঃ সুদ = $p(t+r)$ঃ যেখানে, p= আসল r = সুদের হার t = সময়	মুনাফা নির্ণয়ের ফর্মূলা নিরূপঃ মুনাফা= বিক্রয় (পরিবর্তনশীল ব্যয় + স্থির ব্যয়)
১০.দাম স্তরের উপর প্রভাব	সুদ একটি স্থির ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয় বলে অনিবার্যভাবে দাম স্তরের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে মূল্যস্ফীতির প্রসার ঘটায়।	অপরপক্ষে মুনাফা ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয় না বলে অনিবার্যভাবে দামের বৃদ্ধি ঘটায় না, ফলে মূল্যস্ফীতির প্রসারে সরাসরি কোন প্রভাব রাখে না।
১১. ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গী	সুদ ইসলামে চুড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কোনভাবেই সুদ বৈধ হওয়ায় কোন সুযোগ নেই।	অন্যদিকে মুনাফা ইসলামে অনুমোদিত। ইসলাম অবশ্যই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনে উৎসাহিত করে এবং মুনাখোরী নিষিদ্ধ করে।
১২. মূলধন সংরক্ষণ	সুদী ব্যবস্থায় মূলধন সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ঋণদাতার মূলধনের উপর তার বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে না।	ব্যবসায় কিংবা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগের বেলায় লোকসান হলে বিনিয়োগকৃত মূলধন আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদ হচ্ছে-
ক. সুদ ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থগ্রহণ
খ. বিনিয়োগকৃত মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ
গ. ঋণের বিপরীতে যে কোন অর্থ গ্রহণ
ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

২. সুদের ভিত্তি কী?
ক. ঋণ
খ. সম্পদ
গ. অশীদারিত্ব ব্যবস্থা
ঘ. মুনাফা

৩. অংশীদারিত্ব ব্যবস্থায় ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে কী?
ক. থাকে না
খ. অল্প থাকে
গ. ঝুঁকি থাকে
ঘ. সকল উত্তরই ভুল।

৪. ইসলামি দর্শনে সুদের বিধান কী?
ক. চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ
খ. শুধু বিনিয়োগের উপর বৈধ।
গ. অল্প সুদ বৈধ
ঘ. ঋণের উপর অতিরিক্ত রিবা আল-ফাদল বৈধ।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৪

সুদের কুফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সুদের নৈতিক কুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সুদের সামাজিক কুফল বর্ণনা করতে পারবেন
- সুদের অর্থনৈতিক কুফলের বিবরণ দিতে পারবেন
- সুদের রাজনৈতিক কুফল আলোচনা করতে পারবেন।

সুদের নানাবিধ কুফল থাকায় ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সমাজে সুদী লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালু থাকায় এর কুফল সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। সুদের যে সকল কুফল রয়েছে তার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক কুফল অন্যতম। নিম্নে সুদের কুফল তুলে ধরা হলঃ সুদের নৈতিক কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুদের নৈতিক কুফল

নিম্নে সুদের নৈতিক কুফলের একটি বিবরণ দেওয়া হলঃ

১. সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগকে হ্রাস করে দেয়।

২. সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়।

৩. সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করাতো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দিয়ে তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

৪. সূদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়।

৫. সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে। কারণ বিনাপরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে জনগণ অর্থকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখে।

৬. সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অধিক অর্থ (সুদ) পাবার আশায় সে এত মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও জ্ঞান থাকে না।

৭. সুদ হচ্ছে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

৮. সুদ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে।

৯. সুদখোর কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে অধিক সুদ তথা অবৈধ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

১০. সুদ মানুষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে। ফলে তার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানষিকভাবে আক্রান্ত হয়।

সুদের সামাজিক কুফল

সুদের সামাজিক কুফল নিম্নে তুরে ধরা হলঃ

১. সুদ প্রথা সম্পদকে সমাজের কতিপয় পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়, ফলে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরীব নিঃশ্ব হয়ে যায়।

২. সুদী সমাজে গরীব শোষিত হয় এবং কালোবাজারী ও মজুদদারী বৃদ্ধি পায়।

৩. সুদ সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ঋণের ভারে জর্জরিত করে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদে আসলে পরিশোধ করতে না পারে তখন ঋণদাতা সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।

৪. সুদ সমাজে মারামারি, হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়।

৫. সুদ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।
৬. সুদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
৭. সুদ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষকে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে এবং কিছু সংখ্যক পুঁজিপতিকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক বানিয়ে দেয়।
৮. সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে। ফলে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়।
৯. সুদ মানুষকে সমাজের অন্যদের প্রতি নির্মম হতে এবং অমানবিক আচরণ করতে শিক্ষা দেয়।
১০. সুদী সমাজ ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক কাজ উপেক্ষিত থাকে, কারণ, অর্থলিপ্সু ধনীরা অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সম্পদ সঞ্চিত রাকে।
১১. সুদ সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

সুদের অর্থনৈতিক কুফল সুদর প্রসারী। সমাজে সুদ প্রথা চালু থাকায় অর্থনৈতিক মেরূদন্ড ভেঙ্গে পড়ে। মানুষ দারূন অর্থ-নৈতিক কষ্টের সম্মুখীন হয়। অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণে অধিকাংশে মানুষের কোন, ক্ষমতা থাকে না। নিম্নে সুদের অর্থনৈতিক কুফল উল্লেখ করা হলঃ

১. সুদ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়।
২. সুদ কালবাজারী ও মজুদদারদের উৎসাহিত করে।
৩. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ মানুষকে অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে অনেকে অর্থকে ব্যবসায় না খাটিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে।
৪. সুদ ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে।
৫. সুদ দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে।
৬. সুদ জাতীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে।
৭. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদেরকে স্বেচ্ছাচারী আচরণে বাধ্য করে। তারা দেশ ও জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য থাকে না বা লক্ষ্মি করে।
৮. সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যহত করে।
৯. সুদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ একদিকে বিনিয়োগ কম থাকায় শ্রমের চাহিদা কমে যায়, অপরদিকে মালিকপক্ষ সুদের বোঝা বহন করে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হয় না।
১০. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকে না বরং তারা অল্প শ্রম ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করে।
১১. সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব বানাবার সুযোগ করে দেয়।
১২. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার যত বেশী হয়, দ্রব্য মূল্য তত বেড়ে যায়।
১৩. সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদী ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন ও অন্যান্য সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। কারণ সুদসহ মূলধন ফেরত পাবে এটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।
১৪. অধিক হারে সুদ দেশের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
১৫. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
১৬. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যার যত বেশী সম্পদ আছে, সে তত বেশী ঋণ পেয়ে থাকে। অপরদিকে যার সম্পদ নেই সে ঋণ পায় না। ফলে সুদী অর্থব্যবস্থায় গরীবের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়।
১৭. সুদ ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে নিরূৎসাহিত করে।
১৮. সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার ঝুঁকিমুক্ত ও পূর্বনির্ধারিত থাকে বলে অনেক সময় অর্থকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।
১৯. সুদ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

সুদের রাজনৈতিক কুফল

১. সুদ জাতিকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। কারণ জাতীয় প্রয়োজনে অনেক সময় সরকারকে বিদেশী ঋণ গ্রহণ করতে হয় কিন্তু দাতা দেশগুলো ঋণ দেয়ার সময় কতগুলো শর্তজুড়ে দেয়। ফলে সরকারকে গৃহীত ঋণের বৃহৎ অংশই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়।
২. সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোক অর্থলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগের অধিক সুযোগ পায়।
৩. সুদ সরকারের উপর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়।
৪. সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উন্নত দেশসমূহ দরিদ্র দেশসমূহের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং আধিপত্য স্থাপন করার সযোগ পায়।
৫. সুদ দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।
৬. সুদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুদ সরকারকে সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয়ে অনুৎসাহিত করে।
৭. সুদ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।
৮. সুদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সরকারের সুদমুক্ত ঋণ পাবার কোন সুযোগ থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. উত্তর সঠিক হলে 'স' হলে আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হতে শিক্ষা দেয়।

খ. সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলীকে হ্রাস করে দেয়।

গ. সুদ ভিত্তিক সমাজে অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে।

ঘ. সুদ প্রথা সম্পদকে সমাজের সকল মানুষের হাতে তুলে দেয়।

ঙ. সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার যত বেশী হয়, দ্রব্যমূল্য তত কমে যায়।

চ. সুদ জাতীয় বিনিয়োগ ও উন্নয়নকে ব্যাহত করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদের নৈতিক কুফল আলোকপাত করুন।

২. সুদের সামাজিক কুফলের একটি চিত্র তুলে ধরুন।

৩. সুদের ৮টি অর্থনৈতিক কুফল উল্লেখ করুন।

৪. সুদের রাষ্ট্রীয় কুফলের কয়েকটি দিক উল্লেখ করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদের নৈতিক ও সামাজিক কুফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. সুদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরুন।

পাঠ ঃ ৫

ইসলামে ঋণ দেওয়ার বিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামে ঋণ দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- ঋণ বা কর্জে হাসানা দানকারী সম্পর্কে ইসলামের বিধান বলতে পারবেন
- ঋণ বা কর্জে হাসানা গ্রহণকারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব সাম্য ও সহমর্মিতার ধর্ম। একের বিপদ-আপদ ও সমস্যায় অন্যেরা সহানুভূতিশীল হয়। এখানে ধনী-দরিদ্র্য, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলে মিলে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে বাস করে। ইসলামের বিধান অনুসারে এ সমাজে শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম তাই, গরীব ও অভাবীর প্রতি যাহেলী যুগের অর্থনৈতিক শোষণ তথা সুদের পরিবর্তে কর্জে হাসানার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যখন অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে বা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। তখন তারা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হাতছাড়া করার পরিবর্তে ধনীদের নিকট ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পায় কেননা ইসলামে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে ঋণ দেয়া সমাজের বিত্তশালী লোকদের জন্য কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে-

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

"এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন তার জন্যে রয়েছে এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরষ্কার।" (আল-হাদীদ, আয়াত ১১)

আল্লাহকে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর বান্দাদের ঋণ দিয়ে তাদের অভাব মোচন করা। কেউ যদি আল্লাহর বান্দার প্রতি করুণা করে তাহলে আল্লাহও তার উপর করুণা করেন। অভাবী লোকদের কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ (সুদ মুক্ত ঋণ) দেয়ার জন্যে আল্লাহ পাক আল-কোরআনে একাধিক জায়গায় উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।" (সূরা আত-তাগাবুন :১৭)

রাসূল (সঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে ঋণ (কর্জে হাসানা) দিলে তা আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সাদাকা করার সমতুল্য।

ঋণগ্রহীতা যদি অভাবের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে ঋণদাতার উচিত ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষমা করে দেয়া। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন-

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

"আর যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সময় দেয়া উচিত। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (আল-বাকারা, আয়াত ২৮০)

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "কোন ব্যক্তি যদি এ কামনা করে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখুক তাহলে সে যেন ঋণগ্রহীতাকে সুযোগ দান করে অথবা তার উপর থেকে ঋণের বোঝা নামিয়ে দেয়।"

উপরে যে ঋণদানের কথা বলা হয়েছে তার প্রকৃত হকদার কেবল ঐ সকল ব্যক্তি যারা দরিদ্র, অসহায়, সম্বলহীন, অভাবী ও স্বল্প আয়ের লোক। এছাড়া সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের পরিবারের লোক সংখ্যা অনেক

কিন্তু আয়ের পরিমাণ খুবই কম। অর্থের অভাবে তারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করতে পারে না, দু'বেলা খাবার যোগাড় করতে পারে না, অর্থের কারণে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারে না, অথচ তারা যদি কিছু কর্জে হাসানা (সুদমুক্ত ঋণ) পেত তাহলে তা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা করে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে পারত। এ সকল লোকই কর্জে হাসানা অর্থাৎ লাভমুক্ত ঋণ পাওয়ার প্রকৃত হকদার। ধনীদেরকে ঋণ দিয়ে আরও ধনী হওয়ার এবং সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়ার কথা ইসলামে বলা হয়নি। তবে ধনীদেরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্যে অর্থ দেয়া যাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঋণের ক্ষেত্রে দেয় ঋণের অতিরিক্ত কিছু আদায় করা যাবে না। বরং যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হয় কেবল তাই আদায় করতে হবে। অপরদিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত আদায় করা যায়। অর্থাৎ লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ যদি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে গরীবদেরকে ঋণ বা কর্জে হাসানা প্রদান করে তাহলে একদিকে যেমন ঋণদাতা তার মূলধন ফেরত পাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে অন্যদিকে গরীব জনগণও উপকৃত হবে।

যদি কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে ঋণগ্রহীতার উচিত ঋণদাতার নিকট থেকে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে নেয়া এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ঋণদাতার দেওয়া ঋণের মাধ্যমে গ্রহীতা যেহেতু উপকৃত হয়েছে সেহেতু অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" মানুষের প্রতিটি কৃতকর্মে আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত। মহান আল্লাহ তাকে এ বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮১)

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা এবং পাওনা পরিশোধে টালবাহনা করা মারাত্মক অপরাধ।

ঋণ বা কর্জে হাসানা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

১. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পরস্পরের ইজাব ও কবুল অর্থাৎ একজনে ঋণ চাইবে এবং অপরজন তা দেওয়ার জন্য রাযী হবে এবং তদনুযায়ী দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে ঋণ শুদ্ধ হবে।

২. ঋণদাতা দেয় ঋণের অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে পারবে না কিংবা আদায় করার শর্তও করতে পারবে না। বরং যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হবে কেবল তাই আদায় করতে পারবে। এ ধরনের ঋণকেই পবিত্র কোরআনে কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. শর্তের মাধ্যমে দেয় ঋণের অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে ইসলামি শরীয়াতে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

৪. ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ স্বীয় ইচ্ছামত খরচ করতে কিংবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। মুনাফার কোন অংশ ঋণদাতাকে দিতে হবে না এবং ঋণদাতাও দাবি করতে পারবে না। যদি দাবি করে তবে তা আইনতঃ অগ্রাহ্য হবে।

৫. শর্তহীনভাবে ঋণগ্রহীতা স্বীয় ইচ্ছায় ঋণদাতাকে গৃহীত ঋণের উপর কিছু অতিরিক্ত দিলে তা বৈধ হবে।

৬. ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলে তা বৈধ হবে এবং উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

৭. ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অনির্ধারিত হলে ঋণদাতা যে কোন সময় ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতে পারবে, এতে ঋণ গ্রহীতা কোন আপত্তি করতে পারবে না।

৮. ঋণগ্রহীতার নিকট গৃহীত ঋণের টাকা চুরি হয়ে গেলে কিংবা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও ঋণের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে না। গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে বাধ্য থাকবে। তবে ঋণদাতা যদি মাফ করে দেয় তাহলে গ্রহীতা ঋণের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে।

৯. ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে তালবাহানা করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।

১০. ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে এবং ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলে বায়তুলমাল (ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার) থেকে সাহায্য পাবার অধিকারী হবে এবং ঋণ পরিশোধ করবে।

১১. ইয়াতীম এবং নাবালকের মালিকানাধীন কোন সম্পদ তার অভিভাবকগণ কাউকে ঋণ দিতে বা নিজে নিতে পারবে না।

১২. ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি পরিত্যক্ত কোন সম্পত্তি না থাকে তাহলে ইসলামি সরকার তার ঋণ পরিশোধের দায়দায়িত্ব বহন করবে। ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণদাতার মৃত্যু হলে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ সে অর্থের হকদার হবে।

ঋণ বা কর্জে হাসানা গ্রহণকারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করেছে। তাছাড়া অপব্যয়, অযথা খরচ ও অবৈধ পন্থায় খরচ করার জন্য ঋণ করাও নিষিদ্ধ করেছে। ঋণ মানুষকে পরনির্ভরশীল করে দেয়, মানুষকে মানসিক দিক থেকে ছোট করে রাখে এবং ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ কমে যায়। তাই মহানবী (স) অধিক ঋণ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে এভাবে উপদেশ দিচ্ছিলেন, "গুনাহ কম কর, তোমার মৃত্যু সহজ হবে; ঋণ কম কর, তাহলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।" রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই এভাবে দোয়া করতেন,

اللهم انى اعوذبك من الكفرو الدين

"হে আল্লাহ! আমি কুফর ও কর্জ (ঋণ করা) হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি"।

অন্যদিকে ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা না করলে তা জান্নাত লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, বিশ্বনবী (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কাছে কারো কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করা অথবা মাফ করিয়ে নেওয়া। কেননা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দিনার থাকবে না। কারো কোন দাবী থাকলে তা নিজের সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গুনাহ প্রাপ্য অর্থ পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" (মাযহারী)

কোন ব্যক্তি যদি অভাব বা অন্য কোন কারণে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তাহলে তার উচিত যথাসময়ে পাওনাদারের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। পাওনা আদায়ে গড়িমসি করা অপরাধ। রাসূল (সা) বলেছেন,

"সচ্ছল ব্যক্তির ঋণ আদায়ে গড়িমসি তার মানহানী ও শাস্তিকে বৈধ করে দেয়।" (আবু দাউদ)

বর্তমান সভ্যসমাজে ঋণ বা কর্জে হাসানা দেওয়া মানুষ একেবারে ভুলে গিয়েছে। এখন এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, কোন ব্যক্তি কারো কাছে কর্জে হাসানা চাইতে গেলে তাদের কাছে তা থাকা সত্ত্বেও দিচ্ছে না বা মিথ্যা কথা বলে তাকে বিদায় করে দিচ্ছে। মানুষ বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ায় এবং ইসলামের শিক্ষা থেকে সরে পড়ায় এমনটি হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রয়োজনের সময় কর্জে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ না পাওয়ায় তারা সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং যথাসময়ে তা আদায় করতে না পারায় তথা সর্বস্ব হারাচ্ছে। তাই সুদী ঋণ বন্ধ করে সমাজে সুদ মুক্ত বা কর্জে হাসানা চালু করা মানবিক কারণেই অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

১. ঋণ বা কর্জে হাসানা দেয়–
   ক) বিত্তশালীদের দেওয়া কর্তব্য খ) সাধারণভাবে সকলের জন্য কর্তব্য
   গ) শুধু মুসলমানদের দেওয়া কর্তব্য ঘ) সকল উত্তরটি সঠিক

২. ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে পাবেন-
   ক) সুদ খ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পদ বৃদ্ধি
   গ) আল্লাহর কাছ থেকে সম্মানিত পুরষ্কার ঘ) ২নং এবং ৩নং উত্তর দু'টি সঠিক

৩. ঋণগ্রহীতা সময়মত ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে-
   ক) সুদ দেবে খ) সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে
   গ) চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেবে ঘ) ঋণ গ্রহীতাকে ভর্ৎসনা করবে।

৪. ঋণ কেমন ব্যক্তি গ্রহণ করবে?
   ক) ইয়াতীম ও দুঃস্থ ব্যক্তি খ) সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি
   গ) শুধু মুসলমানগণ ঘ) প্রয়োজনে সকল ব্যক্তি

৫. ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায়ে অপরাগ হলে তার বিধান হচ্ছে-
   ক) তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে খ) সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দিতে হবে
   গ) তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে ঘ) ১নং এবং ২নং উত্তর সঠিক

৬. কর্জে হাসানা শব্দের অর্থ হচ্ছে-
   ক) সুদ মুক্তঋণ দেওয়া খ) হালাল ট্কা ঋণ দেওয়া
   গ) চাহিবা মাত্র ঋণ দেওয়া ঘ) ব্যবসায়ে সহায়তা করা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ঋণ দানের ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? লিখুন।
২. কর্জে হাসানা দেওয়ার ইসলামি বিধান লিখুন।
৩. ঋণগ্রহীতার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কী? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন
১. ইসলামি ঋণদাতার ও গ্রহীতার এবং ঋণ আদায়ের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।